ক্রীম

অবধূত

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৩৬৬

প্রকাশক

শ্রীকানাইলাল সরকার

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ

কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদ

শ্রীদীপেন বসু

ব্লক

সিগনেট ফটোটাইপ

ব্লক মুদ্রণ

চয়নিকা প্রে

বাঁধাই

তৈফুর আলী মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সমুদ্র মন্থন করে উঠেছিল বিষ,
পান করে নীলকণ্ঠ হল মহেশ্বর ;
খাঁটি দুগ্ধে ওঠে 'ক্রীম'—অঙ্গের পালিশ,
মেখে নিয়ো, ধন্য হবে জীবন নশ্বর !

—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

এই ক্রীমটুকু
কবিবন্ধু অচ্যুত চাটুয্যেকে
নিবেদন করছি

সূচী ঃ

ক্রীম ১
ভ্যানিশিং ক্রীম ৫৭
আইসক্রীম ১১১
ক্রীম-ক্র্যাকার ১৪৫

এই লেখকের

কলিতীর্থ কালীঘাট

মরুতীর্থ হিংলাজ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

বহুব্রীহি

দুই তারা

মিড় গমক মূর্ছনা

দেবারিগণ

তুরি বৌদি

শুভায় ভবতু

ক্রীম

জুতসই কাণ্ডকারখানা কটি ঘটেছে এ জীবনে, যা নিয়ে জমাটি গল্প একটি খাড়া করা সম্ভব!

তিন ভাগের বেশী সাবাড় হয়ে গেল মেয়াদের, এখন কাগজ পেতে কলম ধরে বসে পুঁজির পুঁটলি হাতড়াতে গিয়ে দেখি, হাতখানা ঘুরে-ফিরে নিজের কপালে গিয়ে ঠেকছে। পুঁটলির পেটে কিছুই নেই, একটু-আধটু ধুলো-গুঁড়ো যা-ও বা মিলল, তা চোখের সামনে তুলে ধরলেই চক্ষু চিত্তির। যেমন ম্যাড়মেড়ে তেমনি কলঙ্ক-ধরা। সে মাল নিয়ে বাজারে যাচাই করতে যাওয়া মানে—যেচে মানুষের গালাগালি কুড়িয়ে বেড়ানো। তাতে লাভ হবে কতটুকু! পুঁটলির পেট গালাগালি দিয়ে ভরে উঠবে বটে, কিন্তু সেই পুঁটলি ঘাড়ে করে ওপারে পৌঁছন যে বড়ই বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ঘটা করে কিছুই ঘটে নি এ জীবনে। তা না ঘটুক, অনেকের জীবনে কিন্তু ঘটেছে, ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবেও। বড় বড় জাঁক-জমকের জৌলুসে দুনিয়ার মন আকাশের গায়ে তারা ফোটে, ফুলঝুরি ঝরে। সেই সব আতশবাজির ঝলকানিতে কখনও-সখনও দু'এক-খানি মুখের ছায়া ধরা পড়েছে নিজের নিবিড় আঁধার মন-মুকুরের গায়ে। সে ছায়া মিলিয়ে যায় নি, মেলাবার নয়। সেই ছায়ার গায়ে তুলি বুলিয়ে হয়ত গড়ে তোলা যায় দু'একটি কায়া। কিন্তু তাতে প্রাণ সঞ্চার করার মন্ত্র জানি না যে। প্রাণদানের মন্ত্র যে শেখা হয় নি এখনও।

আসল কথাটি হল, ওই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রটি শেখা। মূলমন্ত্রটি না জানার দরুন কত পূজা কত আয়োজন যে পণ্ড হয়ে যায়, তারই দু'একটি কাহিনী শোনাই এখানে।

এই সব কাহিনী, এও সেই তখনকার দিনের সম্বল। যখন ফক্কড় ছিলাম, ঝপ্পড় বাঁধি নি, তিনখানা লক্কড় পুড়িয়ে ছ'খানা টিক্কড় পাকিয়ে দিন ডিঙিয়ে চলতাম, তখন একটু-আধটু আতশবাজির আঁচ লাগাবার সুযোগ ছিল গায়ে। ঝপ্পড়-আশ্রয়ী হয়েছি এখন, খোলা আকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে গেছে। এখন ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে মরছি ঝপ্পড়ের তলায় বসে। অর্থাৎ কিনা এখন ফক্কড় ছক্কড়ে পরিণত হয়েছে। কে আর এখন এই ছক্কড়কে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে!

ছক্কড় ছুটতে পারে না, ফক্কড় থামতে জানত না, শুধুই ছুটে বেড়াত।

ফক্কড়ের ছোটা, সেও এক কিম্ভুতকিমাকার কাণ্ড।

কোথায় চলেছি, তাও জানতাম না। গাড়িখানা ছুটে চলেছে যেখানে সেখানেই চলেছি। অজানা গন্তব্যস্থানে চলত তখন ফক্কড়। ফক্কড়ের গন্তব্যস্থান ফক্কড় নিজেই জানত না। জানত গাড়িখানা। কারণ এক সময় তাকে নিশ্চয়ই থামতে হত।

ধরণী ছোট, অনন্তকাল এই ধরণীর বুকের ওপর ছুটে চলা সম্ভব নয়। যে ছুটছে, তার দম অফুরন্ত হলেও পায়ের তলার মাটি অফুরন্ত নয়। পায়ের তলার ঠাঁইটুকু খতম হলেই ছোটারও খতম।

এই বিশ্বাস নিয়েই তখন গাড়িতে চড়তাম যে গাড়িখানার ছোটা কোথাও না কোথাও শেষ হবেই।

তখন!

তখনকার ভাবনা তখনকার জন্যে মুলতবী রেখে বসে থাকতাম জানলার বাইরে তাকিয়ে। গাড়ি ছুটে চলত।

সে গাড়িখানাও তাড়াতাড়ি পৌঁছবার গরজে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। আমি বসে ছিলাম জানলার বাইরে তাকিয়ে। একভাবে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম।

বসে বসে দেখছিলাম, আঁধার-দিয়ে-গড়া জীবন্ত দৈত্যদানবরা হু হু শব্দে ছুটে পালাচ্ছে পেছন দিকে। অনেক ওপরে অগুন্‌তি

আগুনের ফুলও ছুটেছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে সব। অন্তরীক্ষে তেড়ে আসছে আলো। তেড়ে আসছে ওদের গ্রাস করার জন্যে, মাটির ওই দৈত্যদানবদের আর আকাশের ওই ফুলগুলোকে। তারপর—

তারপর আর-কিছুই ঢাকাঢুকি লুকনো-ছাপানো থাকবে না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে একটি বেওয়ারিস ফক্কড় যে কয়েক শত মাইল বেওজর পার হয়ে এল, এটা আর অজানা থাকবে না কারও। জাগ্রত জগতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তখন ফক্কড়কে। যে জগৎ আপন গরজে পৌঁছবার ঠিকানায় পৌঁছবার জন্যে ছুটছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফক্কড়কেও ছুটতে হবে।

কিন্তু কেন ?

ফক্কড়ের কোথাও পৌঁছবার গরজ নেই। কোন দায় পড়েছে ফক্কড়ের জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে মরবার ?

বাইরের জীবন্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে এক মনে ভাবছিলাম ফক্কড়ের দায় কোথায়। ভাবছিলাম আর শুনছিলাম। শুনছিলাম একটি সুর। ছুটে চলার সুরটি ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম। স্থাবর জঙ্গম এক সুরে গান গাইতে গাইতে ছুটছে। সে মহাসংগীতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ফক্কড়ও ছুটছে। ছুটছে, কারণ ছোটা বন্ধ করলে সুর কেটে যাবে। এতে আর অন্যায়টা কোথায় !

সুর হঠাৎ কেটে গেল।

কানে গেল—“কতদূর যাওয়া হবে মহারাজের ?”

গাড়ির মধ্যে নজর ফিরিয়ে আনতে হল। চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মত কিছু হল না। বাইরের আঁধারের সঙ্গে ভেতরের আঁধারের বেশ মিল রয়েছে যেন। দু’টো আলোর একটা না জ্বলার ফলে বেশ আলো-আঁধারি হয়ে উঠেছে গাড়ির ভেতরটা। তার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে-বসে আছে সবাই। কারও মুখচোখ

দেখা যাচ্ছে না। কে করলে ওই প্রশ্নটি তাহলে! সেধে ফক্কড়ের সঙ্গে আলাপ করার গরজ পড়ল কার! যেখানেই যাক না কেন ফক্কড়, তাতে কারই বা কি গেল এল!

মনের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। আঁকুপাঁকু করতে লাগলাম জবাব খুঁজে পাবার জন্যে, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি। অন্য কারও জানার প্রয়োজন না থাকুক, আমার তো জানা উচিত, কোথায় চলেছি আমি। জবাব নেই। একমাত্র জবাব, গাড়িখানা যেখানে চলেছে, আমার গন্তব্যস্থল সেখানেই। কিন্তু কেন চলেছি সেখানে? কার কাছে চলেছি?

ফাঁপরে পড়ে গেলাম। নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে পেলাম না।

গাড়ি ভরতি মানুষ, ঘুমন্ত আধা-ঘুমন্ত বা জাগ্রত, সবাই জানে কে কোথায় চলেছে। যেখানে যাচ্ছে সেখানে পৌঁছলে ওদের পৌঁছনোটা সফল হবে। ওরা সেই সফলতার স্বপ্ন দেখতে দেখতে পার হয়ে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল। ফক্কড়ের কোনও স্বপ্ন নেই। জেগে হোক ঘুমিয়ে হোক, কোনও অবস্থাতেই ফক্কড় স্বপ্ন দেখতে পারে না। ফক্কড় শুধু ছোটে, থেমে থাকতে পারে না বলে ছুটে বেড়ায়, কারণ থেমে থাকার অবলম্বন না খোয়ালে কেউ ফক্কড় বনতে চায় না।

তোলপাড় করে উঠল বুকের মধ্যে, কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগল মাথাটা। অসাড় হয়ে গেল হাত-পাগুলো। অর্থহীন একটা রহস্যময় আতঙ্কে হিম হয়ে উঠল সর্ব শরীর। বাইরের গাঢ় আঁধারের সঙ্গে নিজেকে ঘুলিয়ে ফেললাম। ঠিক ওইরকম নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব নিরাশ্রয়, একা—একদম একা। এতটুকু সম্পর্ক নেই দুনিয়ার সঙ্গে। কেউ আমায় চেনে না, কাউকে চিনি না আমি। কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করার অধিকার নেই আমার, আমার কাছেও কেউ কিছু প্রত্যাশা করে না। তার মানে অস্তিত্বই নেই

আমার, আমি নামক প্রাণীটির আমিত্বটুকুকে কেউ দেখতেই পায় না। যেমন বাইরের ওই আঁধারের মাঝে কি আছে, তা কেউ দেখতে পায় না। ওই অন্ধকারের মত হয়ে গেছি আমি, একদম অদৃশ্য হয়ে গেছি।

সেই প্রথম, বাঘের মুখে পড়ে নয়, ভূতের খপ্পরে পড়ে নয়, ঘাতকের উদ্যত খাঁড়ার তলায় মাথা পেতে নয়, গাড়ি ভরতি ঘুমন্ত আধা-ঘুমন্ত মানুষের মাঝে বসে প্রথম স্বাদ পেলাম মৃত্যুর। হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, উদ্দেশ্যহীন সংকল্পশূন্য হয়ে বেঁচে থাকাটা কি ভয়ংকর জাতের বেঁচে থাকা। একেই নাকি বলে মুক্ত-অবস্থা।

ফক্কড় মুক্ত, মুক্তি গ্রাস করে ফেলে ফক্কড়কে। মোক্ষপ্রাপ্তির মোচড় খেতে খেতে বেঁচে থাকে ফক্কড়। ফক্কড়ের বেঁচে থাকাটা কেমন জাতের বেঁচে থাকা, তা কিছুতে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কমে এল গাড়ির গতি, কামরার মধ্যে কাঁথাকাপড়-জড়ানো পোঁটলা-পুঁটলিগুলো নড়েচড়ে উঠল। দৌড় কমাতে কমাতে ঢুকল গাড়ি আলোর রাজ্যে। তারপর থামল।

মস্ত বড় স্টেশন, অনেক আলো, অনেক মানুষ, চিৎকারও অনেক। চাগ্রম, গরম পুরি, হিন্দু পানি। কালো কোট কালো দাড়ি সাদা পাগড়ির ছড়াছড়ি প্লাটফরমের ওপর। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি-পাগড়িসুদ্ধ মুখ একখানি ঢুকল জানলা দিয়ে। এক মুহূর্তেই তাঁর যা দেখার দেখে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে ধমক—
"এই—টিকিট হ্যায়?"

জবাব আর দিতে হল না। জবাব শোনার আগেই দরজা খুলে লাফিয়ে উঠলেন তিনি গাড়ির মধ্যে। একটি মাত্র ফালতু বাক্য আর উচ্চারণ করলেন না, তার বদলে ধরলেন একখানা হাত চেপে। এক হেঁচকায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পরমুহূর্তে একটি ধাক্কা

খেলাম ঘাড়ে। একটি ধাক্কাই যথেষ্ট। ছিটকে পড়লাম প্লাটফরমের ওপর। প্লাটফরমের পাথরের সঙ্গে কপালটা সজোরে ঠুকে গেল।

অজানা গন্তব্যস্থানে পৌঁছনো হল ফক্কড়ের। কোনও রকমে উঠে অনেক জোড়া চোখের তেরছা চাউনির মাঝখান থেকে সরে পড়লাম।

এরই নাম ফক্কড়ের চলন।

এই ভাবে চলতে চলতে ফক্কড় চার ধাম চুরাশি আড্ডা মেরে দেয়।

সেদিন সেই কঠিন প্লাটফরমের ওপর আছড়ে পড়ে হেসেছিলাম। চোট-খেকো কপালে হাত বুলতে বুলতে কপালের বোকামির জন্যে হেসেছিলাম। বে-আক্কেলে কপাল যে বেইমান মগজখানাকে লুকিয়ে রেখেছে, সেই মগজে কিছুক্ষণ আগেই উদয় হয়েছিল অতি মোলায়েম একটি সুখস্বপ্ন। নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ একান্ত অসহায় ভেবে মর মর হয়ে উঠেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখার কোনও গরজ নেই কারও, কস্মিনকালে কারও কোনও প্রয়োজনে লাগব না আমি, এই জাতের ফাঁকা চিন্তার অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিলাম। একটি মাত্র হেঁচকায় আর একটি মাত্র ধাক্কায় স্বপ্নের নেশা গেল টুটে, আলোর সমুদ্রে জল-জ্যান্ত জগতের পাথুরে দ্বীপের ওপর খাড়া হয়ে হাঁপাতে লাগলাম। কানে গেল ঘণ্টার আওয়াজ, গার্ডের বাঁশিও কানে গেল। অনেক আগে আর্তনাদ করে উঠল ইঞ্জিন। ঝক্-ঝক্-ঝুস্, থেমে থেমে দম ছাড়তে ছাড়তে আলোর ভেতর থেকে অন্ধকারের মাঝে ঢুকে পড়ল গাড়িখানা। একটা লোহার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম রক্তবর্ণ এক-চক্ষুর দিকে। রক্তবর্ণ চক্ষুটি মৌন ভাষায় যেন বলে গেল—খবরদার, এতটুকু অসাবধান হলে, নিজেকে নিয়ে ক্ষণমাত্র মশগুল থাকলে রক্ষে নেই তোমার। দলে পিষে গুঁড়িয়ে

দিয়ে চলে যাবে তোমায় দুনিয়া। কেউ ছেড়ে কথা কইবে না, সম্বন্ধ রাখতে বিন্দুমাত্র কসুর করবে না কেউ। সেই সম্বন্ধের সুমধুর তাপটুকু সইতে পারার জন্যে ওত পেতে থাকার নামই সার্থক ভাবে বেঁচে থাকা।

ষোলআনা ফিরে পেয়েছি নিজেকে তখন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্কের সামান্য মাত্র স্বাদ পেয়ে নিবিড় ভাবে ফিরে পেয়েছি নিজেকে। খুবই চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। আমি আর আমার দুনিয়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের মুখ ভেংচাবার চেষ্টা করছি। ষোলআনা সজাগ হয়ে কুকুরের মত নজর ফেললাম একবার চারিদিকে। আর একবার অপ্রস্তুত অবস্থায় না পড়তে হয়। বেঁচে থাকতে হবে, দুনিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে দুনিয়ার বুকের ওপর সজোরে পদাঘাত করতে করতে ছুটে বেড়াতে হবে। ফক্কড়ের চলন সবার অলক্ষ্যে, ফক্কড় কিছুতে ধরা-ছোঁয়ার ধার ধারে না।

এই চলন চলতে চলতে আর বেঁচে থাকার চরিতার্থতা চাখতে চাখতে একদিন দেখি পৌঁছে গেছি খাস দিল্লীতে। দিল্লীকে পাশ কাটিয়ে পৌঁছলাম গিয়ে কুরুক্ষেত্র তীর্থে। কি একটা স্নানের যোগ ছিল। বহু মানুষ জুটল। কেউ গেল পুণ্য কিনতে, কেউ গেল পুণ্য বেচতে। বেচাকেনা শেষ হল দিন তিনেকের মধ্যে। তখন সবাই ফিরে গেল নিজের নিজের আস্তানায়। ফক্কড়ের তাড়াহুড়ো নেই, তার ওপর মাসখানেকের মত রসদ জমা হয়ে গেছে ঝুলিতে। আড্ডা নিয়েছিলাম একটা মন্দিরের সামনে, সেখানেই জমে রইলাম। কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ, মহাতীর্থে বাস করার দুর্লভ মওকাটা খামকা নষ্ট করে লাভ কি।

মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে যোগযাগ ছাড়া হামেশা যাত্রীর ভিড় হয় না। দু'দশজন শহুরে যাত্রী বেলা বারোটা একটায় যায় রোজই। ভোরের ট্রেনে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরবেলা কুরুক্ষেত্রে পৌঁছয়।

আবার বিকেলের গাড়িতে ফেরে। সকলেই যে তীর্থ করতে যায় তা মনে করা ভুল। অনেকে যায় জায়গাটা দেখতে। দেখবার মত জায়গাও বটে। যেদিকে ফিরাও আঁখি, দেখা যাবে, জলে আকাশে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আর পদ্মফুল, একসঙ্গে ওই পরিমাণ পদ্মফুল কুরুক্ষেত্র ছাড়া আর কোথায় নজরে পড়ে! কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে বিশ্বাস করা শক্ত যে, খুনোখুনি করে মরবার জন্যে রাশি রাশি মানুষ ওখানে জুটেছিল কোনও কালে। বরং মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, লর্ড কৃষ্ণের লর্ডের উপযুক্ত পছন্দ ছিল বলেই তিনি বিশ্বরূপ দেখাবার জন্যে ওই স্থানটি খুঁজে বার করেছিলেন। যেখানে-সেখানে কি বিশ্বরূপ দেখানো চলে!

দিল্লী শহর থেকে দু'একটি মোগল পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে সাগরপারের মানুষরা কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে কুরুক্ষেত্র দর্শনে যান। কুলীন মোগল তাঁদের বোঝায়, একটি মাত্র খুবসুরত আওরতের জন্যে লড়াই করে কি ভাবে বিলকুল কুরুপাণ্ডব গুষ্টি ফৌত হয়ে গিয়েছিল। সাগরপারের তাঁরা সাগরপারে ফিরে যান এইটুকু জেনে যে, হিন্দুরা বহু ভাই মিলে একটি মাত্র বউ নিয়ে ঘরসংসার করে। ফলে ভায়েদের মধ্যে লড়াই লেগে যায়। সে লড়াই ঈশ্বর-প্রেরিত দূত লর্ড কৃষ্ণ পর্যন্ত বন্ধ করতে পারেন না।

কুরুক্ষেত্র তীর্থে আর যান যাঁরা, তাঁরা নিরিবিলি না পেলে মনের কথা মনের মত করে মনের মানুষের মনে ঢালতে পারেন না। একদা বহুত হাঙ্গামা-হুজ্জত হয়েছে বটে কুরুক্ষেত্রে, এখন কিন্তু কুরুক্ষেত্রে একমাত্র মনের লড়াই চলে। নিস্তব্ধ দুপুরে মনে মনে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সে লড়াইয়ের ফয়সালা হয় এমন ভাবে যে, কুরুক্ষেত্রের পদ্মগুলো আরও লাল হয়ে ওঠে। গীতায় ভগবান অলক্ষ্যে লুকিয়ে থেকে বাঁশিতে ফুঁ দেন। তাই শুনে অনেক দূরে ময়ুর নাচে ময়ূরীর সামনে পেখম মেলে।

কুরুক্ষেত্র তীর্থে স্নানের যোগ ছাড়া অন্য সময় রাত কাটাতে বড়

একটা কেউ থাকে না। সন্ধ্যার পর কুরুক্ষেত্র সত্যিই মহাশ্মশান। গভীর রাত্রে কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়। অতি মানে যাঁরা সবংশে ধ্বংস হয়েছিলেন, এখন তাঁরা রাতের অন্ধকারে পদ্মের তলায় লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। হয়ত বা বুকের জ্বালা জুড়বার জন্যে আঁজলা ভরে পান করেন হ্রদের জল। কুরুক্ষেত্র হ্রদ আজও শুকিয়ে যায় নি।

যে মন্দিরটির বারান্দায় ডেরা গেড়েছিলাম, তার মধ্যে বাস করতেন ত্রেতা যুগের শ্রীরামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণ এবং বধূ সীতার সঙ্গে। তিনজনেই দিবারাত্র অষ্টপ্রহর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতেন। ওঁদের সেবায়েত ঠিক সন্ধ্যার সময় মিনিট তিনেকের মধ্যে আরতি সমাপ্ত করে রওয়ানা হতেন নিজ মন্দিরের দিকে। ভদ্রলোকের হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ছাড়া আরও একটি জিনিস ছিল—ভয়। বিদায়ের কালে প্রতিদিনই একবার করে সাবধান করে দিতেন আমায়। বহু জাতের ক্ষুধার্ত্ত জীব ঘুরে বেড়ায় রাত্রে। রাত্রেই তারা খাওয়া-দাওয়া সারে। পাছে আমার হাড়মাসগুলো কারও ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজ লাগে, এই দুশ্চিন্তায় বোধ হয় ঘরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের পাশে শুয়েও নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারতেন না ভদ্রলোক। শ্রীরামচন্দ্র-জীর সেবা করতে করতে তাঁর হৃদয়ে পরের জন্যে প্রেম জন্মে গিয়েছিল। কিন্তু হনুমানজীর কৃপা লাভ করতে পারেন নি বলে ভয়টাকে জয় করতে পারেন নি।

ফক্কড়ের হৃদয়ে ভয়ের স্থান নেই। ফক্কড় পবননন্দনের খাস অনুচর। শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধ দরজার বাইরে বসে নির্ভয়ে তাকিয়ে থাকতাম কুরুক্ষেত্রের দিকে। কুরুক্ষেত্রের রাত গদাইলশকরী চালে গড়িয়ে চলত।

কুরুক্ষেত্র তীর্থে দিনে রাতে দুটি যুগ পাহারা দেয়। দিনে কলি রাতে দ্বাপর। রাতের আঁধারে দ্বাপরের আসর বসে কুরুক্ষেত্রে। কলির জীব আমি, পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম সেই আসরের

তুলতে পারছি না। কিছুই করতে পারছি না। শুধুই হাঁটছি পাশে পাশে। বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্ভব অসম্ভব এই সমস্ত কিছুর নাগালের বাইরে পৌঁছে কেমন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পৌঁছেছি। কি অসহায় অবস্থা!

হঠাৎ অসহায় অবস্থাটা কেটে গেল। একটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন তিনি। সামান্য একটু গোঙানি কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলাম। লাফিয়ে পড়ে হাত ধরে টেনে তুললাম তাঁকে।

রক্তমাংসে গড়া একটা মানুষ। দ্বাপরের ছায়ামূর্তি ছায়ানট নন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এই ভাবে অবিশ্বাস্য ঘটনার সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা ছিল তখন, যখন ফক্কড় ছিলাম।

আজ ঝপ্পড়ের তলায় আশ্রয় পেয়ে পরম নিশ্চিন্তে দিন খোয়াচ্ছি আর ভাবছি। ভাবছি, কেন আজ দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উঠে গেছে! কেন আজ কারও মনের ছোঁয়া পাই না! কেন আজ কেউ আমায় বিশ্বাস করে নিজের সব থেকে গোপন বেদনাটি আমার মনে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে নিজেকে খানিকটা হালকা করতে পারে না!

অতি অল্প কথায় পরিচয় হয়ে গেল আমাদের।

হাঁটুতে হাত বুলতে বুলতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুমি?"

ভাষা হিন্দী, গলার স্বরে খানদানী আমেজ।

বাংলায় জবাব দিলাম আমি—"বাংলা বলুন না, আমি বাঙালী।"

"বাংলা আমার আসে না।"

তাজ্জব বনে গেলাম—"তবে যে বাংলা গান গাইছিলেন!"

"ওই গানই গাইতে শিখেছি, বাংলায় কথা বলতে পারি না।"

খুব চেষ্টা করে অবাধ্য একটা নিঃশ্বাস চেপে ফেললেন। বুঝলাম—ঘা যেখানটায়, প্রায় সেখানেই হাত দিয়ে ফেলেছি।

সামলে নিলাম নিজের জিভকে। বললাম—"বেশ, তাহলে এখন উঠুন আমার হাত ধরে। আমার কাঁধে ভর রেখে চলুন—"

জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায়? কোথায় যাব?"

যা মুখে এল, বলে ফেললাম—"যেখানে যাচ্ছিলেন গান গাইতে গাইতে। চলুন, তাঁর কাছেই পৌঁছে দিচ্ছি।"

এবার বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে—"কার কাছে যাচ্ছিলাম! কই—কোথাও তো যাচ্ছিলাম না!"

খুবই নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম—"যাক, বাঁচা গেল তাহলে। এখন চলুন আমার সঙ্গে।"

আবার জিজ্ঞাসা করে ফেললেন—"কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?"

নিচু হয়ে ধরে ফেললাম তাঁর হাত ছু'খানা। বললাম—"তা জেনে আপনার লাভ কি? যেখানে আমি যাব, সেখানে আপনাকে যেতে হবে। আমাকে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখছেন না, আপনার আমার এক জাত। এভাবে আপনাকে আমি ছেড়ে যাব কেমন করে? তাহলে আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে আপনার কথা ভেবে অশান্তিতে ভুগব যে। চলুন—অনেক জাতের জীবজন্তু ঘুরে বেড়ায় এখানে। আর দেরি করবেন না।"

আমার কথায় এতটুকু যুক্তি ছিল না। কিন্তু কাজ হল। লম্বা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বহুকষ্টে আমার হাত ধরে তিনি খাড়া করলেন নিজেকে। তাঁর ডান হাতখানা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান হাত দিয়ে শক্ত করে ধরলাম। বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরলাম তাঁর কোমর। তারপর দিক ঠিক করে ফিরে চললাম শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরের উদ্দেশে।

কুড়িয়ে-পাওয়া বন্ধুটিকে কম্বলের পাশে শুইয়ে নিজেও শুয়ে পড়লাম। আপ্যায়নের আড়ম্বর ওইটুকুই, ওর বেশী না একটুকরো রুটি না একডেলা গুড়। ফক্কড়ের সংসার পাখির সংসার। সূর্যদেব

অস্তাচলে গমন করেন, পাখিরাও আপন কুলায়ে আশ্রয় নেয়। পরদিন সূর্যদেব যখন উদয় হন, পাখিরাও নীড় ত্যাগ করে। মাঝখানের ওই আঁধার সময়টুকুর জন্যে একদানা এককুটো পেটে পাঠাবার বস্তু পাখিরা কুলায়ে নিয়ে রাখে না। ফক্কড়ও তা করে না।

ফক্কড়ের কাছ থেকে ফক্কড়ের বন্ধু কিছু প্রার্থনাও করলেন না। কিছুর প্রয়োজনও ছিল না তাঁর। তিনি নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে রইলেন।

বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলাম—

"যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলাম পণ।
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন ॥
আকাশে যার পরশ মিলায়—
শরৎ মেঘের ক্ষণিক-লীলায়—
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর-গুঞ্জন ॥"

বদ্ধ পাগল-টাগল নয়ত!

একরাশ দুর্ভাবনা বুকের ওপর চেপে বসল আমার। অনেক কিছুই জানা দরকার যে এখন! কোথাকার মানুষ! এলেন কোথা থেকে! যাবেন কোথা!

কোথাকার মানুষ তা অবশ্য আন্দাজ করা যাচ্ছে। কিন্তু বাংলা গান শিখলেন কেমন করে! বাংলা ভাষায় গান গাইতেই পারেন শুধু, কথাবার্তা বলতে পারেন না—এ আবার কেমন ব্যাপার! প্রাণের মায়া ত্যাগ করে গভীর রাতে কুরুক্ষেত্রে ঘুরছেন কেন একলা!

মাথার গোলমাল হয় নি তো!

আবার মন দিতে হল ওঁর গানের কথায়।

"অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসা যাওয়ায়—"

হঠাৎ উঠে বসলাম ধড়মড়িয়ে। ফলে খুবই চমকে উঠলেন তিনি, গান বন্ধ হল। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন।

খুবই কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন আমাদের মুখ। তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমি তাঁর চোখের মধ্যে। তাঁর চোখে কেমন যেন আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠেছে। অন্ধকারে কতটুকুই বা বোঝা যায় চোখের ভাষা। তবু যেন মনে হল, বেশ ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। আর দেরি করলাম না। চাপা গলায় গোপন কথাটি বলে ফেললাম।

"চলুন, যাই তার কাছে।"

ভয়ের বদলে অকপট বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর দুই চোখে। খুবই চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন—"কার কাছে!"

এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে বলে ফেললাম—"যার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি, তার কাছে।"

আর জবাব পেলাম না। মাথা নিচু হল তাঁর। অনেকক্ষণ পরে আটকানো দমটা নিঃশেষে ফেলে বললেন—"সে নেই, সেই পালিয়েছে।"

ধরে ফেললাম তাঁর হাত দু'খানা। প্রচণ্ড জোরে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললাম—"অসম্ভব, একদম অসম্ভব। কিছুতে সে পালাতে পারে না। চলুন, তাকে খুঁজে বার করিগে আমরা। ভুল করছেন আপনি, কেউ বলতে পারে না, কি এখন করছে সে। হয়ত সে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাগলের মত। হয়ত সে আত্মহত্যা করে বসবে আপনাকে না পেয়ে। হয়ত সে—"

আস্তে আস্তে মোচড় দিয়ে হাত দু'খানা ছাড়িয়ে নিলেন আমার হাত থেকে। তারপর দূর আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

ফ্যাকাশে রঙের ছোপ ধরেছে তখন কুরুক্ষেত্রের এক পাশটায়।

উৎকট গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে হ্রদের বুকে। ঘুম ভেঙেছে লক্ষ লক্ষ পাখির। পদ্মরা ঘোমটা খুলে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে দেখছে, অত চেঁচামেচি কেন হঠাৎ। রুদ্ধদ্বার কক্ষে শ্রীরামচন্দ্রজী ভাই এবং স্ত্রীর সঙ্গে কি পরামর্শ করছেন, কে জানে।

উঠে পড়লাম। চৌকাঠের ওপর মাথা ঠেকিয়ে কম্বলের এক কোণ ধরে টান দিলাম। ফলে কম্বল ছেড়ে নেমে বসতে হল তাঁকে। কম্বলখানা ঘাড়ে তুলে নিলাম। দড়ি-বাঁধা লোটাটা কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে তাঁর সামনে।

"উঠুন এবার।"

আকাশ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে তাকালেন আমার দিকে। তারপর মেঝের ওপর হাতের ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। তখন নজর পড়ল তাঁর হাঁটুর ওপর। পাজামার ওপর রক্তের ছোপ পড়েছে।

আবার তাঁর একখানা হাত তুলে নিলাম নিজের কাঁধের ওপর। তারপর সাবধানে নামিয়ে আনলাম তাঁকে বারান্দা থেকে। খোঁড়াতে লাগলেন। রাস্তার ওপর পৌঁছতে অনেকটা এবড়োখেবড়ো পথ পার হতে হল। সময়ও লাগল অনেকটা। এইভাবে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে কতটা সময় লাগতে পারে, তাই আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বেশীক্ষণ আন্দাজ করতে হল না, তিনিই প্রথম কথা বললেন। বললেন, তাঁর কাছে টাকা আছে, একটা গাড়ি পেলে হত।

গাড়ি মানে টাঙ্গা। সে মিলবে সেই স্টেশনে পৌঁছলে। সে কথাটা ভাঙলাম না। বললাম—"মিলতেও পারে পথে, চলুন এগোনো যাক্।"

এগিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন সেই কুড়িয়ে-পাওয়া অজানা অচেনা মানুষটির ভার কাঁধে নিয়ে। এগিয়ে যাবার সামর্থ্য ছিল তখন।

হিসেব করে পা ফেলার না ছিল গরজ না ছিল অভ্যাস। তাই সেদিন এগিয়ে যেতে পারতাম। এই বেহিসেবী এগিয়ে যাবার দরুন বহুবার ঠকেছি, বহুবার জিতেছিও। হারজিতগুলো আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কিছুই খোয়া যায় নি। কেউ যদি মনে করেন, সেদিনের সেই জিতগুলিকে রেখে হারগুলিকে কোনও মূল্যের বিনিময়ে আমি হাতছাড়া করতে পারি, তাহলে তিনি ভুল করবেন। নিক্তির একদিকে লাভের পুঁটলি অপর দিকে লোকসানের বোঝা চাপালে লোকসানের দিকটা যে মাটি ছেড়ে উঠতে চায় না। কাজেই অমন অমূল্য সম্পদ হাতছাড়া করি কেমন করে!

কুরুক্ষেত্র স্টেশনে তিনিই দিলেন টিকিটের টাকা। একটা পেট-মোটা চামড়ার ব্যাগ ভেতরের পকেট থেকে বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, দু'খানা দিল্লীর টিকিট কিনতে। বলে বসে পড়লেন মাটির ওপর, হাঁটুর অবস্থা এমন যে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। টিকিটের জন্যে টাকা বার করছি, বললেন—"আপার ক্লাশই কিনে আনুন দু'খানা, নয়ত গাড়িতে ওঠা মুশকিল।"

তথাস্তু, আপার ক্লাশই কিনলাম দু'খানা। ভেবে পেলাম না, এত জায়গা থাকতে দিল্লী কেন! দিল্লী গেলে নিশ্চয়ই অনেকগুলো কি এবং কেনর মীমাংসা হবে, এই আশায় চুপ করে রইলাম। টিকিট এনে ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে গেলাম, নিলেন না। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছেন তখন। সেই অবস্থাতেই মাথা নেড়ে বললেন—"থাকতে দিন আপনার কাছে, পথে খরচা আছে।" তথাস্তু, তাই রেখে দিলাম।

তারপর যাত্রা। গাড়িতে মাত্র একটিবার একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন তিনি আমায়। কয়েকটা কমলা কিনে দু'টি খেতে দিলাম তাঁকে। হাত পেতে নিলেন, ছাড়িয়ে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, দিল্লী গেলে তার দেখা পাব তো?"

সজোরে বললাম—"আলবৎ—নিশ্চয়ই পাবেন। যাবে কোথায় সে আপনার চোখ এড়িয়ে।" অনেকটা জোর পেলেন যেন, কমলার কোয়া মুখে ফেলে তাকিয়ে রইলেন দূর আকাশের পানে। আর একটিবারও গাড়ির মধ্যে নজর ফেরালেন না।

স্তোকবাক্য মিথ্যে কথা। বলার সময় কিছুমাত্র ভাবনা-চিন্তা না করেই স্তোকবাক্য বলে ফেলে মানুষে। এটা মানুষের হাজার হাজার দুর্বলতার মধ্যে একটা। যে বলে, সে জানে মিথ্যে বলছি। যে শোনে সেও জানে মিথ্যে শুনছি। তবু ওই স্তোকবাক্য—মিথ্যে কথার মূল্য অসীম। ওটুকুকে অবলম্বন করে অনেক ডুবন্ত মানুষ অন্তত সামান্য ক্ষণের জন্যেও ভেসে থাকতে পারে।

কিন্তু ওই স্তোকবাক্য ভবিতব্যের চক্রান্তে যখন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়!

তখন সেই সত্যির ভারে ডুবন্ত মানুষ তলিয়ে যায়, ভেসে থাকতে পারে না।

স্তোকবাক্যের মিথ্যেটুকুর মূল্য আছে, সত্যিটুকুর কানাকড়ি মূল্য নেই।

যা হবার নয়, তা না হওয়াই মঙ্গল।

দিল্লী স্টেশনে নামবার পরমুহূর্তেও কল্পনা করতে পারি নি, আমার মিথ্যা স্তোকবাক্য কি মারাত্মক মূর্তি ধারণ করে গ্রাস করতে উপস্থিত হয়েছে আমার বন্ধুটিকে। কিন্তু কোনও মতেই তখন সেই সর্বনাশা স্তোকবাক্যকে এড়াবার উপায় ছিল না।

অজস্র আলো অজস্র মানুষ আর অঢেল তাড়াতাড়ি-হুড়োহুড়িতে দিল্লী স্টেশন গমগম করছে তখন। নামলাম আমরা গাড়ি থেকে, আবার তিনি হাত রাখলেন আমার কাঁধের ওপর। অনেকে আশ্চর্য হয়ে তাকালে আমাদের দিকে। তাকানো অন্যায় নয়। একজনের

দামী লংকোট, দামী পাগড়ি, পাজামা জুতো তাও নেহাত আটপৌরে নয়। আর-একজনকে চিনতে মোটেই কষ্ট হয় না, আপাদমস্তক হতচ্ছাড়া ভিখারীর ছাপ। বেখাপ তুই মূর্তি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চলেছে। এ দৃশ্য না দেখে কে? ভিড় ঠেলে গেটের কাছে পৌঁছচ্ছি সেই ভাবে। প্লাটফরমের অন্য ধারে কলকাতার ডাকগাড়ি তৈরি। কাজেই দস্তুরমত ভিড়। ধাক্কা-গুঁতো খেয়ে পৌঁছলাম গেটের সামনে। দাঁড়াতে হল, যাবার যাঁরা তাঁদের আগে ঢুকতে দিতে হবে, তারপর প্লাটফরম ছেড়ে বেরবেন যাঁরা, তাঁরা বেরতে পাবেন।

সামান্য একটু সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম মানুষ দেখতে দেখতে। পেছনের প্রচণ্ড চাপে প্রায় চেপটে গেছি। খেয়ালও নেই যে কাঁধের ওপর থেকে তাঁর হাত সরে গেছে। হঠাৎ পেছনে কে চিৎকার করে উঠল—"দলজিৎ, দলজিৎ, দলজিৎ।" সেই প্রাণ-ফাটা আর্তনাদ শুনে সকলেই পেছন ফিরল। চমকে উঠে সর্বপ্রথম খেয়াল হল, আমার পাশে তিনি নেই। আঁকুপাঁকু করে খুঁজতে লাগলাম ভিড়ের মধ্যে। তারপর দেখতে পেলাম। একটু তফাতে ভিড়ের বাইরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। গোত্তা মেরে কোনও রকমে বেরিয়ে পড়লাম মানুষের চাপ থেকে। ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর পাশে। তারপর আর কিছুই করবার ছিল না, ব্যাপার দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

আমার সঙ্গীটি ওপর দিকে মুখ তুলে কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর তু'হাত ধরে একটি মেয়ে প্রাণপণে ঝাঁকাচ্ছে, কোনও রকমে যদি তাঁর দৃষ্টি নামাতে পারে। ঝাঁকাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে—"দলজিৎ, দলজিৎ, দলজিৎ।"

কি মর্মভেদী ডাক। স্টেশনের সব গোলমাল হট্টগোল নিমেষের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ফিরে দাঁড়াল সবাই, তারপর চতুর্দিকে বৃহৎ এক ব্যূহ তৈরি হতে লাগল।

সেই ব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলাম। তামাম ভারতের

সব জাতের সব শ্রেণীর মানুষের চোখের সামনে একটি সদ্যবিবাহিতা বাঙালী মেয়ে উৎকট নাটুকে কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে, এতে হঠাৎ আমার বাঙালীত্ব ভয়ানক রকম সজাগ হয়ে উঠল। বহু ভাষায় বহু রকমের মন্তব্য কানে গেল, সমবেদনার প্রবল বন্যায় ভেসে যায় বুঝি ওরা! কেমন করে ওদের অদৃশ্য করে দেওয়া যায় সকলের নজরের মাঝখান থেকে, অসহায় ভাবে তাই ভাবতে লাগলাম।

এই রকমই হয়। বাঙলা দেশের মাটির ওপর অতি অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করছে বাঙালীর ছেলেমেয়ে, এ দৃশ্য দেখলে ফিরে তাকাবারও ফুরসত হয় না। কিন্তু বাঙলার মাটি ছাড়ালেই অন্য অবস্থা। তখন একজন বাঙালীর এতটুকু নির্লজ্জপনা দেখলেই অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়ায়। কেমন করে ব্যাপারটা লুকনো যায় অপরের নজর থেকে, এই চিন্তায় পাগল হয়ে উঠতে হয়।

সেদিন দিল্লী স্টেশনের প্লাটফরমে হাজারখানেক বাতির আর হাজার জোড়া চোখের রোশনাইয়ের মাঝে অতি মূল্যবান শাড়ি-পরা, সর্বাঙ্গে জড়োয়া গয়না জড়ানো একটি বাঙালী মেয়ের খেপামি অনেকের কাছে হয়ত মস্তবড় একটা মজার ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। হতভাগা ফক্কড় আমি, ওই জাতের ব্যাপারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংস্রব রাখা উচিত ছিল না আমার। তৎক্ষণাৎ ওই স্থানটি ত্যাগ করলেই হাঙ্গামা চুকে যেত। কিন্তু তা পারলাম কই! আমি যে দেখে ফেললাম, মেয়েটির সীমন্তে রাশীকৃত শুকনো সিঁদুর, তার ওপর দিয়ে সোনার টিকলি একটি নেমেছে কপালের ওপর। দেখা মাত্রই এক নিমেষের মধ্যে অনেক কিছু আন্দাজ করে ফেললাম। তারপর যখন দেখতে পেলাম তার চোখ দুটি, কাজল-পরা চোখ দুটিতে জল টলটল করছে, তখন সটকে পড়বার কথাটা মনের কোণেও উদয় হল না। তার বদলে নিজেই আর-এক খেপামি করে বসলাম। খপ করে মেয়েটির একখানা হাত ধরে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে

বলে বসলাম—"চল বোন, চল শিগগির এখান থেকে। কোনও ভয় নেই, আমি এঁকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্যাস, তৎক্ষণাৎ এক বজ্রাঘাত হল পেছনে। হুংকার দিয়ে উঠলেন একজন—"চোপরাও বেয়াদব, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।"

ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদরওয়ালা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক মারমুখো হয়ে সামনের দু' সারি লোক কাটিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু মজা তিনি দেখাতে পারলেন না। মজা দেখাবার জন্যে আমার নাগাল পাবার আগেই আর-এক কাণ্ড ঘটে গেল। মেয়েটির ঠিক পেছনেই এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিখুঁত সাহেবী পোশাক-পরা অতি সুদর্শন এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক না বলে ছোকরা বলাই উচিত তাঁকে। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন তিনি আমার হাতখানা, যে হাতখানা দিয়ে মেয়েটির হাত আমি ধরেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধকণ্ঠে এক অনুরোধ—"তাই করুন দাদা, নিয়ে চলুন এঁকে। যেভাবে হোক নিয়ে চলুন এখান থেকে। ওই দেখুন আমাদের রিজার্ভ গাড়ি। আগে ওর ভেতর তুলুন এঁকে। তারপর—"

তারপর কি হবে, তাও শোনা গেল না। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আবার এক হুংকার দিয়ে উঠলেন—"ছায়া, হচ্ছে কি এসব সমীরের সামনে।"

মেয়েটি তখনও একভাবে ঝাঁকাচ্ছে আমার সঙ্গীর হাত দু'খানা, আর এক কথাই বলে যাচ্ছে—"দলজিৎ, দলজিৎ, দলজিৎ।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ততক্ষণে কোনক্রমে পৌঁছে গেছেন কাছে। আমাকে মজা না দেখিয়ে এক হেঁচকায় মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নিলেন দলজিতের হাত থেকে। আবার এক হুংকার দিলেন—"হচ্ছে কি এ সমস্ত, সমীর রয়েছে না।"

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি, দু'হাতে খামচে ধরল সাহেবী পোশাক-পরা ছোকরার কোট। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল—"না, দলজিতকে এখানে আমি কিছুতে ছেড়ে যাব না সমীর, কিছুতে ওকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারব না।"

তৎক্ষণাৎ সব গণ্ডগোলের ফয়সালা হয়ে গেল। অদ্ভুত এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল সমীরের চোখে মুখে। অত্যন্ত শান্ত গলায় প্রায় চুপিচুপি বললে—"ওঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। পথ ছাড়, আমি দেখছি।"

আকুল কণ্ঠে মেয়েটি বলতে লাগল—"তুমি পারবে সমীর, তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যেতে পারবে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওকে ওর বাপ-মার হাতে তুলে দিতে হবে। এই সেই ছায়ানট সমীর, এর কথা কতবার বলেছি তোমায়।"

ছায়াকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে সমীর সামনে এসে দাঁড়াল। দলজিতের দু' কাঁধের ওপর দু' হাত রেখে ইংরেজীতে বললে—"চল বন্ধু, চল আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।"

এতক্ষণ পরে নামল চোখের দৃষ্টি, পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দলজিৎ সমীরের মুখের দিকে। তারপর খুব চুপিচুপি ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে?"

জবাব দিলে ছায়া—"আমার স্বামী দলজিৎ, আমার বিয়ে হয়ে গেল যে। এখানে আসবার আগে কত খুঁজলাম তোমায়, কেউ ঠিকানা দিতে পারলে না। এই দিল্লীতেই বিয়ে হল, তুমি থাকলে কত আনন্দ হত।"

হাসল দলজিৎ, খুবই মিষ্টি করে হাসল। বললে—"আমিও যে তোমায় খুঁজছি গোমা। তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসবার পরে তোমায় খুঁজতে বেরিয়েছি আমি—"

ফিরে দাঁড়াল ছায়া সমীরের দিকে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগল—"ওই শোন সমীর, এখনও ও আমায় গোমা বলে ডাকল।

কি মুশকিলে পড়েছি দেখ আমি, ও এখনও আমায় ওর গোমাবতী বলে ভুল করছে।"

কথাটা সমীর শুনতে পেল কি না, বোঝা গেল না। দলজিতকে সে আবার অনুরোধ করল—"এখানে আর কোনও কথা নয়। চলুন, ওই আমাদের গাড়ি। গাড়িতে বসে আলাপ হবে।"

নড়ল না দলজিৎ। সকলের মাথার ওপর দিয়ে বহু দূরে দৃষ্টি চলে গেছে তার তখন। সমীরের অনুরোধের জবাব না দিয়ে নিজেকেই যেন সে প্রশ্ন করল—"কেন? কেন আমি যাব?"

তেড়ে উঠল ছায়া—"যাবে না মানে? এই ভাবে নিজেকে নষ্ট করবে নাকি তুমি? এই জন্যে তোমায় আমি গান শুনিয়েছি?" ক্ষোভে অভিমানে বন্ধ হয়ে গেল তার গলা।

দলজিৎ চুপ, সমীরও চুপ, চতুর্দিকে সবাই প্রায় চুপ।

হঠাৎ আমার মাথায় এক খেয়াল এল। টপ করে বলে ফেললাম —"তুমিই পারবে বোন, তুমি পারবে এঁকে নিয়ে যেতে। যে গান শুনিয়েছ এঁকে, আবার তাই শোনাও, তাহলেই কাজ হবে।"

"ঠিক," চেঁচিয়ে উঠল ছায়া। বলেই সহস্র জোড়া চোখের সামনে এক হাত তুলে দিল দলজিতের কাঁধে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গান আরম্ভ করলে—

"আমি যখন ছিলেম অন্ধ—
সুখের খেলায় বেলা গেছে—পাই নি তো আনন্দ।
আমি যখন ছিলেম অন্ধ।"

আশ্চর্য ফল ফলল। বার দু'য়েক এইটুকু গাইতেই চলতে শুরু করল দলজিৎ। ওর এক পাশে সমীর, অপর পাশে ছায়া, পেছনে আমি। আমাকে যে যেতেই হবে, দলজিতের পেটমোটা ব্যাগটা তখনও যে আমার ঝুলির মধ্যে।

আমার পাশেই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বিড়বিড় করে গজরাতে

গজরাতে চললেন—"এখানেও এসে জুটল আপদ। মেয়ে নিয়ে পালিয়ে এলাম দিল্লীতে, ভালয় ভালয় বিয়েটা যদিও বা হল—"

তাঁর গজরানি আর কানে গেল না। ছায়ার গানে মন দিলাম।

"খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলাম মেতে—
ভিত ভেঙে যেই এলে ঘরে—ঘুচল আমার বন্ধ।
সুরের খেলা আর রোচে না পেয়েছি আনন্দ॥"

ওঁদের রিজার্ভ করা কামরায় ওঁরা উঠলেন। আগে দলজিতকে তুলে দিয়ে তারপর উঠল ছায়া, তারপর উঠল সমীর। গাড়িতে উঠেই সমীর বললে—"আর একখানা টিকিট আনতে হবে যে।"

জানলার ধারেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাড়াতাড়ি বললাম—"ওঁর মনিব্যাগ আছে আমার কাছে।"

ছায়ার বাবা খিঁচিয়ে উঠলেন—"ওর টাকা তোমার কাছে গেল কেমন করে?"

বললাম—"আমার কাছে রাখতে দিয়েছেন উনি। কাল রাতে ওঁকে কুরুক্ষেত্রে দেখতে পাই। সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এলাম।"

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বগতোক্তি করলেন—"আর কোনও চুলোয় নিয়ে যেতে পারলে না।"

ওঁর স্বগতোক্তি কানে গেল অনেকের, কেউই কান দিল না। ব্যাগটা নিয়ে আমি গাড়ির মধ্যে বাড়িয়ে ধরলাম। বললাম—"এটা রাখুন আপনারা। দেখে নিন, ওতে কত আছে।"

চিৎকার করে উঠল ছায়া—"তার মানে! আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে?"

সঙ্গে সঙ্গে সমীর বলল—"নিশ্চয়ই যাবেন। আমিই যাচ্ছি, দু'খানা টিকিট নিয়ে আসি।" বলতে বলতে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল।

পরমুহূর্তেই ছিটকে পড়ল প্লাটফরমের ওপর। দরজার সামনে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, পড়ল একেবারে তাদের ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়ল দলজিৎ। পড়েই ছুট।

"ধর—ধর—" আর্তনাদ করে উঠল ছায়া গাড়ির ভেতর থেকে। সে কথা কানে যাবার আগেই আমি ছোটা শুরু করেছি। আমাদের পেছনে আরও মানুষ ছুটতে লাগল।

গেটে যিনি টিকিট নিচ্ছিলেন, তিনি এক ধাক্কায় এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। বেরল দলজিৎ প্লাটফরম থেকে। হাত দু'তিন পেছনে আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

মানুষের ভিড়ের মধ্যে ছোটা সহজ নয়। বেপরোয়া দলজিতের পক্ষে অবশ্য একান্ত সহজ। ধাক্কার চোটে কে হুমড়ি খেয়ে পড়ল না পড়ল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার মত মানসিক অবস্থা নেই তখন ওর। আমার কিন্তু ছিল, কাজেই আমি পদে পদে বাধা পেতে লাগলাম। বেহুঁশ দলজিৎ প্রচণ্ড বেগে নামল পথে। তখনও স্টেশন পার হতে পারি নি আমি।

"গেল—গেল—গিয়া—" বহু কণ্ঠের আর্তনাদে ফেটে পড়ল চারিদিক। ঘ্যাঁ—কোঁচ—বিকট শব্দ হল গাড়ি বাঁধবার। ততক্ষণে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি গাড়ির সামনে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তুলে বসালাম ওকে। রক্তে আমার মুখ বুক ভেসে যেতে লাগল। নতুন বুইকখানার চকচকে মুখেও খানিক লাল রক্ত লেগে গেল।

৭

এই কাহিনীটি এখানেই শেষ হয়ে গেল, অথবা এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত এর। কিন্তু তা হবার নয়। ফক্কড়ের কপাল ছাইমাখা, ফক্কড় কপালে ভস্ম লেপন করে। সেই ভস্মের অন্য কোনও গুণ আছে কি নেই, তা বলা শক্ত। তবে একটা গুণ আছেই। সেটি হল, ফক্কড়ের কপালে আহ্বান জোটে। অর্থাৎ কিনা, ফক্কড় অনাহূত নয়। ফক্কড় সঙ্গে যাবে না, এ একটা মস্তবড়

আজগুবী ব্যাপার। গলাধাক্কা দিয়ে না তাড়ালে ফক্কড় নিজে থেকে বিদেয় নেবে, এটা খুবই অস্বাভাবিক কাণ্ড। যে যেচে এসে জোটে, সে কি যেচে বিদেয় নিতে পারে!

বহুবার ফক্কড়কে শুনতে হয়—"তার মানে! আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে!" অর্থাৎ কিনা, ফক্কড়ের থাকবার প্রয়োজন ঠিক কোনখানে গিয়ে মেটে, তা কেউ আন্দাজই করতে পারে না। অন্যের কথা বাদ দিলেও, ফক্কড় নিজেই কি ধারণা করতে পারে, কবে কখন কোনখানে তাকে যেতে হবে এবং কোন মুহূর্তটি আবার বিদায়ের মুহূর্ত হয়ে উদয় হবে!

এই কাহিনীটির যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে বিদায় নিতে পেরেছিলাম, ততদূর পর্যন্ত না বললে, কাহিনীর শেষ হবে কেমন করে! কোনখানে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবার পর ছুটি পেলাম ওঁদের কাছ থেকে, এখন সেইটুকুই বলি।

দিল্লী স্টেশন থেকে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির ওধারে মস্ত এক অট্টালিকার দোতলার এক ঘরে পৌঁছলাম। মেয়ের বিয়ের জন্যে বাড়ির এই অংশটা ভাড়া নিয়েছিলেন ছায়ার বাবা। বিয়ের পর কলকাতা ঘুরে এসে মেয়ে-জামাই এই বাড়িতেই থাকবে কিছু দিন—এই ব্যবস্থাই ছিল। সামান্য একটু ওষুধপত্র দিয়ে হাসপাতাল যখন বলল—আঘাত এত সামান্য যে হাসপাতালে রাখার উপযুক্ত নয়, তখন মেয়ে-জামাই জিদ ধরে বসল, ওই বাড়িতেই দলজিতকে নিয়ে যেতে হবে। ওই অবস্থায় রাস্তায় ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা ভদ্রলোককে রাজী হতে হল। দলজিতকে নিয়ে গিয়ে তোলা হল মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে কেনা নতুন খাটে, যে খাটে আগের রাতটা ছায়াই কাটিয়েছে সমীরের সঙ্গে। দলজিৎ বেচারা টেরই পেল না তার সৌভাগ্যটা। বেহুঁশ হয়ে রইল সে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।

দলজিৎ শুয়ে আছে খাটে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার ধারে মুখ গুঁজে প্রায় নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছে ছায়া। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমীর, ধরে রয়েছে দলজিতের কবজিটা। দেখছে, কেমন করে আস্তে আস্তে নাড়ীর স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসছে। আর ঘরে আছি আমরা দু'টি প্রাণী, আমি আর ছায়ার বাবা। শেষ মুহূর্ত এত তাড়াতাড়ি উপস্থিত হচ্ছে দেখে, ভদ্রলোক সত্যিই অস্থির হয়ে উঠলেন। জামাই বিলেতফেরত ডাক্তার। তাঁর আশা ছিল, জামাই কিছু করতে পারবে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি—"আর কোনও আশাই নেই সমীর? একটা কিছু উপায়—"

বিছানার ধার থেকে মুখ তুলে ডুকরে কেঁদে উঠল ছায়া—"এত দিন কি শিখে এলে তুমি ও দেশ থেকে? কি শিখে এলে?"

ডাক্তার দাঁতে দাঁত চেপে দলজিতের কবজিখানা ধরে স্থির হয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ দেখা গেল, দলজিতের ঠোঁট নড়ছে। তারপর সকলে শুনতে পেলাম, ক্ষীণ কণ্ঠে গান ধরেছে দলজিৎ। প্রথমে অস্পষ্ট, ক্রমে সেটুকুও কেটে গেল। বেশ বোঝা যেতে লাগল গানের ভাষা। দলজিৎ গাইতে লাগল—

"ভীষণ আমার রুদ্র আমার নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার
উগ্র ব্যথায় নূতন করে বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব কিছু মোর নিলে এসে—"

তারপর আর শোনা গেল না। চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টি ঘুরিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল দলজিৎ। ততক্ষণে ছায়া ধরে ফেললে—

"সেদিন আমি পূর্ণ হলেম, ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।"

তারপর দলজিতের গলাও মিশল ছায়ার গলার সঙ্গে—

"দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ।"

ফুরিয়ে গেল গান।

দলজিতের বুকের ওপর একখানা হাত রেখে বার তিনেক গুমরে উঠল ছায়া—"দলজিৎ—দলজিৎ—দলজিৎ।"

ডাঃ সমীর সেন স্ত্রীর কাঁধে আলতো ভাবে একখানি হাত রাখলেন।

নিঃশব্দে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

হয়ে গেল বিদায় নেওয়া বিনা আড়ম্বরে।

সুখদুঃখের পারে পৌঁছে আনন্দই হয়ত পেল দলজিৎ। ফক্কড়ও মুক্তি পেল। ফক্কড়-জীবনে সবই স্বল্প, সবই ক্ষণস্থায়ী। পথে কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ পথেই হারিয়ে যাবে—এই হল ফক্কড়-জীবনের আইন। এর জন্যে হা-হুতাশ করে না ফক্কড়, মাথা কুটে মরে না। কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ যত অমূল্যই হোক, তা যত তাড়াতাড়ি খোয়া যায় ততই স্বস্তি। হারিয়ে গেলে মুক্তির আনন্দে ফক্কড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

তারপর পথ তো আছেই। আর যাই হারাক, ফক্কড় কখনও পথ হারায় না। পথ হারাবার ভয় না থাকায় যখন-তখন যে-কোনও পথে পা দিতে ফক্কড় পিছপা হয় না।

দিল্লীর পথে নেমে কিন্তু পথ হারিয়ে ফেললাম। তার কারণ, দিল্লীতে কোনও পথ নেই। দিল্লীর পথ হল সমাধি-মন্দিরের পথ, দিল্লীর সব পথই ঘুরে-ফিরে সমাধি-মন্দিরের দরজায় গিয়ে পৌঁছেছে।

দুটো দিন দুটো রাত কেটে গেল মৃত্যুপথে ঘুরে ঘুরে। দিল্লীতে প্রবেশ করলেই পস্তাতে হবে—এটি হল আপ্ত-বাক্য। আপ্ত-বাক্যের আবর্তে পড়ে পাক খেয়ে মরতে লাগলাম। অফুরন্ত মাঠ, অঢেল লালচে মাটির ঢেলা আর অযাচিত আকাশ। আকাশের যেন কূলকিনারা নেই। দিল্লীর আকাশ হাসে না, কাঁদে না, গোমড়া মুখ করে থাকে না। এক ভাবে নির্মম নির্লিপ্ততায় তাকিয়ে থাকে

লালচে মাটির-বুকে-গড়া পাষাণকারাগুলোর পানে। বহু যুগের বহু মানুষ আত্মঘাতী আত্মশ্লাঘার তাড়নায় গড়ে তুলেছে সেই সব পাষাণদুর্গ। অনন্তকালের জন্য নিজেদের বন্দী করেছে পাষাণের তলায়। দিল্লীর মাটিতে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে দিল্লীর আকাশে। সেই মুক্তি আকাশ থেকে নেমে বয়ে চলেছে যমুনার স্রোতের সঙ্গে। দিল্লী গেলে পস্তাতে হবেই, কারণ দিল্লীর মাটি মুক্তি কি বস্তু জানেই না।

আমিও পেলাম না মুক্তি, বিদায় নেওয়ার পরেও দিল্লী আমায় ধরে রাখল। বাদশাহী নেশার আমেজ ধরে গেল ফক্কড়ের ধমনীতে। বাদশাহী চালে বাদশাদের কবরখানায় হানা দিয়ে ফিরতে লাগলাম।

বাদশা হুয়ায়ুন কত বড় বাদশা ছিলেন, তার একটা আন্দাজ পাবার আশায় ঢুকে পড়েছিলাম সেদিন সকালে হুয়ায়ুন-সমাধি-মন্দিরে। ওটি যে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির এত কাছে, তা কিন্তু আন্দাজ করতে পারি নি। তা ছাড়া এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, ছায়ার বাবা নিশ্চয়ই মেয়ে-জামাই নিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। নাও যদি গিয়ে থাকেন, তাহলেও ফক্কড়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই সর্ব সম্পর্ক চুকে গেছে তাঁদের। এই রকম সব সুনিশ্চিত আন্দাজ-বে-আন্দাজ করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দিল্লীতে। বিপত্তি ঘটল হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরে। খোদ বাদশায়ের সমাধির ধারেই অঘটনটা ঘটে গেল। বাদশা সাক্ষী রইলেন।

সামান্য একটু শব্দ হল—চটাস্।

সামান্য শব্দটুকুও বেশ অসামান্য হয়ে উঠল মৃত্যুর মত স্তব্ধ বাদশাহের সমাধি-ঘরে। সমাধির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম পাষাণের তলায় সম্রাটের আসল রূপটি দেখবার। বাধা পড়ল, চমকে উঠে তাকালাম পাশে। নজরে পড়ল দু'টো টিকটিকি। হাতখানেক তফাতে আছড়ে পড়েছে তারা। নিচু হয়ে দেখলাম,

ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ওদের কুতকুতে চোখগুলো, হাত-পাগুলো টানটান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একটু বেশী রকম চেপ্‌টা দেখাচ্ছে ওদের পেট। মনে হল, দফা-রফা হয়ে গেছে বেচারাদের। নিভৃতে পরম নিশ্চিন্তে দাম্পত্য-লীলায় মগ্ন ছিল দু'টিতে, আনন্দের চরম মুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল সর্বশরীর, সঙ্গে সঙ্গে পতন। নিমেষের মধ্যে ধাক্কা লাগল কঠিন ধরিত্রীর সঙ্গে। নবজীবনের আবাহন-যজ্ঞে দু'দুটো প্রাণ পূর্ণাহুতি পড়ল।

মুখ তুলে তাকালাম।

কোথা থেকে পড়ল ওরা!

অনেক উঁচুতে সুডৌল গোল প্রকাণ্ড একটা গর্ত। হাঁ-করা কন্ধকাটার মুণ্ড একটা শূন্যে ঝুলছে। পাতলা আঁধার জমে রয়েছে হাঁ-এর মধ্যে। ঠিক তার নিচে দুধের মত সাদা পাষাণ-আবরণীর তলায় শুয়ে আছেন সম্রাট হুমায়ুন।

বুঝতে পারলাম সেদিন, ওই ভাবে সমাধি-মন্দির গড়া হয়েছিল কেন। বাইরে থেকে দেখলে যেটা গম্বুজ, ভেতর থেকে দেখলে সেটা মহাকালের মুখগহ্বর। মানেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যিনি শুয়ে আছেন সমাধির মধ্যে, তাঁকে অষ্টপ্রহর অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে সেই বীভৎস রক্তশূন্য হাঁ-টার দিকে। কি নির্মম শাস্তি!

মহামান্য সম্রাটের সমাধি, সমাধির উপযুক্ত গম্বুজ। গম্বুজের তলায় দাঁড়িয়ে কেমন যেন দম আটকে এল। মনে হল, আমারও যেন সমাধি-মন্দির ওটা। যুগ যুগ ধরে আটকা পড়ে আছি ওই পাষাণ-কারায়। অসংখ্য প্রশ্নের চাপে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। কতকাল বন্দী থাকতে হবে! কত যুগ লাগবে, ওপরের ওই মহাশূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে যেতে! তন্দ্রাহীন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে অনন্তকাল পড়ে থাকতে হবে নাকি পাতালগর্ভে! সম্রাটের সম্মোহন নিদ্রায় পেয়ে বসল আমায়, ঢুলতে লাগলাম।

ঢুলতে ঢুলতে শুনতে লাগলাম—সমাধি-সঙ্গীত।

"অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা
গোপনে চায় আলোক সুধা—"

সুরটা কানে যেতে চটকা ভাঙল। মুখ তুলে তাকালাম গম্বুজের তলার অলিন্দের দিকে। ওপাশের দু'টো ফোকর দিয়ে আলো এসে ঢুকেছে। অতি দীর্ঘ তিনকোনা দু'টো তলোয়ার বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্রাটের সমাধি-মন্দিরে। শ্বেতপাথরের স্তূপকে খান্ খান্ করে সম্রাটকে মুক্তি দিতে অন্তরীক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন মুক্তি-দেবতা। তাঁর আবাহন-সঙ্গীত শুরু হয়েছে।

"আমার রাতের বুকে সে-যে তোমার প্রাতের আপন প্রিয়॥"

তলোয়ার দুটোর উজ্জ্বলতা ক্রমেই বাড়তে লাগল, ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল পাষাণ ভাঙার গান।

"তারি লাগি আকাশ রাঙা—
আঁধার ভাঙা অরুণ রাগে,
তারি লাগি পাখির গানে
নবীন আশার আলাপ জাগে।"

নতুন আশায় তাকিয়ে রইলাম অলিন্দের দিকে।

তারপর দেখা গেল—একটা ফোকরের সামনে আলোর মাঝে ফুটে উঠল আঁধার দিয়ে গড়া দুটি মূর্তি একজন আর-একজনকে জড়িয়ে ধরে আছে।

আবার তারা মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, ফোকরটা শূন্য হয়ে গেল। সুর কিন্তু মিলিয়ে গেল না। আড়াল থেকে ভেসে আসতে লাগল—

"নীরব তোমার চরণধ্বনি—
শুনায় তারে আগমনী,
সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে—
সকালবেলা তুলে নিও।"

নজর নামিয়ে আনলাম।

নিথর হয়ে রয়েছে বাদশার সমাধি, হাতখানেক তফাতে নিথর হয়ে পড়ে আছে টিকটিকি দু'টো। ওপরের সেই বীভৎস হাঁ থেকে শুরু করে নিচের মেঝে পর্যন্ত বিশাল ফাঁকটুকু জুড়ে নিরেট নিশ্চিদ্র মৃত্যু থমথম করছে।

সেই মৃত্যুর বুকে মহাসংগীতের ঢেউ উঠেছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে সেই সংগীত। এবার শুনতে পাওয়া গেল ডান দিকের ঘোরানো সিঁড়ির মুখে।

"তোমার স্বর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার রমণীয়।
জাগরণের সঙ্গিনী সে, তারে তোমার পরশ দিয়ো ॥"

আবির্ভূত হল একটি পুরুষ সিঁড়ির মুখে। লাফিয়ে নামল মেঝেয়, তারপর অতি সাবধানে নামাল তার সঙ্গিনীকে। তখনও গানের রেশ মিলিয়ে যায় নি। গুনগুনিয়ে উঠল—

"স্বর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার রমণীয়।
জাগরণের সঙ্গিনী সে, তারে তোমার পরশ দিয়ো।"

তারপর ওরা ফিরে দাঁড়াল। তখন আর লুকব কোথায় নিজেকে! ছেদ পড়ল ফক্কড়ের পথ চলায়। ফক্কড় পথ হারাল।

চিৎকার করে উঠল ছায়া, একনিঃশ্বাসে একরাশ প্রশ্ন করে বসল।

"অ্যাঁ! দিল্লীতে আছ তুমি এখনও! এ-কটা দিন কাটালে কোথায়? কেন পালিয়ে এলে সেদিন অমন করে?" বলতে বলতে ছুটে এল। তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে ওকে থামালাম।

"দাঁড়াও। ওরা পিষে যাবে তোমার পায়ের তলায়।"

"কারা! কারা পিষে যাবে?"

আঁতকে উঠে দৃষ্টি নামিয়ে খুঁজতে লাগল মেঝের ওপর।

দেখিয়ে দিলাম টিকটিকি দু'টোকে। বললাম—"একটু আগে ওরা আছড়ে পড়ল গম্বুজের ভেতর থেকে।"

তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল ছায়া টিকটিকি দু'টোর পাশে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল—"আহা রে, অত উঁচু থেকে পড়ে গেল! আর কি ওরা বাঁচবে!"

ধীর শান্ত কণ্ঠে সমীর বললে—"ওরা বেঁচে আছে, মরে নি। কিছুক্ষণ ওই ভাবে থাকবে, তারপর নড়েচড়ে উঠে পালাবে। অত উঁচু থেকে পড়েছে বলে আড়ষ্ট হয়ে আছে, দম নিতে পারছে না। ওদের মুখে ফুঁ দাও খুব জোরে, তাহলে তাড়াতাড়ি নড়ে উঠবে।

দু'হাতে মেঝের ওপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল ছায়া তৎক্ষণাৎ। তারপর চলল ফুঁ দেওয়া। বার কতক ফুঁ দিতেই নড়ে উঠল একটা। মুখ তুলল ছায়া, লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। বললে—"দেখেছ তোমরা, সত্যি যেন নড়ে উঠল না?"

সমীর বললে—"নড়ছেই তো। আরও গোটাকতক ফুঁ দাও, তাহলে ছুটে পালাবে।"

হলও তাই। আরও কয়েকটা ফুঁ দেবার ফলে টিকটিকিটা লেজ নাড়তে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সমাধির ধার ঘেঁষে শুয়ে রইল।

একটু দম নিয়ে আবার নিচু হয়ে পড়ল ছায়া আর-একটা টিকটিকির ওপর। আবার চলল ফুঁ দেওয়া। এবারও ফল ফলল, সেটাও একটু একটু করে সরে গিয়ে বসল ওধারের দেওয়াল ঘেঁষে। উঠে দাঁড়াল ছায়া, মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। দুই চোখ চকচক করছে তৃপ্তির আলোয়। ওর ফুঁ-এর জোরে দু'দুটো জীব ফিরে এল মৃত্যুমুখ থেকে। এটা সম্ভব হল ডাক্তার স্বামীর পরামর্শ শুনে। স্বামীর চোখের ওপর চোখ রেখে সামান্য একটু কৃতজ্ঞতার না কৃতার্থতার হাসি হাসল, ঠিক বোঝা গেল না।

সে হাসিটুকু উপেক্ষা করে আমার দিকে এগিয়ে এল সমীর।

কণ্ঠে তার ক্ষুব্ধ অভিমান। বললে—"এ কি রকম ব্যাপার বলুন তো! কিছু না বলে-কয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। ভেবে ভেবে খুন হচ্ছি আমরা, আর সারা দিল্লী শহরটা চষে ফেলছি। কি করে জানব, এত কাছে এই হুমায়ুন-সমাধিতে লুকিয়ে বসে আছেন।"

বললাম—"এখানে কাউকে লুকিয়ে থাকতে দেয় না। কড়া পাহারা আছে। কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছি।"

ধমকের স্বর বার হল ছায়ার গলা থেকে—"তাহলে কোথায় কাটানো হল শুনি এতখানি সময়? আবার সেই মনিব্যাগটা পর্যন্ত ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। কেন, আমরা কেন রাখতে যাব আপনার বন্ধুর জিনিস?"

চুপ করে রইলাম। সব কথার জবাব সব সময় দিতে নেই। জবাব দিতে গেলে বলতে পারতাম, মনিব্যাগ আমার সম্পত্তি নয়। বলতে পারতাম, যার জিনিস সে আমার বন্ধু ছিল না। আমার চেয়ে ঢের বেশী সম্বন্ধ ছিল তার তোমাদের সঙ্গে। আরও নানা কথা বলতে পারতাম। তোমাদের জানিয়ে আসি নি, তাতে অন্যায়টা হয়েছে কোথায়? তোমাদের সঙ্গে কতক্ষণ কাটাব, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমার মর্জির ওপর। আরও নানা জাতের সোজা কথা স্পষ্ট ভাবে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারতাম। কিন্তু ওরকমের কিছু করতে প্রবৃত্তিই হল না। ওরা যদি শুধু মুখের কথা বলত, তাহলে মুখের কথা দিয়েই ওদের মুখ বন্ধ করা যেত। কিন্তু যে ভাষায় যে কথা ওরা বললে, তা প্রাণের ভাষা, তা অন্তরের কথা। ঠোঁটের ভাষা আর বুকের ভাষায় তফাত আছে। একান্ত পর রাস্তার একটা হতচ্ছাড়া কুকুরের সঙ্গে মান-অভিমান ধমকাধমকি সহজে কেউ করতে পারে কখনও!

কাজেই কিছু বলা হল না। নেহাত অপরাধীর মত বোকা-বোকা হাসতে লাগলাম।

কথা বাড়াবার আর অবকাশই দিল না ছায়া, আবার ধমকাধমকি জুড়ে দিলে।

"চল, শীগ্গির ফিরে চল সব। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ পর্যন্ত কি গেছে মহাপুরুষের পেটে। ভাগ্যে আজ সকালে এখানে বেড়াতে আমার শখ হল! চল, চল, আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই।"

অতঃপর হুমায়ুন বাদশার সমাধি-মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম বন্দী হয়ে। জানি না, বাদশা তখন মুখ মুচকে হেসে ফেললেন কি না! কিছুক্ষণ আগে কঠিন পাষাণের অন্তরালে বাদশাহের বন্দিত্ব নিয়ে হা হুতাশ করছিলাম মনে মনে। হায়, তখন কি জানতাম, পাষাণের চেয়ে আরও কঠিন আরও নির্মম আরও বহুগুণ ভারী এক অদৃশ্য আবরণের আড়ালে আমাকেই বন্দী হতে হবে!

ফক্কড়ের কপাল ভস্ম লেপা। ভস্মাচ্ছাদিত লালাটে আহ্বান জোটে। সেদিন রাত্রে দলজিতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চোরের মত চুপিচুপি সরে পড়েছিলাম যেখান থেকে, ঠিক সেখানেই ফিরে যেতে হল। স্বামী-স্ত্রীর উচ্ছ্বসিত আবদারের তোড়ে ফক্কড়ের নিষ্করুণ নির্লিপ্ততা ভেসে গেল। ফিরে না যাবার চোখা চোখা যুক্তিগুলো আওড়াতে গিয়েও আওড়ানো হল না, সব যেন কেমন ভোঁতা বলে মনে হল।

বুঝতে পারলাম, দিল্লীতে যখন ঢুকেছি তখন প্রচুর পরিমাণে পস্তানো কপালে আছেই।

৭

কেটে গেল পাঁচটা দিন পাঁচটা রাত। পাঁচ-পাঁচটা আস্ত দিন আস্ত রাত ছলনার সঙ্গে ছলনা করে কেটে গেল। অতি অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! নিজেদের ঠকাবার জন্যে ওরা একটা ফালতু লোককে ধরে নিয়ে এল ঠকাতে। নিয়ে এসে তাকে মাঝখানে বসিয়ে রেখে নিজেরা ঠকে মরতে লাগল।

আর একটি বেলা, আর একটি দিন, মাত্র এই রাতটা, শুনতে শুনতে রয়ে গেলাম নবদম্পতির সঙ্গে। ওরা দু'জনের একজন ঠায়

বসে রইল আমার পাশটিতে। সদ্য বিয়ের পর দু'জনে দু'জনকে নিয়ে মেতে থাকবে, চেনা-জানা মানুষের ভিড়ে প্রথম মিলনের মাধুর্যময় মুহূর্তগুলো অনর্থক অপচয় হবে না, এইরকম কিছু আশা করেই বোধ হয় ছায়ার বাবা মেয়ে-জামাইকে দিল্লীতে রেখে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর আশাটা নাহক ভেস্তে গেল। ওরা করে বসল একদম উলটো ব্যবস্থা। তৃতীয় এক উড়ো আপদকে পথ থেকে ধরে এনে মাঝখানে বসিয়ে রেখে এ হেন হৈ-হট্টগোল জুড়ে দিলে যে কে বলবে ওরা স্বামী স্ত্রী। কে বলবে যে এতটুকু আড়াল-আবরুর প্রয়োজন আছে ওদের। কার সাধ্য ধারণা করবে, নিভৃতে কোনও কিছু নেওয়া-দেওয়ার কিছুমাত্র গরজ আছে ওদের জীবনে।

কিছুই নয়, খুবই সাধারণ সম্পর্ক। একান্ত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ। যেমন উদার তেমনি অকপট বন্ধুত্ব। তার মধ্যে শুধু তৃতীয় ব্যক্তি কেন, বিশ্বসুদ্ধ সমস্ত ব্যক্তির স্থান হতে পারে। থ হয়ে গেলাম নতুন স্বামী-স্ত্রীর আচার-ব্যবহার দেখে। এটা আবার কি জাতের ছলনা!

আদর-আপ্যায়নের বন্যা বয়ে যেতে লাগল ফক্কড়ের ওপর দিয়ে। কে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে অতিথির পাশে তার প্রতিযোগিতা চলতে লাগল। অতিথিসেবায় এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল দু'জনে যে নিজেদের সম্বন্ধটা বেমালুম ভুলে মেরে দিলে। রাতেও নিস্তার নেই। স্বামীটি দাবা পেতে বসে অর্ধেক রাত পার করে দেন, তারপর স্ত্রীটি আসেন একখানা বই হাতে নিয়ে। তখন স্বামী উঠে যান শোবার ঘরে। বাকী রাতটুকু বই হাতে নিয়ে বসে থাকেন স্ত্রীটি অতিথির সামনে। নড়বার আর নামটি নেই।

দস্তুরমত দুর্বিপাক। দাঁত বার করে সহ্য করাও কঠিন। বেশ বুঝছিলাম, আমাকে ঘিরে মস্তবড় একটা ফাঁকিবাজির খেলা ওরা খেলছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু ধরতে পারছিলাম না। একটি মুহূর্তের জন্যে দু'জনে একসঙ্গে আমার নজরের আড়ালে যাবে না, এই হল

ওদের পণ। সেই পণ বজায় রাখার জন্যে ওরা যে নারীপুরুষ, তাও যেন ভুলে গেল। মান-অভিমান ছলাকলা এমন কি চোখের ভাষাতেও এতটুকু রহস্য নেই, রোমাঞ্চ নেই, ইঙ্গিত নেই। কি সহজ স্বাভাবিক চালচলন! কি নিখুঁত বন্ধুত্ব! একে অপরের মনের মত করে কিছু করবার জন্যে কি চমৎকার ব্যাকুলতা! অনবদ্য অভিনয় কতদূর পর্যন্ত প্রাণময় করে তোলা যায়, তার চমৎকার নিদর্শন।

দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠলাম। রহস্যটার জোট ছাড়াবার জন্যে হাত-পা নিশপিশ করতে লাগল। কিন্তু করবারও কিছু উপায় নেই। হেঁজিপেঁজি মানুষ নয় ওরা, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে দু'জনেরই। অপর্যাপ্ত লেখাপড়া শিখেছে। একজন বিলেতফেরত ডাক্তার, অপর জন মনোবিদ্যায় মাস্টার। বেশ কয়েক বছর আগেই মন দেওয়া-নেওয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে। এতদিন পরে এসেছে মিলনের শুভলগ্ন। সে লগ্নটিকে ওরা হেলায় হারাচ্ছে। কোন একটা অদৃশ্য শক্তি যেন খাড়া রয়েছে ওদের মাঝখানে। কোনও মতেই ওরা পার হতে পারছে না সেই শক্তিতে, কিছুতেই পৌঁছতে পারছে না পরস্পরের কাছাকাছি। ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে থেকে একে অপরকে পাহারা দিচ্ছে। আর সমস্ত ব্যাপারটার একটা জলজ্যান্ত সাক্ষীর প্রয়োজন আছে বলে উটকো একজনকে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছে মাঝখানে।

কিন্তু উটকো মানুষটিরও সহ্যের সীমা আছে। দেখতে দেখতে সেই সীমা পার হয়ে এলাম। মরীয়া হয়ে উঠলাম নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। ঠিক করলাম, আর পালানো নয়। সাফ বলে-কয়ে বিদেয় নেব। ইচ্ছে করে আছি বলেই না ধরে রেখেছে। এই চললুম—বলে চলে গেলে আটকাবে কিসের জোরে? কি সম্বন্ধ আমার ওদের সঙ্গে?

সম্বন্ধটা যাচাই করতে গেলাম।

শেষ রাতের দিকে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ছোট্ট ঘরখানির

সামনে ছোট্ট একটু ছাত। প্রায় সারাটা রাত কেটে যায় সেই ছাতের ওপর। প্রথম রাতটা সমীর দাবা খেলে, শেষ রাতটা ছায়া বই পড়ে। শেষ পর্যন্ত ওকে একলা রেখেই ঘরে ঢুকে চারপায়ার ওপর শুয়ে পড়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম, ও খাটো গলায় গাইছে—

"কুলহারা কোন রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের ধারে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে, ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে
আপন মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে ত নয়, অরূপ মাধুরী।"

গানটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। কম্বলখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বেশ চমকে উঠল, একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল। চুপ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

এগিয়ে গিয়ে একেবারে ওর সামনাসামনি দাঁড়ালাম।

তখনও একভাবে তাকিয়ে আছে।

বললাম—"চলি। নিচের দরজাটা বন্ধ করে দেবে চল।"

উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। খুবই চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায়?" যেন ভয়ানক গোপনীয় কিছু জানতে চাচ্ছে।

টপ করে জবাব জোগাল না মুখে, একটা ঢোক গিলতে হল। তারপর জোর করে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললাম—"চলে যাচ্ছি দিল্লী থেকে।"

অত্যাশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ। ডাক্তার সমীর সেনের স্ত্রী এক হাত তুলে খামচে ধরলেন আমার কাঁধ। মুখখানি কানের পাশে নিয়ে এসে বললেন—"আমাকেও নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিঃশ্বাস আটকে রইল আমার। তারপর যখন ফের শ্বাস টানতে পারলাম তখন উৎকৃষ্ট বিলিতী আতরের

সৌগন্ধে মগজের ভেতরটা বেশ জুড়িয়ে গেছে। কাজেই একটু হাসি ফুটে উঠল মুখে। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় ?"

তখনও ঠিক সেই ভাবে খামচে ধরে আছে আমার কাঁধ। টের পেলাম, ভয়ানক কাঁপছে হাতখানা আমার কাঁধের ওপর। শুনতে পেলাম ওর ফিসফিসানি কানে—"যেখানে যাচ্ছ তুমি।"

আবার স্থির হয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। ফক্কড়ের জুড়নো মগজের মধ্যে ঠাণ্ডা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট ফুটে উঠল মগজের মধ্যে এই সাবধানবাণী—"খবরদার, আর একটুও দেরি নয়। ঠিক লগ্নটি সমুপস্থিত হয়েছে। এই লগ্ন পার হয়ে গেলে আর কিছুতেই কিছু জানতে পারবে না। দলজিৎ আর এই মেয়ে, কি সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে, যদি জানতে চাও তবে এই মাহেন্দ্রক্ষণটি কিছুতে পার হতে দিও না।"

তখনও তাকিয়ে আছি ওর অস্বাভাবিক চকচকে চোখের ওপর। গলা একটু চড়িয়ে শক্ত করে উচ্চারণ করলাম—"তার মানে! মাথা খারাপ হল নাকি তোমার ?"

জিতলাম।

কাঁধের ওপর থেকে হাতখানা খসে পড়ল। দু'হাত তুলে নিজের মুখ ঢেকে ফেলে আস্তে আস্তে বসে পড়ল আবার চেয়ারে। চাপা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তখন ওর দেহ। সেই অবস্থায় কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে বলতে লাগল—"না না না, একটুও মাথা খারাপ হয় নি আমার। ওই কথাই ওরা রটাচ্ছে। ওই বলেই বাবা আমাকে এখানে ফেলে রেখে গেল। ওই জন্যেই আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে সমীর। আমার নাকি মাথা খারাপ হয়েছে—উঃ—"

আর বলতে পারলে না। বোধ হয় দম আটকে গেল।

শুনে যতদূর সম্ভব ধাতস্থ হয়ে পড়লাম। ডাক্তারের স্ত্রীকে সাহস দেবার জন্যে বেশ বিচার-বিবেচনা করে ফক্কড়ের শির-বার-করা হাত একখানা তুলে হালকা ভাবে রাখলাম ওর পিঠের ওপর।

তারপর বেশ থিতিয়ে জিরিয়ে বলতে লাগলাম—"পাগল ঠাওরেছে তোমায় সকলে! কি আশ্চর্য কাণ্ড! হঠাৎ পাগল হতে গেলে কেন তুমি ?"

কোনও জবাব নেই, তখনও দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে।

গলায় আর-একটু নিবিড় সুর আমদানি করে বললাম—"আগে আমায় ভাল করে শুনতে দাও সব ব্যাপারটা। সব শুনি আগে, তারপর যাওয়া তো আছেই। আজ গেলেও যাব, কাল গেলেও যাব। সত্যিই তো, খামকা যদি পাগল বলে সাব্যস্ত করে সকলে, তাহলে সেখানে থাকবেই বা কেমন করে। এ ভাবে থাকলে সত্যিকারের পাগল হয়ে যাবে যে।"

মুখ তুলল। শান্তও হল যেন একটু। তখনও কিন্তু কান্নার জের মেটে নি। প্রায় চুপিচুপি বলতে লাগল—"আমাকে বাঁচাও তুমি সাধু, এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আমায় বাঁচাও। কত সব আশ্রম-মঠ আছে, তার একটাতে আমায় ঢুকিয়ে দিও। সেখানে ঝিগিরি করব, রুগীদের সেবা করব। আমায় নিয়ে চল এখান থেকে। তুমি চলে গেলে আমাকে ঘরের ভেতর বন্ধ করে রাখবে। দম বন্ধ হয়ে মারা যাব আমি—উঃ—"

শেষ উঃটি এ ভাবে বেরিয়ে এল ওর বুকের ভেতর থেকে যে সত্যি সত্যিই শিউরে উঠলাম। সত্যিই যদি ছায়াকে ঘরে বন্ধ করে রাখে!

সঙ্গে সঙ্গে ছাতের ওধারে অন্ধকার দালানের মধ্যে নজর চলে গেল আমার। দালানের সামনে পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একখানা ওদের শোবার, আর-একখানার দরজা বন্ধ। দরজায় একটা তালা ঝুলছে। যে ঘরটায় ঝুলছে তালাটা, সেটাই ওদের শোবার ঘর ছিল। দলজিৎ ওই ঘরেই গান শুনতে শুনতে পাড়ি দিয়েছে সুখদুঃখের ওপারে। এ কদিন একটি বারের জন্যেও ওই তালা কেউ ছোঁয় নি। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, এ কদিন একটিবারের জন্যেও আমরা কেউ দলজিতের নাম ঠোঁটে আনি নি। যেন দলজিৎ বলে কাউকে আমরা

কস্মিনকালে চিনতামও না। যেন ওই নামটি চিরকালের জন্যে মুছে গেছে আমাদের মন থেকে। যেন আমাদের মনের দরজাতেও ঠিক ওইরকমের কালো বদখত তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি করে।

ক্ষুব্ধ আক্রোশে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল তালাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। অন্ধকারের মধ্যেও তালার এক চক্ষুটি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সেই এক চক্ষুটিতে যেন বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছে। মৌন ভাষায় সেই হাসি আমায় শোনাতে লাগল—"তুমি দলজিতকে এনেছিলে দিল্লীতে। এনে তাকে এই ঘরে বন্দী করে রেখে পালাচ্ছ। তুমি তাকে মুক্ত আকাশের তলায় বার করে নিয়ে যেতে পারবে না। নিজে পালাচ্ছ, নিজের মুক্তির জন্যে তুমি ব্যাকুল, দলজিৎ বন্দী রইল। দলজিতের ছায়াকেও এইভাবে বন্দী থাকতে হবে।"

সর্বশরীর জ্বলে উঠল। কি সাংঘাতিক কাণ্ড! ডাঃ সমীর সেন আমাকে দিয়ে পাহারা দেওয়াচ্ছেন নিজের স্ত্রীর ওপর। আর এ বেচারা মেয়েটা সদা সর্বক্ষণ আমার কাছ-ছাড়া হয় না, কারণ আমি চলে গেলে ওকে ঘরে পুরে তালা বন্ধ করে রাখা হবে। কি বিশ্রী ষড়যন্ত্র! সোজা মানুষ পেয়ে কি জঘন্য ভাবে ঠকাচ্ছে আমাকে ডাক্তার। প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনে, এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে বেরব। কোনও মতেই একটা অসহায় নারীর ওপর অত্যাচার করতে পারবে না ডাক্তার। হলই বা স্ত্রী, স্ত্রী বলে তাকে পাগল ঠাওরে ঘরে বন্ধ করে রাখবে নাকি! সেই কথাটাই বলে ফেললাম ছায়াকে।

"পারবে না, কিছুতেই পারবে না তোমায় বন্দী করে রাখতে। ভুল করে দলজিতকে এখানে এনেছিলাম আমি। তাই তাকে খোয়ালাম। কিন্তু তোমায় খোয়াব না, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব সঙ্গে করে। নয়ত দলজিৎ আমায় ক্ষমা করবে না। কিন্তু আগে কয়েকটা

কথা আমায় জানতে হবে। যদি বিশ্বাস কর আমায়, কিছু লুকোবার চেষ্টা কোর না। স্পষ্ট জবাব দিও।"

শান্ত কণ্ঠে ছায়া বললে—"বল, যা জানতে চাও তুমি, নিশ্চয়ই জানাব। কিন্তু তার আগে কথা দাও যে উদ্ধার করবে আমায় এদের হাত থেকে।"

কথা দিলাম। হাঁ—নিশ্চয়ই উদ্ধার করব। এমন কি, উদ্ধার করার জন্যে যদি আমাকে সন্ন্যাসীগিরি ছাড়তে হয় তাও ছাড়ব। কিন্তু সর্বাগ্রে আমার জানা চাই, দলজিৎ কে। কোথায় কি ভাবে দলজিতের সঙ্গে পরিচয় হল ছায়ার। কেন তাকে গান শেখাতে গেল ছায়া। আর গান শেখানোর পরে কেন সে দলজিতকে ছেড়ে এল।

ন্যায্য প্রশ্ন কয়েকটি, অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন। ন্যায্য উত্তরই পেয়েছিলাম ছায়ার কাছ থেকে। কিন্তু তারপর আর ডাক্তার সমীর সেনের স্ত্রীকে ডাক্তারের কবল থেকে উদ্ধার করে আনার দরকার করে নি।

হায়, কেন অত পরিষ্কার ভাবে সব জানতে চেয়েছিলাম!

একটুখানি চুপ করে রইল ছায়া, তারপর শোনাতে শুরু করল। প্রথমে একটু ভণিতা করে নিলে। বললে—"কেউ কি আমায় বিশ্বাস করতে পারবে! বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই তো আমায় পাগল মনে করছে এরা। দলজিতের আর আমার বয়েসটাই যে সাক্ষী দিচ্ছে আমাদের বিপক্ষে। তবু তোমায় বলছি সব খুলে, আগাগোড়া সব পরিষ্কার ভাবে বলছি। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করবে, নয়ত করবে না। তোমার তো কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবার ভয় নেই। এখন বিশ্বাস করা না করাটা নির্ভর করছে তোমার বিচার-বিবেচনার ওপর।"

তারপর একটু একটু করে গুছিয়ে শোনালে আমায় কাহিনীটুকু, ছায়ানট এবং ছায়ার কাহিনী। ছায়ানট দলজিৎ কি ভুল করে

ছায়াকে ধরতে গিয়েছিল, তা শুনলাম। সংক্ষিপ্ত ব্যাপার, বেশী ঘোরালো-পেঁচালোও নয়। কাজেই বুঝতে এতটুকু কষ্ট হল না।

গান শিখতে গিয়েছিল ছায়া বাঙলা দেশের নামকরা এক গানের স্কুলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পড়া শেষ করলে ছায়া, সমীরের পড়া তখনও চলছে বিদেশে। তখন সে লিখলে সমীরকে, যতদিন না সমীর ফিরছে ততদিন সে গান শিখবে। গানের ভক্ত সমীর, নিজেও গান-বাজনা জানে। সঙ্গে সঙ্গে সমীরের কাছ থেকে জবাব পাওয়া গেল। সে লিখলে—ওই হল তার স্বপ্ন। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুরের মায়ায় আচ্ছন্ন থাকবে, এই তার জীবনের সব থেকে বড় কামনা। জীবনের মোচড়গুলো, দুঃখ কষ্ট হতাশা, সব তারা অনায়াসে পার হয়ে যাবে সুরের স্রোতে ভাসতে ভাসতে, এই আশাতেই সে দিন গুনছে।

অতঃপর আর কোনও বাধাই রইল না। বাবাকে রাজী করিয়ে ছায়া চলে গেল সেই গান শেখার আশ্রমে। তারপর মনপ্রাণ ঢেলে গান শেখা শুরু করলে।

এমন সময় সেখানে এল দলজিৎ, সে এল ছবি আঁকা শিখতে। নাচ গান ছবি আঁকা লেখাপড়া শেখা, বহু ছেলেমেয়ে সে আশ্রমে বহু রকমের সাধনা করে। দলজিৎ এল সেখানে, শিশুর মত সরল আর বোকা দলজিৎ। এসেই এমন কাণ্ড করে ফেললে যে, তারপর ছায়াকেই ওর ভার নিতে হল।

মস্তবড় আমবাগান। গাছের ছায়ায় জুটেছে সব ছাত্রছাত্রীরা। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাও আছেন। জ্ঞান বিদ্যা কলা কৃষ্টির লেনদেন চলেছে। হঠাৎ দুম করে সকলের সামনে ছায়াকে বলে বসল দলজিৎ—"তোমার একটা ছবি আঁকতে দেবে?"

কথাটাকে যতদূর সম্ভব গায়ে না মেখে ছায়াকে জবাব দিতে হল—"বেশ তো।" খুবই হালকা ভাবে কথাটা বলেছিল ছায়া, না বলেই বা করে কি তখন। অনেক জোড়া চক্ষু কর্ণ তখন সজাগ হয়ে উঠেছে। এ আবার কি ব্যাপার! চেনা নেই জানা নেই,

হঠাৎ ছবি আঁকার প্রস্তাব। বেশ একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল সবাই। আরও একটু বাকী ছিল অবাক হওয়ার। ভাবতেই পারে নি কেউ যে, তৎক্ষণাৎ সেখানেই ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম এনে হাজির করবে দলজিৎ। ফ্যাসাদে পড়ে গেল ছায়া, মুখের কথাকে ফেরায় তখন কেমন করে! ফেরাতে পারলেও না, সঙ্গিনীরা ওকে জোর করে বসিয়ে দিলে একটা আমগাছের গোড়ায়। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দলজিৎ তুলির টান দিতে লাগল ক্যানভাসের ওপর। অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেল। সবিস্ময়ে সকলে দেখলে, হুবহু ছায়ার ছায়া ফুটে উঠেছে ক্যানভাসের গায়ে। শিল্পী তো মহাখুশী। বললে—"আর তোমায় কষ্ট দোব না। কালই দেখতে পাবে তোমার ছবি।"

পরদিন অনেকে গেল দলজিতের হাতের কাজ দেখতে, ছায়াকেও তারা ধরে নিয়ে গেল। ছবি দেখাল দলজিৎ, একখানি নয়—খান দশ-পনেরো ছবি দেখাল। সবই ছায়ার ছবি, বিভিন্ন সাজে নানারকম ভঙ্গিমায় ছায়া বসে দাঁড়িয়ে শুয়ে আছে। দেখে সকলের চক্ষুস্থির, একটা রাতের মধ্যে এতগুলো ছবি কি করে আঁকা সম্ভব! সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, পাঞ্জাবী মেয়ের সাজপোশাক-পরা ছায়াকে ও দেখলেই বা কোথায়!

ধরে বসল সকলে দলজিতকে, বলতেই হবে ব্যাপারটা। দলজিৎ শুধু বোকার মত হাসল, একটি কথাও ওর মুখ থেকে কেউ বার করতে পারল না।

খুন চেপে গেল ছায়ার মাথায়, রহস্যটা তাকে জানতেই হবে। দলজিতকে ও দখল করে ফেললে। দলজিৎ ছায়ার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান শিখতে লাগল।

প্রতি চিঠিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব লিখতে লাগল সমীরকে ছায়া। তারপর যখন জানতে পারল দলজিতের গোমাবতীর কথা, তখন তাও লিখলে সমীরের কাছে। গোমাবতীর কাছে দলজিৎ গান শিখত। গোমাবতীর ছবিই সে দেখিয়েছিল সকলকে। ছবি দেখে ছায়ারই

ভুল হয়েছিল নিজের ছবি বলে, এতখানি মিল ছিল সেই ছবির মুখের সঙ্গে ওর মুখের। যখন দলজিৎ ছায়াকে গোমা বলে ডাকতে শুরু করে তখন তাও সে লিখেছিল সমীরকে। কিছুই সে লুকোয় নি। দলজিতকে তার বাবার কাছেও নিয়ে গেছে। তিনি তাকে ছেলের মত ভালবেসেছেন।

তারপর সমীর ফিরে এল আর দলজিতের মাথার গোলমাল আরম্ভ হল। ব্যাপার দেখে তার বাবা দিল্লী চলে এলেন মেয়ের বিয়ে দিতে। দলজিৎ যে কবে দিল্লী এসেছে তার কিছুই জানে না ছায়া। সেদিন স্টেশনে ওকে দেখে সে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওভাবে তো আর মানুষটাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তারপর যা হল তা তো আমার সামনেই ঘটেছে।

সমস্ত শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। শেষে বললাম—"আর একটি মাত্র কথা আমার জানবার আছে ছায়া তোমার কাছে, কিন্তু—"

খুব সাদা গলায় ছায়া বললে—"সে কথাটি কি তা আমি জানি। কিন্তু তুমিই বল সাধু, তা কি করে সম্ভব। দলজিৎ তো আমায় ভালবাসত না। সে ভালবাসত তার গোমাকে। এমন কি গোমা বলে সে ডাকতেও আরম্ভ করে আমায়। আমার কি এটুকু মনুষ্যত্বও নেই যে সেই ভালবাসাকে আমি ভুল বুঝব। আর সেসব কথা উঠছেই বা কেন? কোথায় সমীর কোথায় দলজিৎ। ছিঃ। বলতে পার সাধু, একটা নারী আর একটা পুরুষের মধ্যে একমাত্র ওই সম্বন্ধ ছাড়া কি আর অন্য কোনও সম্বন্ধ লোকে ভাবতেই পারে না?"

ক্ষোভে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। বাক্যহারা হয়ে আমি চেয়ে রইলাম শুকতারাটার দিকে।

যাওয়া হল না আমার। বাধা দিল না বলেই হল না যাওয়া। চলে যাবার কথাটা আর উঠলই না মনে। তার বদলে মনটা এমন

ভারী হয়ে উঠল যে অত ভারী জিনিস কাঁধে করে উঠতেই পারলাম না। খানিকক্ষণ পরে দেখি ছায়া কখন নিঃশব্দে উঠে গেছে। ওধারে নজর করে দেখলাম সমীরের ঘরের দরজা বন্ধ। দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। মনে মনে কামনা করলাম, দু'জনের প্রাণের অমৃতধারায় ভুল বোঝাবুঝির পাঁক-কাদা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাক্। দিবারাত্রির এই মহা সন্ধিক্ষণে সন্ধির দেবতা দুটি প্রাণ এক করে দিন।

নিচে নেমে গেলাম। কলঘর থেকে স্নান করে যখন বেরোলাম তখনও ওরা কেউ নামে নি। অন্য দিন এমন সময় ছায়া চা করে ফেলে। চাকরটা আসে একটু পরে। তারও অনেক পরে সমীর উঠে আসে। ততক্ষণে আমার আর ছায়ার একবার চা খাওয়া হয়ে যায়।

ভাবলাম, চাকরটা এলে তাকে দিয়েই চা করিয়ে নোব। থাকুক ওরা শান্তিতে যতক্ষণ পারে। ওদের মধ্যে গণ্ডগোলটা মিটে গেল— যাবার আগে এটুকু যে দেখে যেতে পারব এই চিন্তাতেই যথেষ্ট উল্লসিত হয়ে উঠলাম। সদর দরজাটা খুলেই রাখি, চাকরটা এসে দরজা ঠেললে সেই আওয়াজে ওরা উঠে আসতে পারে।

দরজা খুলতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ কি! সারা রাত দরজাটা খোলা আছে নাকি! এ রকম তো থাকবার কথা নয়! চাকর এসে দুম-দাম করে দরজায় কিল মারে রোজ, তখন ছায়া নেমে এসে দরজা খুলে দেয়। পরশুও সমীর চাকরটাকে ধমকেছে অত জোরে দরজা ধাক্কাবার জন্যে। আজ দরজাটা খোলা রয়েছে যে! এক ফাঁকে নিচে নেমে এসে দরজা খুলে রেখে তবে ছায়া ঢুকল নাকি গিয়ে সমীরের ঘরে। তাও তো সম্ভব নয়। ওর কথা শুনতে শুনতে সামান্য কিছুক্ষণ আমি অন্যমনস্ক হয়ে চেয়েছিলাম আকাশের দিকে। তারপরই দেখি ও উঠে গেছে। অতটুকু সময়ের মধ্যে কখনই বা নিচে নামল, কখনই বা আবার ওপরে উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকল! না চোর ঢুকেছিল রাত্রে বাড়িতে!

নিচের তিনখানা ঘরে তালা ঝুলছে। তবে!

তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম ওপরে। তখনও ওদের ঘরের দরজা বন্ধ। ডাকব কিনা ঠিক করতে পারলাম না। ছাতে গিয়ে চেয়ারের ওপর বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পরে আওয়াজ পেলাম নিচে। চাকরটা এল। ঝাড়ু দেবার শব্দও পেলাম। তারপর চাকরটা উঠে এল ওপরে। আমার সামনে এসে বললে—"বিবিজী?" অর্থাৎ বিবিজী কোথায়? নিচের ঘরের চাবি খুলে দেবে কে?

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। কি যে জবাব দোব ভেবে পেলাম না। শুধু আঙুল তুলে ওদের ঘরের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে দিলাম।

ঠিক সেই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল সমীর। চোখে মুখে সন্থ ঘুম ভাঙার ছাপ। বেরিয়ে এসে বললে—"কি, ও ভূতটা দাঁড়িয়ে কেন আপনার সামনে? কি চায় ও?"

বললাম—"নিচের সব দরজায় তালা, করবে কি ও। তাই এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে তালা খুলে দিলে তো কাজ করবে।"

ব্যস্ত হয়ে উঠল সমীর—"কেন? তালা খুলে দেয় নি কেন ছায়া? চাবি তো তারই কাছে।"

বললাম—"ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়।"

"ঘুমিয়ে পড়েছে! কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে? এসময় ঘুমোয় না তো কোনও দিন!"

বললাম—"ভোরবেলা উঠে গেল তো ওই ঘরে।"

আরও আশ্চর্য হয়ে গেল সমীর—"ওই ঘরে গেছে! কই দেখি—" বলতে বলতে ফিরে গিয়ে আবার ঘরে ঢুকল। সব কটা জানলার পরদা টেনে টেনে সরিয়ে ফেললে। দিনের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ঘরের ভেতরটা। আমিও উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার সামনে।

ঘরে ছায়ার নামগন্ধ নেই। খাট আলমারি টেবিল চেয়ার ছাড়া জ্যান্ত প্রাণী শুধু সমীর, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চাইছে চারিদিকে।

মিনিট পনেরো কাটল ছুটোছুটি করে। তেতলার ছাত থেকে শুরু করে সারা বাড়িটা ছুটে বেড়ালাম আমরা। চাকরটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। হয়রান হয়ে শেষে মুখোমুখি বসলাম নিচের ড্রইংরুমে।

সমীরের মুখেই প্রথম কথা ফুটল। ভয়ে উৎকণ্ঠায় হতাশায় কেঁপে উঠল তার গলা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও রকমে উচ্চারণ করলে—"তাহলে গেল কোথায় ছায়া ?"

খুব কঠিন সুরে বললাম—"কোথায় গেল বলব কেমন করে? না লুকিয়ে আমাকে আগেই জানানো উচিত ছিল যে একটা পাগলের ওপর পাহারা দিতে হবে আমায়।"

আঁতকে উঠল সমীর—"পাগল! কে পাগল ?"

আরও চড়া গলায় বললাম—"দেখুন, আপনারা শিক্ষিত ভদ্র-লোকেরা নিজেদের ভয়ানক চালাক ভাবেন। এইজন্যেই ঠকেন এত বেশী। আপনি, ছায়ার বাবা—আপনারা সবাই জানতেন যে মেয়েটার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। সেইজন্যেই মেয়েকে এখানে রেখে তিনি চলে গেছেন। আর সেইজন্যেই আপনি আমাকে নানা ছুতোয় আটকে রেখেছেন যাতে আমিও তার ওপর নজর রাখি। অর্ধেক রাত্রে সে এসে বসে আর আপনি উঠে যান ঘুমোতে। তার মাথায় ঢুকিয়েছিলেন যে আমাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। আসল উদ্দেশ্য ওই সময়টুকু আমি রাখব তাকে আগলে। সেও আমাকে একলা ফেলে রেখে কোথাও যাবে না এই ছিল আপনার বিশ্বাস। এত কাণ্ড না করে সোজা আমায় বললেই হত—"

চিৎকার করে উঠল সমীর—"এসব কি বলছেন আপনি!

কে আপনাকে বলেছে যে আমরা ছায়াকে পাগল মনে করেছি। কে বলেছে যে তাকে পাহারা দেবার জন্যে—"

বাগ-বিতণ্ডা হল খানিকক্ষণ। তারপর আমি বললাম সব কথা, ভোরবেলা যা বলে গেছে আমাকে ছায়া। শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সমীর। দিল্লী নগরীর রাজপথে ফেরিওয়ালা-বাহিনীর প্রথম দল হাঁক দিতে আরম্ভ করলে। দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগল মাছওয়ালে সবজিওয়ালে গোস্ত্‌ওয়ালের দল।

প্রথমে আমার মাথাতেই উদয় হল মতলবটা। লাফিয়ে উঠে বললাম—"চলুন আগে থানায়। ছায়ার ফোটো যদি একখানা থাকে তো নিয়ে চলুন।"

সমীর বললে—"এখানে আমার এক মামা আছেন, তিনি কোন্ এক মন্ত্রীর সেক্রেটারী। তাঁকে একটা ফোন করলে হয় না? পুলিসের কর্তাদের সব জানিয়ে তিনি হয়ত একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।"

টেলিফোন সেই ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে। সুতরাং আমরাও রাস্তায় নামলাম।

সারাটা দিন কাটল ছুটোছুটি করে। টেলিগ্রাম করা হল ছায়ার বাবার কাছে। সমীরের সেই আত্মীয় ভদ্রলোক সপরিবারে ছুটে এলেন। পুলিসের সবচেয়ে উপরওয়ালারাও রাস্তায় নামলেন। দিল্লী থেকে যতগুলো পথ যতদিকে গেছে, সব পথে কড়া পাহারা বসে গেল। ছায়ার ফোটোর অনেকগুলো কপি তৈরী হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যে। সেগুলো পুলিসে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলে সব থানায়। অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হল না। আমি আর সমীর ট্যাক্সি নিয়ে দিল্লীর সব কটা উল্লেখযোগ্য স্থান বার বার ঘুরে এলাম। বাইরে গিয়েও বেশীক্ষণ থাকতে পারি না আমরা। হয়ত ছায়া ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরেছে এই আশায় আবার ছুটে আসি বাড়িতে। এই করতে করতে আবার রাত্রি এল। তখন আমরা আবার মুখোমুখি বসলাম।

সারাটা দিন ছায়া সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনও কথা হয় নি। মাঝে মাঝে সমীর নিজেকে নিজে শুনিয়েছে মাত্র এই কয়টি কথা—"ছায়া আমায় ভুল বুঝলে! এরকম ভাবে আমায় ভুল বুঝলে ছায়া!" প্রতিবারই তার হৃৎপিণ্ডটা নিঙড়ে বেরিয়ে এসেছে কথাগুলো। নির্বাক হয়ে শুনেছি আমি, ও-কথার ওপর কি বলা যায় তা আমার মাথায় আসে নি।

সারাটা রাত দু'জনে বসে রইলাম দু'খানা চেয়ারে। চাকরটা সে রাত্রে গেল না তার বাসায়। বার তিন-চার আমাদের চা দিলে। কয়েকবার সমীর উঠে গেল, দরজা খুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। তারপর ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। বহুবার নিজের হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চাইলে। সত্যিই রাতটা আর কাটতে চাইছিল না। চট্ করে রাতটা কেটে গেলেই বা কি ফল পাব আমরা, তা ভেবে পেলাম না। এইটুকুই হবে যে ছায়ার বাবা যে প্লেনে আসছেন সে প্লেনখানা দিল্লীর মাটি স্পর্শ করবে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে। এবং তারপর সে ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হবেন জামাইয়ের কাছে।

কিন্তু তার আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত এখান থেকে। থেকেই বা আমি করব কি এখানে। প্রথম থেকেই সে ভদ্রলোক আমায় সুনজরে দেখেন নি। এবার এসে হয়ত আমাকে নিয়েই পড়বেন। আমার সামনে থেকে যখন তাঁর মেয়ে উধাও হয়েছে তখন আমাকেই হয়ত দিতে হবে তার সদুত্তর। অনর্থক কতকগুলো অপ্রিয় কথা শুনতে হবে, শোনাতে হবে। তার চেয়ে এখন মানে মানে চলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু কি করে যাওয়া যায় এ বেচারাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে রেখে! মুখ তুলে তাকালাম ওর মুখের দিকে। চেয়ে রয়েছে জানলার বাইরে আধো-অন্ধকার পুব আকাশের শেষ সীমায়।

মনে পড়ে গেল, কাল এই সময় ছায়ার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম আমি। আজ নিতে হবে সমীরের কাছ থেকে। উঠে দাঁড়ালাম। যা হোক একটা কিছু বলে চলে যাব—হাঁ করলাম।

সেই মুহূর্তে সমীর মুখ ঘুরিয়ে ছুম করে বলে বসল—"আমায় নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে ?"

আচমকা এই প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলাম।

উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। অসীম আগ্রহ আর মিনতি ফুটে উঠল দুই চোখে। সামনে একটু ঝুঁকে যেন ভিক্ষা চাইছে এই সুরে বললে—"আমায় আপনি নিয়ে চলুন—যেখানে আপনি যাবেন, যাব আমি। চিরকাল আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব। আমায় ফেলে যাবেন না দয়া করে।"

আবার বসে পড়লাম চেয়ারে। কোনও রকমে বলতে পারলাম—"এসব কি বলছেন আপনি! এত লেখাপড়া শিখে, এত বড় ডাক্তার হয়ে—"

অস্থির হয়ে উঠল সমীর। দু'হাত নাড়তে নাড়তে বললে—"না না না, ওসব কিচ্ছু শুনতে চাই না। কিছুই শিখি নি আমি, কিচ্ছু জানি না। মুখ দেখাতে পারব না আমি। ওই আবার সকাল হয়ে আসছে। এখনই আসবে তার বাবা, আসবে অনেক লোক। সবাই চেয়ে থাকবে আমার মুখের দিকে। সবাই ভাববে যে আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে ছায়া আজ এভাবে মিলিয়ে যেত না। ছায়াও ভুল বুঝলে আমায়, মিথ্যে সন্দেহ করে চলে গেল—"

কে যেন গলা চেপে ধরল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। চেয়ারে বসে পড়ে টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে তাতে মুখ গুঁজল।

অস্থির হয়ে উঠলাম, কি বলা যায়, কি করা যায়, ভেবে কূল-কিনারা করতে পারলাম না। পাথরের মত বসে রইলাম ওর দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল সাইকেলের ঘণ্টা। পরমুহূর্তেই কে যেন এসে উঠল বাইরের বারান্দায়। দরজায় ধাক্কা পড়ল।

দু'জনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। দু'জনেই চাইলাম দু'জনের চোখের পানে। দু'জনেই একসঙ্গে ছুটলাম দরজা খুলতে।

থানা থেকে লোক এসেছে। এখনই আমাদের যেতে হবে। ত্রিশ মাইল দূরে এক গ্রামে একটি মেয়েকে পাঞ্জাবীরা ধরে রেখেছে। তারা দাবি করে যে মেয়েটি তাদের আত্মীয়া।

নিঃশব্দে বোঝাই হল দু'খানা গাড়ি। মানুষ-মারা অস্ত্র কোমরে বেঁধে জনা বিশেক মানুষ মুখ বুজে চড়ল সেই গাড়ি দু'খানায়। সমীরের সেই আত্মীয় ভদ্রলোক, সমীর আর আমি—আমরা তিনজন শুধু নিরস্ত্র বসে রইলাম আর একখানা গাড়িতে। উঁচুদরের একজন শিখ অফিসার সব শেষে উঠে এলেন আমাদের গাড়িতে। তারপর যাত্রা শুরু হল।

দিল্লীর নির্জন রাস্তার আলোগুলো চেয়ে রইল আমাদের দিকে সভয়ে। দুর্দান্ত বেগে আমরা শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠে গিয়ে পড়লাম। দূরে দেখা গেল কাল্‌কাজীর মন্দির টিলার মাথায়। ভোরের ফিকে আলোয় চেনা গেল মন্দিরটি। মনে মনে দেবীকে প্রণাম জানালাম। বললাম—"জননী, আজকের এই বিজয়-অভিযান যেন সার্থক হয়। যার জন্যে আমরা যাচ্ছি, তাকেই যেন খুঁজে পাই সেখানে। বিনা রক্তপাতে যেন ফিরিয়ে আনতে পারি তাকে। অনর্থক আর যেন হাঙ্গামা-হুজ্জত না বাধে।"

আমার কানের ওপর মুখ রেখে সমীর বললে—"সে যদি না হয়, তাহলে?" সংশয় আর হতাশা যেন সাকার মূর্তি ধরে দাঁড়াল আমার চোখের সামনে। বুকটা কেঁপে উঠল। চোখ বুজে রইলাম, জবাব দিলাম না।

আরও মিনিট পনেরো ছোটবার পর গাড়ি থামল।

নিঃশব্দে আমরা নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। তখন বেশ পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে। রাস্তা থেকে কিছু দূরে ডান দিকে মাঠের মধ্যে কতকগুলি বাড়ি। নতুন বসতি গড়ে উঠছে শহর থেকে দূরে। আমরা দল বেঁধে সেদিকে রওয়ানা হলুম।

কাছাকাছি পৌঁছতে দেখা গেল, এখানে ওখানে রাইফেল হাতে খাকি-পোশাক-পরা আরও বহু লোক মুখ বুজে খাড়া রয়েছে। অর্থাৎ সারা রাত সব কখানা বাড়ি ঘিরে রাখা হয়েছে। তোড়-জোড় দেখে আবার একবার বুকটা কেঁপে উঠল। ভয়ে না উত্তেজনায় তা ঠিক বলতে পারব না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কি একটা হুকুম দিলে কে। খট্ খট্ খটাস্ খট্—নানারকম আওয়াজ করে দাঁড়াল সব দলটা। সব কটা রাইফেলের মুখ বাগিয়ে ধরা হল। আবার একটা হুকুম শোনা গেল। তখন অতি সন্তর্পণে একপাল শিকারী কুকুরের মত এগিয়ে চলল সকলে। তাদের পেছনে আমরা তিনজন নিরস্ত্র মানুষও চললাম। ভয়ংকর একটা-কিছু ঘটবার প্রত্যাশায় ঢিপঢিপ করতে লাগল বুকের ভেতর।

আরও কাছে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে ঢুকলাম দু'সার বাড়ির মাঝের রাস্তায়। তখন ঘটল সেই অঘটন।

হঠাৎ আমার পাশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সমীর। রাইফেলধারী মানুষগুলোর মাঝখান দিয়ে তীরের মত ছুটে চলে গেল সামনে। একটু এগিয়ে ডান দিকে ঘুরে একটা বাড়ির পাশে অদৃশ্য হল।

আবার একটা হুকুম শোনা গেল। ঝপ্ করে থামল সকলে। তখন স্পষ্ট শুনতে পেলাম—

"আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই, জীবন বিফল হয় গো;
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়, 'এ নহে এ নহে, নয় গো।
কোন্ স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে, কোন ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন উপবনে, বিরহ বেদনে, আমারি কারণে কেঁদে যায়।"

দূরে শোনা গেল সমীরের আকুল আহ্বান—"ছায়া, ছায়া, ছায়া !"

আর হুকুমের দরকার হল না। দৌড়ল সকলে আদবকায়দা ভুলে। একটা বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। দরজা খোলা, ভেতরে গোলমাল শোনা গেল। এক বৃদ্ধা পাঞ্জাবী মহিলা আর সমীর দু'জনে একটি মেয়ের দু'হাত ধরে বেরিয়ে এল। সালোয়ার-পাঞ্জাবি-পরা, বুকের ওপর পাতলা এক টুকরো কাপড়, পিঠে লম্বা বেণী ঝুলছে, যে মেয়েটিকে ধরে আনা হল তার দিকে চেয়ে হাঁ করে রইলাম।

তুমুল হট্টগোল শুরু হল। ভুঁড়ি দাড়ি আর কোমরে লম্বা ছুরি-বাঁধা বহু মানুষ মহা উত্তেজিত হয়ে ছুটে এলেন। গিন্নিরা এলেন, ছেলে মেয়ে বৌ ঝি যে যেখানে ছিল ছুটে এল। সবাই একসঙ্গে জুড়ে দিলেন চিৎকার ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। শিখ অফিসারটি সকলকে থামাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। হাতিয়ার হাতে নিয়ে যারা গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, তারা হাতিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে থ হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আর এ হেন ভয়ংকর অবস্থার মাঝখানে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি, অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। তার ডান হাতখানা দু'হাতে টিপে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগল সমীর। তার মুখেও একটি কথা নেই। সেই বিরাট হৈচৈ চিৎকারের মধ্যে মাত্র একটি কথা বোঝা গেল—গোমা গোমা গোমা। সকলের মুখেই ওই এক কথা।

হঠাৎ মেয়েটি চোখ নামাল। চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। নজর পড়ল আমার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল আমার সামনে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে আমার দু'পা। মুখখানি চেপে ধ'রে রইল আমার হাঁটুর ওপর।

মুহূর্ত মধ্যে সব নিস্তব্ধ। এতটুকু শব্দ নেই কারও মুখে। আমি তার মাথার ওপর ডান হাতখানা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরে সেই অবস্থায় খুব চাপা গলায় বলতে লাগল—“আমায় নিয়ে চল তুমি সাধু, নিয়ে চল আমাকে এখান থেকে। কাল আমি একলাই পালিয়েছিলাম। এদের হাতে ধরা পড়লাম। এখন সমীর আমায় ধরে নিয়ে যাবে। আমায় বাঁচাও তুমি সাধু, তুমি যে কথা দিয়েছিলে—”

চিৎকার করে উঠলাম—“সমীরবাবু, আসুন এধারে।”

এগিয়ে এল সমীর।

সেই একই স্বরে বললাম—“ধরুন ছায়ার হাত।”

একটুও ইতস্তত না করে ধরল। হতভম্ব ছায়া মুখ তুলে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

সকলে শুনতে পাবে না, এমন ভাবে গলার স্বর খাটো করে বললাম—“ছায়া, আগাগোড়া তোমার ভুল হয়েছে। এরা কেউ তোমায় পাগল ঠাওরায় নি। এতটুকু সন্দেহ পর্যন্ত করে নি তোমায়। দলজিৎ মারা যাওয়ায় তোমার যে মনের অবস্থা হয়েছে সেই অবস্থায় তোমাকে একটু শান্তি দেবার জন্যে সমীর তোমার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করছিল। আর তুমি উল্‌টো বুঝছিলে—”

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সমীর ছায়ার পাশে। দু'হাতে ছায়াকে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল—“তুমি আমায় ভুল বুঝলে ছায়া? তুমিও ভুল বুঝলে আমায়?”

কয়েক মুহূর্ত ছায়া চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর ওর কাঁধে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

শিখ অফিসারটি ওদের বোঝালেন, মেয়েটি গোমা নয়। সমীরের সেই আত্মীয় ভদ্রলোক আর একটুও দেরি না করে ওদের দু'জনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন। তাড়াহুড়োতে ওরা আমার কথা খেয়াল করতে পারল না।

ঘণ্টাখানেক পরে সকলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে অফিসারটি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি যাবেন না ?"

বললাম—"আমি যাব কোথায় ? দেখছেন তো এরা কি রকম মনমরা হয়ে আছে। এদের কাছেই থাকি কিছুক্ষণ।"

পুলিসের গাড়ি হু'খানা বেরিয়ে গেল।

ভ্যানিশিং ক্রীম

অনমনীয় মনোভাব কথাটি হল খবরের কাগজের কথা। ওই কথারই ঘরোয়া-সংস্করণ হচ্ছে—একগুঁয়েপনা। একগুঁয়েপনা কথাটিকে আর একটু সহজ করে বলতে হলে উচ্চারণ করতে হবে—ব্যাদড়ামি। এই ব্যাদড়ামি বস্তুটিকে অনুশীলন করে যিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তাঁর নাম শ্রীপুনর্বসু পালিত। সংক্ষেপে পিপি। আদালতে পিপি বললে বোঝায় পাবলিক প্রসিকিউটারকে, আদালতের ভাষায় জাঁদরেল সরকারী উকিলের ছোট্ট নাম পিপি। পুনর্বসু পালিত কিন্তু সরকারী-বেসরকারী কোনও পক্ষেরই উকিল নয়। নির্ভেজাল নিরহংকার আসল একটি ভদ্রলোক। প্যান্ট আর হাওয়াই জামা-পরা হালফ্যাশনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভদ্রলোক নয়, ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর-জড়ানো ঐতিহ্যগত ভদ্রলোক। অসামান্য আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় দুনিয়াখানাকে তোলপাড় করে তুলতে ওর রুচিতে বাধে, সর্বজাতের সমস্যার সমাধান ও খুঁজে পায় নিজের মধ্যে। সমাধান খুঁজে পাওয়াটাই হল ওর মৌলিকতা। একটিবার যদি ও ওর মৌলিক মতবাদটিকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তখন কার সাধ্য ওকে একতিল টলাবে ওর একগুঁয়েমি থেকে। তর্ক করতে গেলে তর্ক করবে না, গালমন্দ শুরু করলে মুখ মুচকে হাসবে শুধু। হাসবে আর একান্ত মনোযোগ দিয়ে তর্ক গালাগালি সব শুনবে। শুনতে শুনতে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করবে একটি অতি সুদৃশ্য পানের ডিবে। ডিবেটি খুলে সামনে বাড়িয়ে ধরে সামান্য একটু অনুরোধ করবে—"নাও", অর্থাৎ কিনা—বাজে তর্কে খামকা মাথা গরম না করে উচ্চশ্রেণীর মশলা-দেওয়া দু'খিলি ছাঁচি পান মুখে দাও, মুখটা অন্তত জুড়োবে।

ওর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বা ওকে গালাগালি করার ফল দু'খিলি ছাঁচি পান চিবোনো। অত্যন্ত যত্নে সাজা পান অত্যন্ত সুশ্রীভাবে সাজানো থাকে ওর রুপোর ডিবেতে। পানগুলো যাতে শীতল থাকে, তার জন্যে আবার ভিজে পাতলা কাপড় একখণ্ড চাপা দেওয়া থাকে পানের ওপর। সে পান মুখে পুরলে মুখ হয়ত জুড়োয়, পিত্তি কিন্তু জ্বলতেই থাকে। জ্বললেও কিছু করার উপায় নেই। যে মানুষ রাগতে জানে না, তাকে কোন অস্ত্রে ঘায়েল করা সম্ভব! ভালোমানুষি আর ভদ্রতা দিয়ে তৈরী নিরেট নিশ্ছিদ্র বর্ম ধারণ করে আছে পিপি। সেই দুর্ভেদ্য বর্মের গায়ে ঠেকে সর্বরকমের অস্ত্র ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় বলেই ওর ওপর চটে যায় সকলে। বলে—"স্নব, আস্ত একটি স্নব। চালবাজ ঘুঘু একটি, ঘুঘুর মত পিপি করছে।" ঘুঘুর ডাকের নকল পিপি কি না, ঠিক বলা শক্ত। কিন্তু ঘুঘু থেকেই পিপির উৎপত্তি এবং শেষ ফল, পুনর্বসু পালিত নামটা ভুলেই গেল লোকে। বিনা ওজর-আপত্তিতে ও নিজেও মেনে নিলে নতুন নামটিকে। প্রতিবাদ তো আর করতে পারে না পিপি, প্রতিবাদ করাটা যে ওর ভালোমানুষি আর ভদ্রতায় বাধে। ওইটুকুই যে ওর মৌলিকতা।

শ্রীপুনর্বসু পালিত বা পিপি নিজস্ব মৌলিক মতবাদ সম্বল করে শান্তিতেই কাটিয়ে দিচ্ছিল দিন। শুধু দিন নয়, দিন এবং রাত দুইই বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে খাপ খেয়ে গিয়েছিল ওর জীবনে। অথবা এ-কথাও বলা যায়, পিপি এক অত্যাশ্চর্য কায়দায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল ওর জীবনের দিন-রাতগুলোর সঙ্গে। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী চেনা-জানা যে যেখানে আছে ওর, সবাই ওর নামটি হিসেবের খাতা থেকে কেটে দিয়েছিল। দিতেই হবে যে, প্রতিবাদ করবে না, প্রতিরোধ করবে না, অনায়াস অবহেলায় শুধু এড়িয়ে যাবে। কিন্তু মরে গেলেও নিজের একগুঁয়েপনা বা ব্যাদড়ামি ছাড়বে না। এমন মানুষকে নিয়ে কিভাবে চলা যায়! অতএব কেউ

কোনও বিষয়ে না চাইত ওর মতামত, না যেত ওকে জড়াতে। আছে একজন তৃতীয় ব্যক্তি, থাকুক। কি দরকার ওকে কোনও বিষয়ে ঘাঁটিয়ে! ওর সম্বন্ধে এই জাতেরই একটা মতামত গড়ে উঠেছিল ওর আপন-জনেদের মধ্যে। পিপি বেঁচে গিয়েছিল। শান্তিতে বেঁচে ছিল বলাও চলে। সপ্তাহে সাড়ে-চার দিন—একুনে সপ্তাহে পনেরো থেকে ষোল ঘণ্টা ছেলে পড়ানো এই হল ওর পেশা। ছেলে অর্থে ছেলে-মেয়ে দুইই বোঝায়। যাদের ও পড়াত, তারা মনে করত পিপি হল একটি ছেলে-পড়াবার যন্ত্র। নিখুঁত যন্ত্র যাকে বলে তাই। কস্মিনকালে একটিবারও ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত কি না, তাও বলা সম্ভব নয়। অন্তত একটি কথা ঠিকই যে, এক-নাগাড়ে দু'বছর পড়াবার পর সেই ছাত্র বা ছাত্রীকে দেখলেও ও চিনতে পারত না। লোকে মনে করত ওটাও ওর এক জাতের স্নবারি।...আসলে চিনতে ঠিকই পারে, কিন্তু ধরা দিতে চায় না। হয়ত হবেও বা ওটাও ওর চালবাজি, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে যে ও স্নবারি করে নি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এবং সেই একটি মাত্র ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল, পিপির মৌলিক মতবাদ বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ কিনা হঠাৎ এমন পরিস্থিতির মধ্যে ও গিয়ে পড়েছিল যে, নিজের এক-গুঁয়েপনার কথাটা ভুলে দস্তুরমত ভেসে গিয়েছিল। সেই ভাসার ইতিহাসটুকুই এখানে বক্তব্য।

১

হঠাৎ একটা লড়াই লেগে গেল শহরে। রাজনীতি যাঁদের পেশা, তাঁরা জনতা ক্ষেপিয়ে জড়ো করলেন সরকারের সশস্ত্র সান্ত্রীদের সামনে। ব্যবস্থাটুকু পাকা ব্যবস্থা ছিল, প্রথমেই সরকার সসম্মানে তাঁদের জ্ঞাতি-ভাইদের গাড়িতে তুলে সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর জনতার ওপর লেলিয়ে দিলেন তাঁদের পোষা হায়নাদের। ব্যাস্—আনন্দের হিল্লোল উঠে গেল। বহুকাল যারা হাতের সুখ করতে পারে নি, তাদের নাগালের মধ্যে নিরস্ত্র জনতা ; স্ত্রী পুরুষ ছেলে

মেয়ে, তাজা টাটকা রক্তমাংস। ঝাঁপিয়ে পড়ল হায়নারা—হাতের কাছে যাকে পেলে, তাকে ধরে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর সকলের চোখের সামনে কামড়াকামড়ি করতে লেগে গেল।

ব্যাপারটা এতখানি গড়াতে পারে—পর্তুগীজ নয়, চীনে নয়, এই দেশেরই মানুষ সুযোগ পেলে এতখানি পশু হয়ে উঠতে পারে, এতটা জানা ছিল না কারও। নিমেষের মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান হারাল সাধারণ মানুষে। আগুনটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। শহর অন্ধ হয়ে অন্ধকারে ডুবে গেল।

তারপর শুরু হল প্রলয় কাণ্ড! অন্ধকারের মধ্যে দু'দলই ক্ষেপে উঠল প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে। পিস্তল বেয়নেট লাঠি ছোরা নিয়ে সরকারের নিমকের দাম দিতে এল যারা, তারা বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে মহ উল্লাসে বাঙালী ছেলেমেয়েদের দেহ নিয়ে পৈশাচিক নৃত্য জুড়ে দিলে। হতভাগ্য নিরস্ত্র জনতা শুধুহাতে বাধা দেবার চেষ্টা করলে যতটা সম্ভব। চেষ্টা করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে অনেকে। শেষ কর্মটি করার সময় জন-নেতাদের জয়গান করে গেল কি না, ঠিক বোঝা গেল না।

সেই ভয়ংকর রাত্রে পিপি বাড়ি ফিরছিল ছেলে পড়িয়ে। দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম যাই হোক না কেন, পিপির হিমশীতল ভদ্রতার গায়ে কখনও আঁচড় কাটতে পারে না। ওর মৌলিকতা হচ্ছে, ওই সমস্ত রাজনৈতিক আঁস্তাকুড়ের ছায়া না মাড়ানো। এই মৌলিকতার দৌলতে ও বিশ্বাস করত, ও যখন কোনও ব্যাপারের মধ্যে কস্মিনকালে নাক গলায় না, তখন ওর গায়ে আঁচ লাগবে কেন। এই বিশ্বাসের জোরে সেই ভয়ংকর সন্ধ্যাতেও ও ছাত্র পড়াতে গিয়েছিল। ট্রামবাস বন্ধ, কাজেই ফিরতে হচ্ছিল ওকে দু'পায়ের ওপর নির্ভর করে। পাছে উভয়পক্ষের কারও নজরে পড়ে যায়, এজন্যে অলিগলি দিয়ে ফিরছিল। খোলা রাস্তায় একটিও বাতি ছিল না, গলি-ঘুঁজিতে তবু দু'একটা বাতি জ্বলছিল।

জনপ্রাণী নেই কোনও গলিতে, দু'পাশের সব কটা বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ। যেন মরে-হেজে সাফ হয়ে গেছে সব বাসিন্দারা। সেই যমপুরী-সদৃশ ইট-কাঠের তৈরী খাঁচাগুলোর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওর কানে গেল একটা করুণ চিৎকার। পরমুহূর্তে ওর মনে হল, দুপদাপ্ শব্দে কারা যেন ছুটে আসছে। নিমেষের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল পিপির পা দু'খানা, তারপর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল। ষোলআনা সজাগ হয়ে উঠল পিপি। ওর ডান দিকে গলা পর্যন্ত উঁচু এক ভাঙা পাঁচিল। পাঁচিলটার দিকে নজর পড়তেই দু'হাত উঁচু করে আঁকড়ে ধরলে পাঁচিলের মাথা। ডন-বৈঠক-করা শরীর, আর রিং প্যারালাল-বারে পাকান হাত দু'খানা ওর চরম উপকারে লেগে গেল। আর-একবার সেই আর্তনাদ শোনার আগেই ও পৌঁছে গেল পাঁচিলের মাথায়। নামল কতকগুলো পুরনো লোহা-লক্কড়ের স্তূপের ওপর। টাল সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ঠিক পাঁচিলের পাশে শুনতে পেলে চাপা আর্তনাদ আর ধস্তাধস্তির শব্দ। লোহা-লক্কড়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে যা দেখতে পেলে, তাতে আর নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারলে না। নিচু হয়ে হাতড়ে দেখতে গেল, উপযুক্ত কিছু মেলে কি না। মিলল যথার্থ রকমের উপযুক্ত জিনিস। জিনিসটা বোধ হয় রেলগাড়ির অঙ্গ থেকে খসিয়ে এনেছিল লোহার কারবারীরা। ইঞ্চি দু'আড়াই চওড়া হাত-দুয়েক লম্বা চেপ্টা একখানি খাঁটি ইস্পাত। সেখানি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে বসল আবার পাঁচিলের মাথায় পিপি।

ঠিক নিচেই দুই বীরপুরুষ একটা শিকার ধরেছে। শাড়িখানা কোথায় গেছে তার ঠিক নেই, শুধু ব্লাউজ আর সায়া তখনও আছে শিকারের অঙ্গে। এক বীরপুরুষ এক টানে সায়ার খানিকটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। আর-একজন তখন প্রাণপণে খামচে ধরেছে শিকারের বুকের কাছের ব্লাউজটা। এত ব্যস্ত তারা শিকার নিয়ে যে, অন্যদিকে

নজর দেবারও অবকাশ নেই। দু'হাতে ইস্পাতখানা বাগিয়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিপি একটি বীরপুরুষের ঘাড়ে। টুঁ শব্দটি করার আগেই এক ঘা পড়ল আর-একজনের ঠিক মুখের ওপর। হুড়মুড় করে পড়ল লোকটা একধারে। ততক্ষণে পিপির পায়ের তলায় যে পড়েছিল তার বুকের ওপর পর পর কয়েক চোপ লাগালে পিপি। এত অল্প সময়ের মধ্যে সেই ইস্পাতখণ্ড উঠল আর পড়ল যে শিকারটি আওয়াজ করারও ফুরসত পেলে না। দম আটকে সে তাকিয়ে রইল। বাঙালীর মেয়ে, চোখের সামনে খুন দেখতে অভ্যস্ত নয়, কাজেই বেচারার দম আটকাবার মত অবস্থা তখন। খুন তখন মাথায় চড়ে গেছে পিপির। এটাকে ছেড়ে সে আবার লাফিয়ে পড়ল আর-একটার ওপর। মুখের ওপর একটিমাত্র চরম আঘাতেই তার কাজ সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে তখন দেখতে যাচ্ছে, লোকটা আছে না গেছে। সটান দু'হাত ওপরে তুলে ঝাড়লে পিপি আর-এক ঘা লোকটার মাথায়। ফটাশ করে একটা শব্দ হল। তারপর ইস্পাতখানাকে টান মেরে একধারে ফেলে দিলে পিপি, দিয়ে শিকারটির দিকে তাকালে।

শিকারটি তখন সামলে উঠেছে। ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলে পিপির হাত একখানা। ফিসফিস করে বলে উঠল—"খুন করে ফেললেন সার! দু'দুটো মানুষকে খুন করে ফেললেন একেবারে?"

জবাব দিলে না পিপি। জবাব দেবার মত অবস্থাও তার ছিল না তখন, চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন সেই শিকারটিই যা করার করলে। জোর করে টেনে নিয়ে গেল পিপিকে সেখান থেকে। শিকারী দু'জন পড়ে রইল সেই গলিতে, তাদের আগ্নেয়াস্ত্র তাদের কোমরের চামড়ার খাপে যথাস্থানে বহাল তবিয়তে রইল। কি জাতের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে দু'দুজন বিশ্বস্ত সেবকের জান গেল, মহামান্য সরকার যদি তা জানতে

পারতেন। পারলেও অবশ্য কোনও ইতরবিশেষ্ হত না। যথাসময়ে যথাকালে সগৌরবে ওদের নামে স্বর্ণপদক ঘোষণা হবেই এবং কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে প্রাণদান করার দরুন ওদের সুযোগ্য বংশধররা যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেই। সুযোগ্য কর্মচারীদের কাছে খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়াবার এত বড় সুযোগটা কোনও সরকার অবহেলা করতে পারেন না।

শ্রীআদিশূর সোমের মেয়ে স্বাতী সোম অর্ধেক রাত্রে বাড়ি ফিরল একখানি সিল্কের চাদর অঙ্গে জড়িয়ে। শাড়ি নেই, সায়া ছিঁড়েছে, মুখ চোখ চুলের অবস্থা মর্মান্তিক ধরনের। বাড়ি ফিরতেই চাপা গোছের একটা গুঞ্জন উঠল চারিদিকে। পাড়ার মানুষে না টের পায় এমন ভাবে একটু কাঁদতে চেষ্টা করলেন স্বাতীর মা। মেয়ে না ফেরার দরুন দারুণ উৎকণ্ঠায় মুখ টিপে ছিল এতক্ষণ বাড়ির লোক। দু'একবার থানাতে ফোন করা বা চেনা-জানা দু'এক বাড়িতে খোঁজ নেওয়া, এ সমস্ত হয়েই গিয়েছিল। বেশী বাড়াবাড়ি করার না ছিল উপায়, না ছিল সাহস। একে তো সন্ধ্যার পর থেকেই এমন অবস্থা হয়ে উঠল শহরের যে, রাস্তায় বেরুবার উপায় নেই, তারপর কেলেঙ্কারি নামক একটা জিনিসের ভয়ও আছে। ভালোয় ভালোয় যদি ফেরে মেয়ে আর ইতিমধ্যে যদি চতুর্দিকে গাবিয়ে যায় যে, সোমেদের মেয়ে লোপাট হয়েছে, তাহলে শেষ সামালটা দেওয়া যাবে কেমন করে! ইত্যাদি নানা দিক চিন্তা করে সোমেদের বাড়ি কোনও রকমে নিঝুম হয়ে ছিল। তারপর স্বাতী বাড়ি ফিরল। এমন হালে ফিরল যে তৎক্ষণাৎ কারও মুখে রা ফুটল না। শুধু মায়ের গলা দিয়ে ক্ষীণ একটু ডুক্‌রনোর মত শব্দ উঠল। শব্দটা বাড়তে পেল না। বাড়ির কর্তা সঙ্গে সঙ্গে চাপা হুংকার দিলেন—"এই, চুপ!" ব্যাস্, চুপ তো চুপ। স্বাতীকেও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার ফুরসত পেল না তখন। সোজা সে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল এক মুহূর্ত বিলম্ব

না করে। তারপর ঝপাঝপ মাথায় জল ঢালার আওয়াজ শোনা গেল। চোখের জল মুছতে মুছতে মা শাড়ি সায়া ব্লাউজ বাথরুমের দরজায় রেখে এলেন।

সে রাত্রে আর একটুও গোলমাল হল না। স্বাতীর বাবা তৎক্ষণাৎ আলো নেবাবার হুকুম জারি করলেন। ছোটদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেই গিয়েছিল, বড়দের কারও খাওয়ার প্রবৃত্তি হল না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল স্বাতী। ঢুকে দরজায় খিল দিল। মা একবাটি দুধ নিয়ে এসে অল্প একটু ডাকাডাকি করে ফিরে গেলেন। স্বয়ং আদিশূর ইঞ্চিখানেক ব্যাসের এক চুরুট ধরিয়ে সমস্ত রাত সারা বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ালেন।

সকাল হল। খবরের কাগজ এল। সবাই জানতে পারল, প্রকৃত ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। খবরের কাগজের সংবাদ এক আনা, আর পনেরো আনা ওর সঙ্গে যোগ করলে যা দাঁড়ায়, তা কল্পনা করে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর স্বাতী যখন গুছিয়ে গল্পটা বললে তখন আর বেশী জেরা করার উৎসাহ রইল না কারও। স্বাতী বললে, সিনেমা থেকে বেরুবার পর গলির ভেতর দিয়ে ও বাড়ি ফেরবার চেষ্টা করে। দু'টো গুণ্ডা ওর পিছু নেয়। তারপর লাগে তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। তাইতেই তার ওই দশা হয়। শাড়িখানা খোয়া যায়। ভাগ্যক্রমে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন। তিনি দয়া করে তাঁর সিল্কের চাদরখানি ওকে দেন। তারপর বহু পথ ঘুরে, বহু জায়গায় লুকিয়ে থেকে কেমন করে কি ভাবে ও বাড়ি ফিরেছে তা ভাল করে মনেও করতে পারছে না।

বিশ্বাস করা না-করার প্রশ্নই উঠল না। চুপ করে গেল সকলে। স্বাতীর মা মনে মনে মানত করলেন, সব ঠাণ্ডাঠুণ্ডি হলে পাঁচসিকের ডালা দেবেন কালীবাড়িতে।···দোহাই মা কালী, ব্যাপারটা যেন পাঁচ-কান না হয়।

পাঁচ-কান হলও না। সবায়ের সব কটি কান তখন বড়র বড়,

তার বড় সংবাদের জন্যে উৎকর্ণ। সোমেদের বাড়ির ছোট্ট সংবাদটি তলিয়ে গেল সংবাদ-সাগরের অতল তলে। ওপর দিকে ভেসে ওঠবার সুযোগই পেল না।

দিন চার-পাঁচ পরেই সব জুড়িয়ে গেল। ছোট হিস্যার কর্তারা বড় হিস্যার কর্তাদের সঙ্গে আপস-রফার কথা তুলে ফেললেন। আর-একপ্রস্থ দাবির কান্না শুরু হল। পুলিসী জুলুম বন্ধ করতে হবে, বিচার-বিভাগীয় তদন্ত চাই, বিনাসর্তে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। শহর ঠাণ্ডা হল, খুন জখম বেইজ্জতি যা হল তা শুধু বেওয়ারিস মাল জনগণেরই হল। তা নিয়ে আর কে মাথা ঘামাচ্ছে! কর্তাদের মাথার ঘিলু অত সস্তা নয়, তাঁরা দেশের জাতির বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে দরদস্তুর শুরু করলেন নিজেদের মধ্যে। প্রয়োজনের কালে আবার যাতে জনগণ নেচে ওঠে, সেই রকম গরমাগরম বোলচাল শুরু হয়ে গেল। কোনও দিকেই কোনও কিছু বদলাল না, যথাপূর্বং সব ঠিকঠাক চলতে লাগল।

বদলে গেল শুধু স্বাতী সোম। যে মেয়ে ঝড়ের মত বলত কইত চলত ফিরত, তার ভেতর থেকে ঝড়ো হাওয়াটুকু অন্তর্ধান করলে! কেমন যেন চুপ্‌সে মিইয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল দিন দিন। মা-বাবা লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা, নেপথ্যে নিজেরা একটু আলাপ-আলোচনাও করলেন। সিদ্ধান্ত করলেন, বিয়ে দেবার চেষ্টা করা দরকার। বয়েস বাড়ছে, কলেজের পড়া শেষ করে ডিগ্রী পর্যন্ত পেয়েছে একটা। এখন বিয়ের চেষ্টা করে বিয়ে দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ডিগ্রী-পাওয়া মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজতে সময় বেশী লাগে। ওঁরা তলে তলে সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন।

স্বাতী সোমের বয়েসটা হঠাৎ এক লাফে অনেক উঁচুতে উঠে গেল।

ভালই হল, বয়েসের উপযুক্ত চালচলন হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। অবিশ্রান্ত হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানো, গুরুজনদের চোখ রাঙানোকে অবজ্ঞা করা আর সকলের পেছনে লেগে উস্তম্‌খুস্তম্‌ করা, এগুলো

সত্যিই ভালো কাজ নয়। শাসনও তো করার উপায় ছিল না মেয়েকে। শাসন করতে গেলে হিতে বিপরীত ফল দাঁড়াত। দুরন্ত-পনাটা যেত দশগুণ বেড়ে। তখন সসম্মানে শাসন প্রত্যাহার করে আপোস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।

সেই আপোস এবার স্বাতী সোমকে করতে হচ্ছে নিজের সঙ্গে। নিজের সঙ্গে আপোস করতে গিয়ে কেমন যেন বুড়িয়ে যেতে লাগল স্বাতী। ভেবেই পাচ্ছিল না সে, কি করা যায় অমন মানুষের সঙ্গে। যে মানুষ সমানে দু'বছর সামনের চেয়ারে বসে পড়িয়ে গিয়ে অম্লানবদনে বলতে পারে—"কই, চিনতে পারছি না তো আপনাকে! কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না"—এমন মানুষকে জব্দ করতে গেলে কি করা প্রয়োজন! নানা জাতের নানা রকম মতলব মাথায় আসে স্বাতীর, কিন্তু কোনটাই ঠিক উপযুক্ত বলে মনে হয় না। এধারে দিনের পর দিন পার হয়ে গেল, লোকটির আসবার নাম নেই। স্পষ্ট অঙ্গীকার করেছিলেন কিন্তু, আসবেন একবার, এসে চাদরখানি নিয়ে যাবেন। সেই অঙ্গীকারটুকুও কি ভুলে গেলেন একেবারে! অসম্ভব নয়, সবই সম্ভব ওই জাতের মানুষের পক্ষে। অসম্ভব জেনেও চাদরখানিকে ভালো করে ধুইয়ে যত্ন করে তুলে রেখেছে স্বাতী। তুলে রেখে একটা অসম্ভব আশা নিয়ে বেঁচে আছে। একদিন না একদিন আসবেন তাঁর চাদরখানি নিতে নিশ্চয়ই। তখন স্বাতী যা করবে যা বলবে, তা একেবারে অকল্পনীয় কাণ্ড। অম্লানবদনে বলে বসবে—"কই, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো! আচ্ছা, বেশ তো, চাদরখানা যদি আপনারই হয় তবে না হয় নিয়েই যান।" কথাগুলো কায়দামত ঠিক ঠিক সুরে বলতে পারলে কি রকম অবস্থা দাঁড়াবে তখন তাঁর মুখখানির! যাকে বলে একেবারে চুন হয়ে যাওয়া, তাই হবে। মানসচক্ষে সেই চুন-হয়ে-যাওয়া মুখ দেখতে দেখতে স্বাতীর মুখখানি অস্বাভাবিক রকমের চুন হয়ে উঠল।

অহর্নিশ একা একা গুমরে মরা আর প্রতীক্ষা করা, এই দু'জাতের

বিষ একবার যার মনে আশ্রয় নেয়, তার দুই চক্ষু খুব বেশী মুখর হয়ে ওঠে। সবই চাপা যায়, ভেতরের তুষানল বাইরে এতটুকু প্রকাশ পায় না যদি মোক্ষম শক্তি থাকে চেপে রাখবার, কিন্তু চোখের দৃষ্টিটুকুকে কিছুতে লুকনো যায় না। স্বাতীও পারলে না তার দুই চক্ষুর ভাষাকে চাপা দিতে। যে চক্ষু দুটিতে মুহুর্মুহুঃ আলোছায়ার বিচিত্র খেলা দেখা যেত, কোনও সময়েই যে চক্ষু দুটির চাউনি স্থির হতে জানত না, ধূর্ততা আর প্রগল্‌ভতায় যে চক্ষু দুটির নিবিড় কালো মণি দুটিকে বড্ড বেশী চক্‌চকে দেখাত, সে চোখে শ্রাবণ-আকাশের গুরুগম্ভীর থমথমে মেঘের উদয় হল। স্থির হল চোখের মণি দুটি, মণি দুটিকে ঘিরে রইল অতল সাগরের রহস্যময় নিস্তব্ধতা। নাকের ওপরে মিশ-খাওয়া মিশমিশে কালো ভুরু দুটি আরও যেন নুয়ে পড়ল দু'পাশে। আঁখিপল্লবগুলো সোজা হয়ে রইল না, নিবিড় ভাবে চোখের ওপর নুয়ে এল।

নুয়ে পড়ল স্বাতী নিজেও। ওর কোমর বুক গলা সবই যেন কেমন একটু ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। তার ফলে ওর চলনে এল ছন্দ, বনহরিণীর মত চকিতচলনে ও আর চলতে পারল না। সবচেয়ে পরিবর্তন দেখা গেল ওর রুচিতে। অতিরিক্ত রকমের রঙ-চঙে হালফ্যাশানের জামাকাপড় ছাড়া যে মেয়ে অন্য কিছু ছুঁতই না, সে হঠাৎ মারাত্মক রকমের পক্ষপাতী হয়ে উঠল সাদা রঙের ওপর। নিজের জামাকাপড় সমস্ত ছোট বোনকে আর বউদিদিদের সেধে সেধে দিয়ে দিলে। কোনও রকমে কয়েকটা টাকা মায়ের কাছ থেকে আদায় করে ধুতি কিনে নিয়ে এল। সরুপাড় সাদা ধুতি আর সাদা ব্লাউজ, ব্যাস্, আর-কিছু নয়। এমন কি হাতে কানে গলায় যা ছিল তাও বর্জন করলে। দেখে-শুনে বাড়ির লোক আর-একবার ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল। ফল কিছুই হল না। তর্ক করলে না, ঝগড়া করলে না, অনায়াস অবহেলায় সকলের সব রকম নিন্দাস্তুতি খোশামুদি হজম করে ফেললে।

আদিশূর সোমের মেয়ে স্বাতী সোমের চক্ষু দুটিতে যে স্নিগ্ধ আলো জ্বলে উঠল, সে আলোর রহস্যময় অর্থ সম্বন্ধে অবহিত হবার অবকাশ ও-বাড়ির কারও ছিল না। বাঙালীর সদা-টলটলায়মান সংসার-তরণীর আরোহীদের মাপজোখ-করা জীবনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের স্থান আছে, আদুরেপনা বা আদিখ্যেতার স্থান নেই। মানিয়ে-চলা আর খাপ-খাইয়ে নেওয়া, এই দুটি মূলধন সম্বল করে বাঙালী-সংসার টিকে থাকে। এই টিকে থাকার জন্যে প্রাণান্ত করতে হয় যেখানে সকলকে, সেখানে কে কার চোখের দিকে নজর দিতে পারে।

অবশেষে চোখের দিকে নজর দেবার মত চোখ নিয়ে হঠাৎ এসে পড়লেন সোমেদের বাড়ির ছোট মাসীমা। ছোট মাসীমা এলেন ছোট মেসোমশাইকে সঙ্গে নিয়ে। চিরকালই একসঙ্গে আসেন ওঁরা। সবাই জানে, ছোট মাসীমার সঙ্গে পোঁটলা-পুঁটলি, হোল্ড-অল্, সুট্‌কেস, পুজোর বাক্স, জলের কুঁজো, হাত-পাখা, পানের বাটা যেমন থাকে, তেমনি ছোট মেসোমশাই নামক একটি অপূর্ব সামগ্রীও থাকে। অর্থাৎ কিনা ছোট মাসীমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ছোট মেসোমশাইও একটি। সব জিনিসই সমান সাবধানতায় সমান দরদ দিয়ে সামলান ছোট মাসীমা, সামলে নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ান। সত্যিই ত্রিভুবন ঘোরেন। এস্কিমোদের দেশ থেকে হাইলে সেলাসীর দেশ পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয় ছোট মাসীমাকে। কারণ হল, ছোট মেসোমশাইকে ইউনাইটেড নেশন্‌সের বিজ্ঞান সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাদি ব্যাপারের এক প্রদর্শনী দেখিয়ে বেড়াতে হয় বিশ্বময়। চাকরিটি ছোট মেসোমশায়ের, করেন ছোট মাসীমা। প্রদর্শনীর বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য জিনিস হলেন স্বয়ং ছোট মেসোমশাই। সেই স্বয়ংকেই যিনি সামলান, তিনিই চাকরিটি করেন বললে কিছু অন্যায় বলা হবে না।

পদার্পণ করেই ছোট মেসো হাঁক ছাড়লেন—"এই অশ্লেষা মঘা পুষ্যা বিশাখা অনুরাধা, শিগ্‌গির আয়। খুলে দে আগে টাইটা।

উঃ, প্রাণ গেল, এই গরমে মানুষ বাঁচে।" হাঁক ছেড়ে তাঁর একইঞ্চি-প্রমাণ গর্দানে বাঁধা টাই নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন।

অন্য-অন্যবার হাঁক ছাড়বার আগেই ছোট মেসোর পেছনে উপস্থিত থাকত স্বাতী। টাই কোট জুতো মোজা খুলিয়ে নিয়ে পাজামা পরিয়ে ছোট মেসোকে খাটের ওপর আসীন করে তবে অন্যদিকে নজর দিত। এবার হাঁক ছাড়বার পরেও যখন উপস্থিত হল না, উপস্থিত হল স্বাতীর বোন প্রীতি, তখন মেসো বেশ চমকে গেলেন। ভাঁটার মত চোখ দুটো খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইল প্রীতির ওপর। তারপর আর-একটি হুংকার ছাড়লেন—"তুমি কে বটে? তুমি তো আকাশের নক্ষত্র নও; তুমি একটি মাটির চেরাগ। মিট্‌মিট্‌ করছ চট্‌চটে রেড়ির তেলের পিদিম। যাও, তুলসীতলায় বসে থরথর করে কাঁপো গে। তোমার কর্ম নয় বুনোহাতীর ছাল ছাড়ানো। কোথা গেল সেই আকাশের তারাটা! বোলাও জল্‌দি।"

ততক্ষণে বাড়ির ভেতর হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে। জিনিসপত্র সব গাড়ি থেকে নেমে জমা হয়েছে ভেতরের দালানে। ছোট মাসী জিনিসগুলো গুনে মিলিয়ে নিয়ে চোখ তুলতেই সামনে পড়ে গেল স্বাতী। দুধের মত সাদা জামা-কাপড়-পরা কে ও নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে! নজরে পড়তেই চিনতে পারেন নি মাসী। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন হাঁ করে। তারপর ডাক দিলেন—"কে ওটা! স্বাতী নয়?"

স্বাতী ফিরল, ফিরে এসে মাসীকে প্রণাম করে শান্তগলায় বললে—"যাই, মেসোমশায়ের কি দরকার দেখিগে।"

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন মাসী ওর চলার দিকে। তারপর তিনিও হাঁক ছাড়লেন—"দিদি, দিদি কোথায় গেলি?"

স্বাতীর মা ছুটে এলেন। বললেন—"এই যে ভাই, গরম জলটা চাপিয়ে এলাম। তোমার ওনার তো আবার গরম জল চাই।"

মাসী খিঁচিয়ে উঠলেন—"চুলোয় যাক গরম জল। হয়েছে কি মেয়ের ?"

মাসীর দিদি আকাশ থেকে পড়লেন—"কই! কিছুই হয় নি তো! বয়েস বাড়ছে, তাই একটু—"

মুখের কথা তাঁর মুখেই রইল। বোনটি একেবারে ফেটে পড়লেন —"চোখের মাথাও খেয়েছিস বুঝি! পেটে ধরেছিলি কেন মেয়ে, যদি মেয়ের চোখ দেখে কিছু বুঝতেই না পারিস ?"

ফাঁপরে পড়ে গেলেন স্বাতীর মা। পেটে ধরেছেন বলে যথাসাধ্য খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছেন মেয়েকে, লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। এবার বিয়ে-থা দিয়ে দেবেন। ব্যাস্—এর বাড়া আর কি করতে পারেন তিনি! আর চোখ দেখে বোঝাবুঝির কি আছে! জ্বরজ্বারী হলে চোখ লাল হয় বটে। কিন্তু কই, স্বাতী তো কখনও অসুখ-বিসুখের কথা বলে নি!

একটু ভয়ই পেয়ে গেলেন, বললেন, "কই! তেমন কোনও অসুখ-বিসুখ করে নি তো!"

ছোট মাসী হিসহিস করে স্বগতোক্তি করলেন—"নেকু, নেকুর হদ্দ হয়ে রইল চিরকালটা। বুড়ো হয়ে মরতে চলল এখনও আক্কেল হল না।"

বলে দুমদুম করে পা ফেলে গিয়ে ঢুকলেন সেই ঘরে, যেখানে ছোট মেসোর গর্দান থেকে টাই খোলার চেষ্টা করছিল স্বাতী।

ছোট মেসো ততক্ষণে বসে পড়েছেন একখানা সোফায়। বসে চক্ষু বুজে আওড়াচ্ছেন—"সাদা রঙ হল সব রকম রঙের সমন্বয়, আর কালো রঙটা রঙই নয়। বেশ করেছিস, সাদা পরেছিস। সাদা শান্তির প্রতীক। ব্যাস্, আর যুদ্ধ নয়, রফা করে ফ্যাল্ জীবনের সঙ্গে। চক্ষু মুদে ফুঁকে দাও জীবনটা, কি লাভ রঙবেরঙের সাজ-পোশাক পরে সঙ সাজবার। কি লাভ—"

সশব্দে ঘরে ঢুকে মাসী ঘোষণা করলেন—"স্বাতী, এবার তুই

যাবি আমাদের সঙ্গে। জাভা সুমাত্রা ইন্দোনেশীয়া আরও সব কাছাকাছি জায়গায় এবার ঘুরতে হবে আমাদের। থাকবি তুই আমাদের সঙ্গে। ব্যাস্, এই অন্ধদের বাড়িতে আর কিছুতেই থাকতে পাবি না।"

"আঁঃ!" সশব্দে চোখ মেললেন ছোট মেসো। মাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"অন্ধ! অ্যাঁঃ! একদম ব্লাইণ্ড! বলো কি? সোম-গুষ্টি চোখের মাথা খেলো কি করে!"

তেড়ে উঠলেন ছোট মাসী—"চুপ, একদম চুপ। জ্বালাতে এসো না বলে দিচ্ছি। কি করে অন্ধ হল, জিজ্ঞেস কোর তোমার ভায়রাভাই আদিশূর মহারাজকে। কিংবা জান গিয়ে মহারাজের সেই নেকু মহারানীর কাছে। স্বাতী, মেসোর জামা-টামা ছাড়িয়ে ওপরে আয় দেখি। আমাদের থাকবার ঘরটা হাতাহাতি একটু গুছিয়ে নি। গরম জল করছে তোর মা, মেসোকে স্নান করতে বলে ওপরে চলে আয়।"

হুকুম জারি করে যথেষ্ট সাড়াশব্দ তুলে মাসী স্থানত্যাগ করলেন।

এতক্ষণ পরে ধাতস্থ হলেন মেসো। টাই খুলে নিচু হল স্বাতী জুতোর ফিতে খোলবার জন্যে। মেসো পা সরিয়ে নিলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন—"উঠে দাঁড়া তো মা, দেখি তোর হলোটা কি!"

স্বাতী সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"তাকা, তাকা আমার চোখের দিকে ভাল করে।" হুকুম করলেন মেসো।

একটিবার চোখ তুলেই স্বাতী চোখ নামিয়ে ফেললে। সেইটুকু চাউনিতেই সন্তুষ্ট হলেন মেসো। বললেন—"ব্যাস্, হয়ে গেছে। ধরে ফেলেছি, কিন্তু ওর ঠিকানাটা কি তাই বল আগে। তারপর যা করার করছি।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতী বলে উঠল—"ঠিকানা! কার ঠিকানা?"

"সেই অত্যাশ্চর্য প্রাণীটির—যার ছায়া তোর চোখের মণিতে

ফুটে রয়েছে।” ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন মেসো। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না সেখানে স্বাতী। মাথা নিচু করে দ্রুত-পায়ে বেরিয়ে গেল।

পুনর্বসু পালিতও আর পিপি রইল না।

সেই রাত্রেই তাকে শহর ছাড়তে হল। পিপির ভগ্নীপতি ধনুর্ধর উকিল চতুরানন চৌধুরী যথোচিত ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন তিনি—“আদালতের আওতায় পৌঁছবার আগেই হাড় গুঁড়িয়ে ছাড়বে। এই ডামাডোলের বাজারে যদি ধরতে পারে একবার, তাহলে এমন পেষাই দেবে যে, পেটের নাড়ীভুঁড়ি নিঙড়ে বার করবে আসল ব্যাপার। ঘাঘু ঘড়েলরা পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যায় মারের চোটে, তুমি তো আসল একটি ভদ্রলোক। যাও, কথাটি না বলে বেমালুম উধাও হও। এধারে আমি ডায়েরী করিয়ে রাখি। তারপর হৈ-হুজ্জত কমলে দেখা যাবে। ওদের হাতে না পড়তে হয়, এইটুকুই আসল কথা।”

অগত্যা রাজী হতে হল পিপিকে। মারকে তার বিষম ভয়। গাড়ির গরু ঠেঙাতে দেখলেও পিপি সহ্য করতে পারে না। একবার মুর্শিদাবাদে গিয়েছিল এক বন্ধুর বরযাত্রী হয়ে। স্টেশন থেকে কনের বাড়ি পর্যন্ত যাবার জন্যে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। পিপি গাড়োয়ানকে দু’টো টাকা ঘুষ দেয় গরু দুটোকে না ঠেঙাবার জন্যে। সেই পিপি যে ঠেঙানির ভয়ে সট্‌কাবে, এ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

পালানোটা স্বাভাবিক হলেও, পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবার স্থানটি বড্ড বেশী বেজুত গোছের হয়ে দাঁড়াল পিপির পক্ষে। চতুরানন তাঁর এক প্রতিভাশালী মক্কেলকে ডেকে শ্যালকের পালাবার ভার তার ওপর ন্যস্ত করলেন। মক্কেলটি বার-পাঁচেক ফেরার হয়েছিল, বার-তিনেক দেউলে খাতায় নাম লিখিয়েছিল। তার

পরেও গোটা-চারেক কোম্পানীর সর্বেসর্বা হয়ে সশরীরে শহরের বুকে বিচরণ করছিল। মানতেই হবে, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে উপযুক্ত কর্মের ভার দিয়েছিলেন চতুরানন। উপযুক্ত ব্যক্তিটি পিপিকে শহর ছাড়ালেন। ছাড়িয়ে শহরের আকাশে আশ্রয় দিলেন।

আকাশেই বটে।

শহরের ঠিক মধ্যস্থলে দশতলা এক অট্টালিকা। সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্তের পরেও ঘণ্টা দু'য়েক অট্টালিকাটির খোপে খোপে তামাম দুনিয়ার সব জাতের মানুষ আনাগোনা করে। খট্-খটাখট্ টাইপরাইটার চলে, অঙ্ক-যন্ত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি টাকার হিসেব তৈরী হয়, বিল পাস হয়, অর্ডার দেওয়া হয়, ভাউচার চেক হুণ্ডি হুস্‌হুস্ করে সই হয়ে বেরোয়। বড়সাহেব ছোটসাহেব দালাল মুচ্ছুদ্দীরা চাপরাসী পিওন দরোয়ান বেনিয়ানদের ওপর হম্বিতম্বি চালান। তারপর সমগ্র অট্টালিকাটি অন্ধকার হয়ে যায়, ঘরে ঘরে তালাচাবি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র একটি আলো জ্বলে সামনের দরজায়। সেখানেও কল্যাপ্‌সিব্‌ল গেটে বড় বড় তালা ঝোলে। গেটের পেছনে লিফটের খাঁচার সামনে জোড়া জোড়া চারপাইয়ের ওপর শুয়ে নধরদেহ মজফরপুরী ভেইয়ারা তারস্বরে বজরংবলীর শ্রীনাম গান করে।

সেই অট্টালিকার আকাশ-ছোঁয়া ছাতে স্থান হল পিপির। শহরের ঠিক মাঝখানে শহর-ছাড়া হয়ে থাকা, এ সৌভাগ্য ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! পিপির বরাতে তাই ঘটল। ভগ্নীপতির মক্কেল বোঝালেন, এমন স্থান কোথাও নেই। বাইরে কোথাও নতুন জায়গায় গেলে নতুন লোকটি কে, কোথা থেকে এল মানুষটি, কেন এল, এই সমস্ত প্রশ্ন তুলে পাঁচজনে হৈ চৈ করবে। দশতলার ছাতে সে ভয় নেই। ছাতের ওপর সহজে চড়বেও না কেউ। জলের ট্যাঙ্ক সারাতে ন'মাসে ছ'মাসে যদি কেউ ওঠে। উঠলেও ভয় নেই, দরোয়ানরা আগেই সাবধান করে দিয়ে যাবে।

সেই ছাতের ওপর খান-দেড়েক বেঁটে ঘর। ঘর তু'খানির সাজসরঞ্জাম আসবাবপত্র দেখে পিপির ধাত ছাড়ার উপক্রম হল। বিলাস-ব্যসনের সমস্ত উপচার থরে থরে সাজানো রয়েছে। বড় ঘরখানির মেঝে-জোড়া দেড় হাত উঁচু গদি পাতা, গদির ওপর সাদা ধপধপে চাদর, মখমলের তাকিয়া। ছোট ঘরখানিতে বহুমূল্য কাঁচের বাসন-কোসন, ইলেকট্রিক উনুন, কাপড়-চোপড় ছাড়বার মুখহাত ধোবার ব্যবস্থা। আরও এমন অনেক জিনিস ঘরে রয়েছে, যার নামই কখনও শোনে নি পিপি, তা চোখে দেখা তো অনেক দূরের কথা। সেই ঘর তু'খানি আসবাবপত্র সমেত পিপির হেপাজতে দেওয়া হল। খাওয়া-দাওয়ার জন্যেও কোনও ভাবনা নেই। বড় ঘরখানির চতুর্দিকের দেওয়ালের মাথা জুড়ে কৃষ্ণ-রাধিকার নানা লীলার বিচিত্র সব ছবি ঝুলছে। ওঁদের ভোগসেবার জন্যে যথা সময়ে ক্ষীর পেঁড়া পুরি মিঠাই ফল মেওয়ার থালি আসে। সেই প্রসাদ গ্রহণ করলেই হল। কষ্ট যা, তা শুধু দিনের বেলার রোদের তাপটা। সন্ধ্যার ঘণ্টা-তুয়েক আগেই কিন্তু সব জুড়িয়ে যায়। তখন হাড়-জুড়নো হাওয়া বয় দক্ষিণ থেকে। সারা শহর পুড়ে গেলেও দশতলার ছাতে তাপ থাকে না। স্বর্গ আর কাকে বলে!

কিন্তু স্বর্গীয় সুখটাও বরদাস্ত হল না পিপির। স্বর্গ থাকলেই স্বর্গের অপ্সরী-কিন্নরীরা থাকবে। অপ্সরী-কিন্নরীদের লোভে দেবতারাও ছোঁক ছোঁক করবেন। এই সমস্ত না হলে স্বর্গকে স্বর্গ বলে মানায় না যে। পিপির স্বর্গেও স্বর্গীয় উপচার আমদানি হতে লাগল। প্রথম তুটো দিন তুটো রাত কিছুই হল না। তৃতীয় রাতটি হল শনিবারের রাত। দিনের বেলাতেই পিপির ভগ্নীপতির মক্কেলমশাই সংবাদ পাঠালেন, রাত্রে তিনি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে আসবেন। একটু খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ হবে। ভয় নেই কিছুই, সব কটি বন্ধুবান্ধবই তাঁর ভয়ানক রকমের বিশ্বাসের পাত্র।

তাঁরা এলেন।

ফলে শেষ রাত পর্যন্ত ছাতের কোনায় ট্যাঙ্কের আড়ালে গিয়ে বসে থাকতে হল পিপিকে। ওঁরা অবশ্য ওকেও স্ফূর্তিতে যোগ দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। ও পারে নি। নিজের মৌলিকতা আঁকড়ে ধরে ট্যাঙ্কের পাশে আশ্রয় নিয়েছিল। ছুটি চোখ এবং ছুটি কান—এই চারটি শত্রু সঙ্গে থাকার দরুন দশতলার ছাতের উপরেও দরদর করে ঘেমেছিল। তারপরেও রেহাই পেল না। ওঁরা চলে গেলেন একটি স্ফূর্তির সামগ্রীকে ত্যাগ করে। মক্কেলমশাই বলে গেলেন, সে সামগ্রীটিও দশতলার ছাতে আশ্রয় নিলে। না নিয়ে নাকি উপায় ছিল না তার। কয়েকটি দিন লুকিয়ে না রাখতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা। পিপির কাছে রেখে যাওয়ার আরও একটু কারণ আছে। মানে, পিপি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সামলাতে পারবে। তা ছাড়া একটু শান্তিও পাবে ছু'জনে একসঙ্গে থাকলে। নেহাত একা-একা দশতলার ছাতে বসে থাকাটা সত্যিই কষ্টকর। একান্ত সহানুভূতির বশেই ব্যবস্থাটা করে গেলেন ওঁরা। সহানুভূতির তাপে পিপি কতটা পরিমাণ গলল, তা তাঁরা আন্দাজ করতে পারলেন না। সেরকম অবস্থা তখন তাঁদের ছিল না। পা মাথা, মন মেজাজ অসম্ভব রকম ঘুরপাক খাচ্ছিল সকলের। ঘুরপাক খেতে খেতে তাঁরা নেমে গেলেন ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে। তারপর কেমন করে কোথা দিয়ে যে রাজপথে পৌঁছলেন, তা পিপিও আন্দাজ করতে পারল না।

রাত কাবার হল। গদির ওপর মড়ার মত মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন তিনি, ছাতময় পায়চারি করে বেড়াল পিপি। মনে মনে সংকল্প করল পিপি, আর নয়। আর এক রাতও নয়, পালাতে হবে। পালিয়ে যাদের হাতে পড়বে, তাদের ঠেঙানির বহর যেমনধারাই হোক না কেন, নিশ্চয়ই স্বর্গীয় ঠেঙানি নয়। দশতলায় ছাতের ওপর এক রাত্রেই যে মোক্ষম চোরাগোপ্তা মার খেতে হয়েছে তাকে, তাতে

আর-একটি রাতও স্বর্গে কাটাবার শখ নেই। পালাতে হবে, যেভাবে হোক পালিয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে সে মর্তের লোকের হাতে। তারপর কপালে যা আছে হবে, পরোয়া নেই।

মন স্থির করে পিপি অপেক্ষা করতে লাগল। লুচি, পেঁড়া, মোণ্ডা মিঠায়ের থালি যখন আসবে, তখন তো খুলবে সিঁড়ির দরজা। সেই ফাঁকে এক দৌড়ে নেমে গিয়ে প্রথমে যাদের সঙ্গে দেখা হবে, তাদের কাছেই সোজা আত্মসমর্পণ। তখন সারা বাড়িটায় হাজার হাজার মানুষ গিজগিজ করবে। কাজেই ভয়টা কোথায়।

ভয়টা কোথায় খুঁজতে গেলেই ভরসাকে খুঁজতে হয়। ভয় আর ভরসা দুই যমজ ভাইবোন, ওর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ভরসাকে খুঁজতে গিয়ে বার বার মাত্র একখানি মুখ ফুটে উঠল পিপির মনের পর্দায়। সেদিন রাত্রে সিল্কের চাদর-খানি গায়ে জড়িয়ে দেবার পরে সে মুখ আর সোজা হয় নি। থুতনিটা প্রায় ঠেকেই ছিল বুকের সঙ্গে। অথচ তার আগে সেই ছেঁড়া সায়া আর ছেঁড়া ব্লাউজ পরে পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে অনবরত ঝগড়া করার চেষ্টা করছিল।

"কি মানুষ আপনি সার! সত্যিই আমাকে চিনতে পারছেন না!" রাগে অভিমানে গলাটা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিনতে পিপি সত্যিই পারে নি। সত্যিকথাটা মুখের ওপর বলতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকছিল ওর। গলিটাও শেষ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। পিপি তাড়াতাড়ি চাদরখানা নিজের কোমর থেকে খুলে নিয়ে তার গা-মাথা মুড়ি দিয়ে দিয়েছিল। ব্যাস্, আর-একটিও কথা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে পড়েছিল মুখখানি। সে মুখ আর একবারও ওঠে নি। ওদের রাস্তাটার মোড়ে পৌঁছে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিল সে—"আর আসবেন না?"

সে প্রশ্নেরও জবাব দেয় নি পিপি। জবাবও দেয় নি, এক পা এগোয়ও নি।

তখন ঠিক সেইভাবে মুখ না তুলেই আর-একটি প্রশ্ন করেছিল—"চাদরখানা! চাদরখানা কি হবে?"

পিপি কথা দিয়েছিল—"একদিন এসে নিয়ে যাব, কথা দিলাম।"

সেই কথাটি কি আর রাখা সম্ভব হবে! স্বর্গ থেকে নেমে আর-একবার কি সে মর্ত্তভূমে পদার্পণ করতে পারবে! কি শোচনীয় অবস্থায় পড়ে গেল সে! শেষ পর্যন্ত মধুচক্রের পুঁজ-রক্তের মধ্যে তাকে হাবুডুবু খেতে হচ্ছে! কি উপায়ে সে উদ্ধার পাবে এই পঙ্কিল পাতকুয়ো থেকে!

আচমকা পেছন থেকে ঠিক ওই প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করা হল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলা হল কথাগুলো—"কতক্ষণ পচতে হবে এই পাঁকের মধ্যে?"

টপ্ ক'রে ঘুরে দাঁড়াল পিপি। হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল একটি সাকার প্রশ্নের দিকে। তাকিয়েই রইল, মুখ দিয়ে রা ফুটল না।

জলজ্যান্ত একটি জিজ্ঞাসা! রক্তে মাংসে গড়া নিখুঁত একটি প্রহেলিকা! রহস্যময়ী একটি সংশয়। সংশয়টি হল, যে রূপের জন্যে পাঁকে আশ্রয় নিতে হয়, সে রূপের জন্যে দায়ী কে! আমি না আমার সৃষ্টিকর্তা! সৃষ্টিকর্তার খোশ-খেয়ালের দরুন আমি কেন পচে মরতে যাব?

সৃষ্টিকর্তার খোশ-খেয়ালের দিকে নজর পড়াতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসল পিপি। জ্বলছে···পুবদিকে মেটে-সিঁদুরের আভাটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। সেই রক্তিমাভার মধ্যে ফুটে রয়েছে একটি রক্তকমল—পাঁকেই ফুটে থাকে, তাই তার আর-এক নাম পঙ্কজ। পঙ্কজের কোনও আবরণ নেই, আভরণ নেই। আপনাতে আপনি বিকশিত পঙ্কজ নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে পাঁকের জয়গান গায়।

এই পঙ্কজটিও কি পাঁকের জয়গান গাইবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে!

স্তব্ধ হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল পিপি কমলটিকে। ভয়ানক ধারালো নাক চোখ মুখ চিবুক, শাঁখের মত পিছল গলাটি। ছুই কানের নিচে থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন মোমের তৈরি। তারপর খুব সামান্য একটু বক্ষবন্ধনী, বক্ষবন্ধনীর পরে কোমর, কোমর মুঠিতে ধরা না গেলেও মনেতে ধরে। মনকে আর নামতে দিলে না পিপি, চোখ তুলে মুখের দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি প্রশ্ন হল। যেন একহাতা গনগনে কয়লা ছিটকে এসে পড়ল পিপির মুখের ওপর। ভয়ানক সুরে জিজ্ঞাসা করল প্রহেলিকা—"কি পছন্দ হল ?"

পিপি মুখ ঘুরিয়ে নিলে। শুধু মুখই ঘুরলে না, একেবারে পেছন ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু পিঠ পেতে দিলেই কি রক্ষে আছে! পিঠের ওপর একশোটা ভিমরুল একসঙ্গে হুল ফুটিয়ে দিলে। আরম্ভ হয়ে গেল হাসি। সে কী হাসি! রাশিরাশি নোড়ানুড়ির ওপর দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝরনা যেন পাগল হয়ে ছুটে চলল! তোড়ের চোটে ভয় পেয়ে গেল পিপি। আবার সে ফিরতে বাধ্য হল এধারে। ফিরে সভয়ে সেই পাহাড়ী ঝরনার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর একসময় থামল হাসি। নিজে থেকে থামল না, যে আঁচল এতক্ষণ বুক থেকে গা থেকে খসে পড়ে লোটাচ্ছিল ছাতে, সেই আঁচল তুলে নিয়ে ছোট্ট হাঁয়ের মধ্যে পুরে দেওয়া হল। দম আটকে আরও লাল হয়ে উঠল চোখ-মুখ। শেষে হাসির তোড় কমল। তখনও আরও কাপড় মুখে ঠাসা হচ্ছে···

আর সহ্য হল না পিপির, লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরল হাত ছু'খানি। এক হেঁচকায় মুখ থেকে আঁচলটা টেনে বার করে নিলে। নিয়েই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ঠাস করে বাঁ গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। দিয়ে তীব্রদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

চড় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। কমলফুলটি ভয়ানক ভাবে চমকে উঠে পিপির মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে

রইল, তারপর হাত তুলে আলতো ভাবে একবার গালটা ঘষে নিয়ে নত চোখে কত কি যেন ভাবতে ভাবতে ফিরে চলল। এবার আঁচলটাও সামলালে। যে আঁচল এতক্ষণ লুটোচ্ছিল ছাতময়, সে আঁচল জড়ো হয়ে কাঁধে উঠল। শুধু কাঁধেই উঠল না, আঁচল দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা হল। ঢাকতে-ঢাকতেই ফিরে চলল ঘরের দিকে।

খুব শান্ত-গলায় ডাক দিল পিপি—"শোন!"

স্তব্ধ হল পা ছু'খানি। এধারে ফিরল না, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শোনবার জন্যে। এগিয়ে গেল পিপি, পাশ দিয়ে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। ফিসফিস করে বললে—"স্নান করবে? স্নান করে নাও না ভাল করে। ওপাশের ছু'টো ট্যাঙ্কে কলের জল উঠছে। ঠাণ্ডা জল, খুব ভাল লাগবে স্নান করলে। চল না, তোমার মাথায় আমি জল ঢেলে দিচ্ছি।"

শুনল প্রস্তাবটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। শুনতে শুনতে ছু'একবার যেন কেঁপে উঠল দেহখানি। পিপি বুঝতে পারলে, নিঃশব্দে কাঁদছে। পাষাণ হয়ে গেল পিপি সে কান্না দেখে। বোবা কান্না, মৌন কান্না, এ ছুনিয়ায় আপনার বলতে কেউ কোথাও না থাকার দরুন যে কান্না, সে কান্না যে কত মর্মান্তিক, তা মর্মে মর্মে অনুভব করলে পিপি। কয়েক মিনিট সেইভাবেই কেটে গেল। ছু'জনেই নড়ে না, ছু'জনেই যেন পাষাণ হয়ে গেছে। পাষাণের কান্না কাঁদছে একজন, অপর জন পাষাণ হয়ে গিয়ে পাষাণের কান্না দেখছে।

শেষে চমক ভাঙল পিপির। তারপর সে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। একখানা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে একটা ট্যাঙ্কের পাশে। ট্যাঙ্কের ওপর একটা ছোট বালতি ছিল। ওই বালতি দিয়ে জল তুলে নিজে সে চান করেছিল ছু'দিন। লাফিয়ে উঠল ট্যাঙ্কের ওপর। ঢাকা খুলে বালতি ডুবিয়ে জল

তুলে হুড়হুড় করে ঢালতে লাগল সেই কান্নার মাথায়। জলের তোড়ে কান্নাকে ধুয়ে দিয়ে তবে সে ছাড়বে।

স্বাতী সোম কাঁদতে শেখে নি। কেমন করে কাঁদতে হয়, তাও হয়তো সে জানত না। জানত হাসতে, হঠাৎ হাসবার কায়দাটাও ভুলে মেরে দিয়েছে। দিয়ে হাসি-কান্নার বাইরের জগতে দাঁড়িয়ে কান্না-হাসি দিয়ে গড়া জগৎটাকে ক্ষমাহীন নয়নে দেখছে।

কথাটাকে অদ্ভুত ভাষায় ব্যক্ত করলেন ছোট মাসী ছোট মেসোর কাছে। বললেন—"মেয়েটা হঠাৎ নিবে গেছে।"

মেসোর মেজাজটা খিঁচড়েই ছিল। আমুদে মানুষ তিনি, নিজের লোকের সঙ্গে মিলে-মিশে আমোদ-আহ্লাদ করবার জন্যে তিনি আসেন। এসে ভায়রাভায়ের বাড়িতে উঠে যে পয়সা খরচ করেন, তা দিয়ে অনায়াসে শহরের সবচেয়ে দামী হোটেলে থেকে যেতে পারেন। তবু ভায়রাভায়ের বাড়িতেই ওঠেন প্রতিবার, সোমেদের বাড়ির সবাইকে নিয়ে কয়েকটা দিন সিনেমা থিয়েটার জলসা দেখেন, হোটেলে নিয়ে গিয়ে সকলকে খাওয়ান। এটা-ওটা-সেটা রাশীকৃত বাজে জিনিস কিনে দেন সকলকে। তারপর আবার একদিন উধাও হন। কেন করেন এত হাঙ্গামা? তার কারণ নিজেদের ছেলেমেয়ে নেই। ভায়রাভায়ের ছেলেমেয়েরাই সব। আবার সব কটি ছেলেমেয়ের ভেতর স্বাতীকেই তিনি সেই ছোটবেলা থেকে বিশেষ সুনজরে দেখেন। প্রথম কারণ স্বাতীর দুরন্তপনা, দ্বিতীয় কারণ স্বাতী জন্মাবার পর থেকেই নাকি তাঁর চাকরির উন্নতি শুরু হয়। সেই স্বাতীই যখন বিগড়েছে, তখন মেসোর মেজাজ খিচড়োবে না কেন। খিঁচড়োনো মেজাজ নিয়ে মাসীর মন্তব্যটাকে শুনলেন তিনি। শুনে ঘোর রবে একটা গর্জন ছাড়লেন—"হুম্!"

হুম্ শুনে ঘাবড়ালেন না মাসী, আরও রুখে উঠলেন। ছোট ছোট চক্ষু দু'টিকে আরও ছোট করে বললেন—"হুম্ মানে! হুম্

বলে উড়িয়ে দিচ্ছ যে বড় ? হয় একটা ব্যবস্থা কর মেয়ের, নয়তো আমি ওই মেয়ে ছেড়ে এক পা নড়ব না বলে দিচ্ছি। ওই অবস্থায় মেয়েকে এখানে ফেলে রেখে তোমার সঙ্গে চাকরি করতে ছুটব নাকি ? এখনও দু'মাসের ছুটি হাতে আছে, এর মধ্যে একটা বিহিত কর। নয়তো ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

মেসো এবার একটি খুবই ক্ষীণ-গোছের হুম্ ত্যাগ করলেন। করে আড়মোড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন—"তাহলে একখানা ধুতি চেয়ে আন তোমার দিদির কাছ থেকে। ধুতি আর একখানা মটকা চাদর নিয়ে এস। আদিশূরের জামা আমার গায়ে হবে না। শার্ট তার ওপর মট্‌কা চাদর, ওতেই চলে যাবে। যাও, নিয়ে এস।"

মাসী মিউমিউ করে বললেন—"ধুতি চাদর! ধুতি চাদর আবার হবে কি!"

মেসো বললেন—"পরে বেরোব। যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোট প্যাণ্ট চলবে না। আমার তো আবার ধুতি চাদর নেই।"

মাসী উঠলেন, চললেন ধুতি চাদর আনতে দিদির কাছে। বলতে বলতে গেলেন—"ধুতি আটকাবে কেমন করে ওই পেটের ওপর ? রাস্তার মাঝখানে কাপড় খুলে গিয়ে আবার না একটা কেলেঙ্কারি বাধে।"

মেসো তখন স্বাতীকে ডেকে সোজা হুকুম দিলেন—"তৈরি হয়ে নে, তিন মিনিটের মধ্যে। আমি আর তুই, আমরা দু'জনে বেরোব এখুনই। স্রেফ আমরা দু'জনে, ব্যাস্—আর কেউ নয়।"

স্বাতী মুখ তুললে। কোথায় যেতে হবে, জানবার জন্যে হাঁ করলে। কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হবার অবকাশ পেল না। হাঁকার মেরে উঠলেন মেসো—"চুপ, হাঁ করবি না। স্রেফ তিনটি মিনিট, মনে থাকে যেন। যা—"

অতঃপর আর বলবার কিছু রইলও না স্বাতীর। মিনিট-তিনেকের মধ্যেই সে তৈরি হয়ে এল। তৈরি হওয়া মানে, একখানা সাদা ধুতি

ছেড়ে আর-একখানা ওই জাতের কাপড় পরা। ব্যাস্—আর-কিছু নয়।

মাসী যেন কি বলতে গেলেন ওর সাজপোশাক দেখে। মেসো আর একটি হুংকার ছাড়লেন—"হুম্, যাত্রার সময় বাগড়া দিয়ো না বলে দিচ্ছি। শুভ কর্মে চলেছি, দুর্গা শ্রীহরি শ্রীদুর্গা শ্রীহরি—"। শার্টের ওপর চাদর-জড়ানো মেসো জোড়-হাত কপালে ঠেকিয়ে স্বাতীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

প্রথমে ট্রাম, তারপর বাস, সর্বশেষে ট্রেন। তিনবার তিনপ্রস্থ যানবাহন বদলে স্বাতীকে নিয়ে যেখানে উপস্থিত হলেন মেসো, সত্যই সেখানে ট্যাক্সি যায় না। ট্রেন থেকে নেমেই আগে সাবধান হলেন মেসো। স্টেশনের বাবুটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"ফেরবার শেষ গাড়ি কখন মশাই?"

ফিরতি প্রশ্ন হল—"কোথায়?"

মেসো বললেন—"এই যেখান থেকে আমরা এলাম।"

বাবুটি তখন পয়সা গোনা স্থগিত রেখে মিটমিট করে তাকালেন ছোট্ট জানলাটির ভেতর দিয়ে। তারপর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—রেলওয়ে-মার্কা জবাব দিলেন—"শেষ ডাউন ট্রেন আটটা পঁয়ত্রিশ।"

মেসো বললেন—"আর পঁয়ত্রিশ মিনিট যোগ দিতে হবে ওর সঙ্গে। তার মানে, ন'টার পরে। চল্ স্বাতী, এবার হেঁটে পার হতে হবে আধ-ক্রোশ একখানা মাঠ। চল্ পা চালিয়ে।" বলে ধুতি-খানাকে গোটাতে গোটাতে হাঁটু পর্যন্ত তুলে কোমরে গুঁজলেন।

পা চালিয়ে মেসো নেমে গেলেন মাঠে। যতদূর সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে থাকবার চেষ্টা করল স্বাতী। অসম্ভব ব্যাপার! অত বড় দেহটাকে অমন ভয়ানক বেগে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটা কি করে সম্ভব হচ্ছে, তা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল স্বাতী। শেষে যখন বুঝল, কোনও রকমেই মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে সে তাল রাখতে পারবে না, তখন গল্প ফাঁদবার চেষ্টা করল। নেহাত ভালমানুষের মত বললে পেছন থেকে

—"আচ্ছা মেসোমশাই, স্টেশনের বাবুটি বললেন, আটটা পঁয়ত্রিশ। আপনি তার সঙ্গে পঁয়ত্রিশ মিনিট যোগ দিলেন কেন?"

মেসো থেমে গেলেন। স্বাতীর দিকে ফিরে বললেন—"কেন! পঁয়ত্রিশ কি কম বললাম নাকি! তোর কি ধারণা, আধ ঘণ্টারও বেশী লেট করবে?"

স্বাতী বুঝল ব্যাপারটা। হেসে উঠল সে, ঠিক আগে যেমন কথায় কথায় হাসত, তেমনি ভাবে হেসে উঠল। বললে—"আপনি ধরে নিয়েছেন, লেট করবেই। কিন্তু লেট না করে যদি এসে পড়ে ঠিক সময়ে গাড়িটা, তখন কি হবে? আটটা পঁয়ত্রিশের আগেই আমরা স্টেশনে আসব কিন্তু।"

মেসো বললেন—"তার মানে হল, তুই গাড়ি ফেল করতে চাস না। তার মানে, জীবনে তুই চমকানো ব্যাপারটা পছন্দ করিস না। তার মানে হল, তুই একটি জ্যান্ত জবড়জং, একটি স্থাবর সম্পত্তি বিশেষ। তোর মধ্যে একটি আস্ত গিন্নি বিরাজ করছেন, একটি নথ-পরা পায়ে-আলতা-মাখা একমুখ পান জর্দা মুখে-ঠাসা আধ হাত চওড়া জরিপেড়ে শাড়ি-পরা নাতি-নাতনীওয়ালী গিন্নি, ট্রেন ফেল করবার ভয়ে যিনি রাত দশটার ট্রেন ধরবার জন্যে সকাল সাতটা থেকে বাড়িসুদ্ধ মানুষকে তাড়া দিতে দিতে পাগল করে ছাড়েন। ফুঃ—"

ফুঁ দিয়ে স্বাতীকে উড়িয়ে দিলেন মেসো। দিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরলেন ওধারে, ধপাধপ শব্দে চলা শুরু করে দিলেন। স্বাতী আবার পিছিয়ে পড়তে লাগল।

পিছিয়ে পড়ছিল স্বাতী চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে। সবেমাত্র বর্ষাটা গেছে, দু'পাশের মাঠে থৈ-থৈ করছে জল। জলের ওপরে সবুজ রঙের ঢেউ খেলছে। হাত দু'আড়াই চওড়া কাঁচা পথটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে সবুজ-সাগরের মাঝখান দিয়ে। স্বাতী দেখছিল, পৃথিবীটা কত বড়! কত বড় আকাশ পৃথিবীটার! বাতাসটা

কত স্বাধীন! সবচেয়ে ভাল লাগছিল তার লেজ-লম্বা ছোট ছোট পাখিগুলোকে। কি পাজী, কি চটপটে ওরা! ফুড়ুত করে উঠছে, সুরুত করে নামছে ধানেব মাথার ওপর, পরমুহূর্তেই এক ডিগবাজি খেয়ে আবার ফুড়ুত! চিক্ চিক্ শিক্ শু নানারকম আওয়াজ তুলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। পাখিগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতেই বেশী পিছিয়ে পড়ছিল স্বাতী। মেসো হাত দশ-পনেরো আগে এগিয়ে চলছিলেন। হঠাৎ বিকট এক চিৎকার করে উঠলেন—“বাপ”। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন রাস্তার ওপর। বসে অসহ্য যন্ত্রণায় অন্তিম কাতরানি কাতরাতে শুরু করলেন।

“বাপ” শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর পা দু'খানা মাটির ভেতর বসে গেল। দম আটকে তাকিয়ে রইল সে মেসোর দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরেই ছুটল। ছুটে গিয়ে পেছন থেকে মেসোর দু'কাঁধ চেপে ধরল। আতঙ্কে তার বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে তখন। কোনও রকমে চিৎকার করে উঠল—“কি হল! মেসোমশাই, ও মেসোমশাই—”

মেসোমশায়ের মুখে রা নেই। মাথা নুইয়ে বসে আছেন মাটির ওপর। দু'হাতে খামচে ধরেছেন নিজের বাঁ পায়ের গোছের কাছটা। মাঝে মাঝে একবার করে ভয়ানক একটা ঝাঁকানি উঠছে মেসোর শরীরের ভেতর থেকে। ঝাঁকানির চোটে মাথাটা একবার একটু তুলেই আবার নুইয়ে ফেলছেন। ঘাড়টাই যেন হঠাৎ ভেঙে গেছে তাঁর। মাথাটা ঘাড়ের ওপব ঠিক রাখতে পারছেন না।

মেসোর সামনে এসে স্বাতীও বসে পড়ল মাটির ওপর। আকুল-কণ্ঠে বার বার ডাকতে লাগল—“মেসোমশাই, ও মেসোমশাই!”

বারকয়েক ডাকাডাকির পর মেসো টের পেলেন। মুখ তুললেন না, চোখও খুললেন না। অসহ্য যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন। কাতরানিটা যেন আগের চেয়ে আরও ক্ষীণ বলে মনে হল স্বাতীর।

এবার সে সত্যিই পাগলের মত হয়ে উঠল। বাঁ পায়ের গোছের কাছে যেখানটা দু'হাতে খামচে ধরেছিলেন মেসো, সেখানটায় কি হয়েছে দেখবার জন্যে প্রাণপণে টানাটানি করতে লাগল মেসোর আঙুল ধরে। কোনও রকমে যদি হাত দু'খানি খসাতে পারে, তাহলে দেখবে কি হয়েছে ওখানে। হাতখানা খসানো কি চাট্টিখানি কথা! দু'হাত দিয়ে মরণ-কামড় কামড়ে ধরেছেন মেসো নিজের পায়ের গোছটা। স্পষ্ট দেখতে পেলে স্বাতী, অনেকগুলো শির নীল হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে হাঁটুর কাছে। টিপুনির চোটে রক্ত চলাচল বন্ধই করে ফেলেছেন মেসোমশাই, করে দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করছেন।

ভেঙে পড়ল স্বাতী। আর কত সহ্য করতে পারে মানুষে! জন-প্রাণীহীন নির্জন মাঠের মাঝখানে এ কি বিপদ! কাকে ডাকবে সে! স্টেশন থেকেও প্রায় মিনিট-পনেরোর পথ পার হয়ে এসেছে। সামনে কোনও গ্রাম আছে কি না, কতদূরে গ্রাম, তাও সে জানে না। জানলেও মেসোকে ফেলে সে লোক ডাকতে যাবে কেমন করে! এধারে সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। কোথায় যেন একপাল শেয়াল বেশ অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে থেমে গেল। এখন করবে কি স্বাতী! কি করবে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সে সত্যিই আওয়াজ করে কেঁদে উঠল। খুব এমন কিছু বড় আওয়াজ নয়। অতি অসহায় অতি করুণ কান্নার নিজস্ব একটা চাপা আওয়াজ আছে। আওয়াজটা বেশ টের পাওয়া যায়। স্বাতী সেই টের পাওয়ার মত আওয়াজ করেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অবশেষে সে আওয়াজ বোধ হয় মেসোর কানেও গেল। যাওয়ার ফলে যেন তাঁর হুঁশ ফিরে এল। বহু কষ্টে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন —"কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি। কেঁদে আর করবি কি তুই বল্? তার চেয়ে তোর কোলে আমার মাথাটা নিয়ে বোস। তোর কোলে মাথা দিয়েই শেষ নিশ্বাসটা ফেলি।"

কাঁদতে কাঁদতেই আবার স্বাতী চিৎকার করে উঠল—"কি হল মেসোমশাই? কি হল, আগে বলুন না?"

অন্তিম চেষ্টা করে মেসো বললেন—"খেয়েছে মা খেয়েছে। কপালে সর্পাঘাত থাকলে কে খণ্ডাতে পারে।"

ব্যাস্, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল স্বাতী। একটানে নিজের শাড়ির আঁচল থেকে একফালা ছিঁড়ে নিয়ে ঝাঁ করে পাকিয়ে ফেললে। ফেলে সেটাকে দু'ভাগ করে মেসোর বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর আর হাঁটুর নীচে কষকষে করে দু'টো বাঁধন দিলে। তারপর আর কি করবে! ইতিমধ্যে মেসো শুয়ে পড়েছেন সেই পথের ওপরেই। তখন আর করে কি স্বাতী, মেসোর মাথার কাছে বসে মাথাটা বহু কষ্টে কোলের ওপর তুলে নিলে।

মেসোর সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে তখন। রক্তবর্ণ চোখ দু'টো মেলে স্বাতীর মুখের দিকে তাকালেন তিনি। মোটা মোটা ঠোঁট দু'খানাকে জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নিয়ে বহু কষ্টে বলতে লাগলেন—"পারলাম না মা, তোর মাসীর অনুরোধটা রাখতে পারলাম না। কবে তোর বিয়ে হবে, কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাই গোনাবার জন্যে এসেছিলাম এখানে। তোর বিয়ের জন্যে পাগল করে তুলেছিল তোর মাসী। আর পনেরো মিনিট হাঁটলেই সর্বজ্ঞ-পাড়ায় পৌঁছতাম। সেখানে সর্বজ্ঞঠাকুর এখনও হয়তো বেঁচে আছেন। তিনি ঠিক বলে দিতেন কবে কার সঙ্গে তোর বিয়েটা হবে। তিনিই তো গুনে বলেছিলেন আমায় তোর মাসীর কথা। তাই তো বিয়েটা হল আমার। আর কি মিলই হল, একেবারে রাজযোটক যাকে বলে। তোরও হত মা, ঠিক হত। সর্বজ্ঞ-ঠাকুরের কথা মিথ্যে হয় না। কিন্তু হল না, সবই আমার কপাল। আমার কপাল, তোর মাসীরও কপাল। বলিস গিয়ে তাকে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি।"

মেসো থেমে গেলেন। ঘনঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল তাঁর;

ঘনঘন জিভ বার করে ঠোঁট চাটতে লাগলেন। বুক ফেটে যাবার উপক্রম হল স্বাতীর। মেসোর কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে বলল—"মেসোমশাই, বিয়ে আমি করব না। কখনও বিয়ে করব না। আমার বিয়ের জন্যে গোনাতে আসছেন, আগে বললেন না কেন! কিছুতে আপনাকে আসতে দিতাম না। আমার জন্যে আজ আপনার—" আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল স্বাতীর গলা। আর সে কিছুই বলতে পারলে না। মেসোর বুকের ওপর মাথাটা রেখে হু-হু করে কাঁদতে লাগল।

মৃত্যুপথযাত্রী মেসো একখানা হাত তুলে তার মাথার ওপর রাখলেন। আস্তে আস্তে হাত বুলতে লাগলেন মাথায়। তখন তাঁর গলার আওয়াজ অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে। মরণকালে মানুষের যন্ত্রণাবোধটা নাকি থাকে না, সেই অবস্থায় তখন পৌঁছেছেন তিনি। ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন—"বল্ মা বল্! ওপারে পৌঁছোবার আর আমার দেরি নেই। এখনও শোনার শক্তিটুকু আছে। কানে কানে বল্, হল কি তোর? কেন তুই এভাবে আছিস? কেন বিয়ে করতে চাচ্ছিস না? কে তোকে ঠকিয়েছে? বল্, আমার অন্তিম অনুরোধটা রাখ্। আমায় বলাও যা, ওই আকাশকে বলাও তাই। আমি তো আর কাউকে বলতে যাব না। তোর বুকের ব্যথাটা নিজের বুকে নিয়ে ওই আকাশে চলে যাব।"

কি আর তখন করে স্বাতী। বহু কষ্টে বহুক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেই রাত্রের ঘটনা সবটুকু আগাগোড়া শোনাল তার মৃত্যুপথযাত্রী মেসোকে। সমস্ত শুনিয়ে শেষে বলল—"এমনই মানুষ তিনি মেসোমশাই, দু'বছর সামনের চেয়ারে বসে পড়িয়ে গেলেন, তারপর আর আমায় চিনতেই পারলেন না! নিজে সেধে পরিচয় দিলাম, কথা দিলেন একটিবার এসে চাদরখানা নিয়ে যাবেন, তাও গেলেন না। তিনি আমায় ভাবলেন কি মেসোমশাই? নিশ্চয়ই ভাবলেন যে আমি একটা যা-তা মেয়ে। রাস্তায় রাস্তায়

বদমাইশি করে বেড়াই। আমার মত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় রাখতেও তাঁর ঘেন্না হল।" আর পারলে না স্বাতী বলতে, মেসোর বুকের ওপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

মেসো তখন আবার নড়ে-চড়ে শুলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন —"তাহলে এবার খোল্ মা, পায়ের বাঁধন তুটো খুলে দে। আর কেন, বাঁধন নিয়ে আর কেন ওপারে যাই।"

চোখের জল মুছতে মুছতে দাঁত দিয়ে গিঁটগুলো খুললে স্বাতী। খুলে মেসোকে বন্ধনমুক্ত করলে।

অনেকক্ষণ মেসো চুপ করে শুয়ে রইলেন চোখ বুজে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে তু'হাত দিয়ে হাঁটুটা রগড়াতে লাগলেন। স্বাতীকে বললেন—"কামড়েছিল বোধ হয় একটা বিছেয়—জানলি রে! নেশাটা যেন বেশ কেটে আসছে। এ-যাত্রা বোধ হয় রক্ষেই পেলাম।"

রক্ষেই পেলেন স্বাতীর মেসোমশাই। রক্ষে পেয়ে স্বাতীর কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে আবার ফিরে এলেন স্টেশনে। আটটা পঁয়ত্রিশের গাড়ির আগের গাড়িতে মাসীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—"নাও, এবার তোমাদের মেয়েকে ফিরিয়ে নাও। উঃ, আজ বেটীর জন্যে প্রাণটাই যেতে বসেছিল!"

পিপিও রক্ষা পেল।

দশতলার ছাতের ওপর থেকে রাজপথের ওপর পৌঁছতে বিন্দু-মাত্র কষ্ট করতে হল না তার। পালাবার জন্যে হাজার রকম ফন্দি-ফিকির সে আঁটছিল মনে মনে। কোনটাই কোনও কাজে লাগল না। আচম্বিত সে দেখল, ধরণীর ধূলার ওপর তার পা তু'খানা আটকে রয়েছে। ধারে-কাছে কোথাও বন্ধন বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই। যে বন্ধনকে ফাঁকি দেবার জন্যে প্রাণের মধ্যে অসহ্য অস্থিরতা ভোগ করছিল সে, সেই বন্ধনই তাকে ফাঁকি দিয়ে উধাও

হয়েছে। ভয়ানক মুষড়ে পড়ল পিপি, অতি নিষ্ঠুরা মুক্তি মর্মে মর্মে তাকে বুঝিয়ে দিলে নৈর্ব্যক্তিক ভদ্রতা দিয়ে বানানো বর্মের মধ্যে ঢুকে থাকলেই মানুষ দেবতা হয়ে যায় না। দেবতার দেবত্ব যতই উৎকৃষ্ট লোভনীয় সামগ্রী হোক, সেইটুকু সম্বল করে মানুষের পক্ষে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

পিপি পথে দাঁড়াল। পথে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, অত করে জল ঢেলে পঙ্কজের গা থেকে পাঁকের গন্ধটুকু দূর করার চেষ্টাটা না করলেই যেন ভাল হত। যে নেশা সে ছোটাতে চেয়েছিল জল ঢেলে ঢেলে, সেই নেশার বিষে নিজেই যে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এখন তার মাথায় জল ঢেলে কে তার নেশা ঘোচাবে! নেশাগ্রস্ত পিপি টলতে টলতে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে গাছতলায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে অনেক উঁচুতে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক উঁচু দশতলার ছাতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে।

হ্যাঁ, স্বপ্ন। স্বপ্নের মত পরপর ঘটে গেল ব্যাপারগুলো।

বালতির পর বালতি জল ঢালতে ঢালতে হঠাৎ পিপি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দেখতে পেল সে, বালতির তলায় মাথা পেতে রয়েছে যে তনুখানি, তার মধ্যে যেন প্রাণ নেই। প্রাণ থাকলে কি কেউ অতক্ষণ ধরে মুখ টিপে মাথার ওপর জল ঢালা সহ্য করতে পারে! লাফিয়ে নেমে পড়েছিল পিপি ট্যাঙ্কের ওপর থেকে। নেমে নিচু হয়ে লক্ষ্য করে দেখবার চেষ্টা করেছিল মুখখানি। জলের তোড়ে মুখের ওপর এসে পড়েছিল সব চুলগুলো। মুখখানি ঢেকে গিয়েছিল ভিজে চুলে। কিছুই দেখতে পায় নি পিপি, শুধু বুঝতে পেরেছিল—কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে ক্ষীণ একটু আওয়াজও যেন উঠছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করে নি পিপি, শুকনো একটা-কিছু আনবার জন্যে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকেছিল।

নিয়ে আসার মত কিছুই সে দেখতে পেল না ঘরে। তখন তার

নজর পড়ল, দু'পাশের দেওয়ালে-সাঁটা আয়না-লাগানো বড় বড় দুটো আলমারির দিকে। হাতল ধরে টান দিতেই একটা আলমারি খুলে গেল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল পিপির। থাকে থাকে সাজানো রয়েছে রাশি রাশি জামা-কাপড়, সবই মেয়েলী ব্যাপার। যেখানে কেউ থাকে না, এক-আধটা রাত স্ফূর্তি লোটবার জন্যে পাঁচজনে জোটে, স্ফূর্তি-লোটা শেষ করে আবার চলে যায়, সেখানে অত-সব দামী দামী নারীজাতীয় সাজপোশাক জমা রয়েছে কেন! ভুলেই গেল পিপি, কি জন্যে এসেছিল ঘরে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আলমারির মধ্যে তাকিয়ে।

অতি ক্ষীণ অতি করুণ একটি আওয়াজ হল পেছনে—"দয়া করে একখানা কাপড় এধারে ফেলে দিন।"

পিপি ঘুরে দাঁড়াল। দরজার বাইরে আবির্ভূতা হয়েছে জলদেবী। সর্বাঙ্গ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এক হাত দিয়ে ধরেছে দরজার পাশের কাঠ। বোধ হয় পড়ে যাবার ভয়েই কাঠখানা ধরে আছে ওভাবে। অতি সূক্ষ্ম জল-সপসপে কাপড়খানা দিয়ে যতদূর সম্ভব গা মাথা পেঁচিয়েছে। তবু যেন কিছুই ঢাকা পড়ে নি। নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল পিপি। করেছে কি সে! জল ঢেলে ঢেলে রঙ রাঙতার খোলসটাকে ধুয়ে দিয়ে আসল হিরণ্ময়-প্রতিমাখানি বার করে ফেলেছে! চোখ-জ্বালা-করা আগুনের আঁচ ঠিকরে পুড়ছিল যে বস্তু থেকে, সে বস্তুর ভেতর থেকে এ কি অপার্থিব স্নিগ্ধ দ্যুতি ফুটে উঠেছে! হুঁশ হারিয়ে ফেলল পিপি, নেশা লেগে গেল তার, স্থান কাল কর্তব্য সব ভুলে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল।

অতি কষ্টে ভিক্ষা চাওয়ার সুরে আবার বললে—"দিন একখানা কাপড় দয়া করে ফেলে। এ অবস্থায় ঘরে ঢুকলে যে সব ভিজে যাবে!"

লিকলিকে বেত সপাং করে পড়ল যেন পিপির মুখের ওপর। হাত বাড়িয়ে একখানা কাপড় টেনে নিল সে, নিয়ে একছুটে বেরিয়ে

গেল ঘর ছেড়ে। দরজা পার হবার সময় কাপড়খানা গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে গেল। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাল না, সোজা ছাতের শেষপ্রান্তে গিয়ে ময়লা জলের ট্যাঙ্কের ওপাশে নিজেকে লুকিয়ে ফেললে।

লুকিয়ে থাকতে গিয়ে সেই প্রথম টের পেলে পিপি, এই দুনিয়ায় লুকিয়ে থাকাটা সবচেয়ে অসম্ভব ব্যাপার। লুকিয়ে থাকার আশায় দশতলার ছাতে উঠেছে সে। ছাতে না উঠে যদি দশতলা মাটির নিচেও গিয়ে আশ্রয় নিত, তবু তার লুকিয়ে থাকাটা সম্ভব হত না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ প্রাণীর সব ক'জোড়া চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারলেও, দুটি চক্ষুকে সে কিছুতে ফাঁকি দিতে পারত না। সেই চক্ষু দুটি তার নিজের বুকের মধ্যে মিটমিট করে জ্বলতে জ্বলতে বলত—লুকবে! লুকিয়ে তুমি পরিত্রাণ পেতে চাও আমার হাত থেকে? আচ্ছা, লুকও তো দেখি কোথায় লুকবে বাছাধন! নিজের কপালের ওপর যে চক্ষু-জোড়া আছে, সে দুটো কষে টিপে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে বসে রইল পিপি। বসে বুকের ভেতরের চক্ষু দুটোর দিকে সভয়ে তাকিয়ে রইল। সেই চক্ষু দুটি দিয়ে নিজের পানে তাকাতে নিজেকে ভয়ানক বেশী উলঙ্গ বলে মনে হল। মনে হল, এতদিনের এত চেষ্টায় মনের মত করে যে পুনর্বসু পালিতটিকে সে গড়ে তুলেছে, সেই পুনর্বসুর অঙ্গে এতটুকু আবরণ নেই। লজ্জা শালীনতা সম্ভ্রমবোধ বিন্দুমাত্র নেই তার। হ্যাংলার বেহদ্দ এক ধেড়ে-খোকা উদম অবস্থায় জিভ বার করে ধেই-ধেই করে নাচছে! মরমে [illegible] গেল পিপি সেই নাচ দেখে, দুই হাঁটু দু'হাতে জড়িয়ে তার মধ্যে মুখটা গুঁজে দিলে। তবু কি রেহাই আছে! রেহাই পাওয়ার বদলে আরও স্পষ্ট ভাবে দেখতে লাগল নিজেকে। তখন আবার মনে পড়ল পালাবার কথা। যে-কোনও উপায়ে হোক, দশতলার ছাত থেকে নেমে মিশে যেতে হবে রাস্তার মানুষের ভিড়ে। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পারলে

তবেই মিলবে নিষ্কৃতি। নয়তো কোনও মতেই বুকের ভেতরের চোখ দু'টোর কবল থেকে পরিত্রাণ নেই।

পালাবার উপায় চিন্তা করতে শুরু করল পিপি।

এমন সময় সাক্ষাৎ উপায় তার সামনে এসে উপস্থিত হল।

খট্‌খট্‌ আওয়াজ উঠল মেয়েদের গোড়ালি-উঁচু জুতোর। আওয়াজটা এসে থেমে গেল ঠিক পিপির সামনে। কয়েক মুহূর্ত পরে নিরতিশয় নিয়ন্ত্রিতকণ্ঠে আদেশ করা হল—"এখানে বসে আছেন কেন এভাবে? উঠে আসুন, আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।"

পিপি মুখ তুলল না, চোখও চাইল না, যেমনভাবে ছিল তেমনি রইল।

বেশ কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। তারপর একটু তপ্ত হয়ে উঠল আদেশ দেওয়ার সুর।

"কি আশ্চর্য! আমি কি আপনাকে খোশামুদি করে খাওয়াব নাকি! সে সময়ই বা কই আমার এখন। ঠিক সময় যেতে না পারলে, চাকরি থাকবে কেন?"

চাকরি! মুখ তুলে তাকাতে বাধ্য হল পিপি। তাকিয়ে যাকে দেখতে পেল, তাকে সে জীবনে কখনও কোথাও দেখেছে কি না, মনেই করতে পারল না।

হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুল সাদা-ফ্রক-পরা, দু'কাঁধে দুই কালো ব্যাজ লাগানো, মাথায় অদ্ভুত এক কালো টুপি সাঁটা এক মেমসাহেব সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জুতো মোজা কোমরবন্ধ সমস্ত মিলে নিখুঁত একটি হাওয়াই-জাহাজের অতিথি-সেবিকার চাকরির পোশাক পরে তৈরী, এখুনই কাজে বেরোতে হবে।

আর-এক তাড়া লাগালেন হাওয়াইওয়ালী—"উঠুন, উঠুন। এত ভয় করেন আমাকে আপনি! আমার ভয়ে এখানে এসে লুকিয়ে বসে আছেন! আচ্ছা এই তো বেরিয়ে চললাম আমি। এবার নিশ্চিন্ত হলেন তো? নিশ্চিন্ত হয়ে এবার স্নান খাওয়া-দাওয়া সারুন।"

উঠে দাঁড়াল পিপি, কতকটা আত্মগতভাবে বলে উঠল—"আপনি চাকরিও করেন! তবে যে এঁরা বলে গেলেন—"

"কি বলে গেলেন? বলে গেলেন বুঝি, আমি একটা মাতাল বেশ্যা। আমার ঘরে যখন-তখন যাকে ইচ্ছে তাকে লুকিয়ে রাখা যায়।" যথেষ্ট ঝাঁজ ফুটে উঠল গলায়।

খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল পিপি, বললে—"আপনার ঘরে! তার মানে, তাহলে আমি—আমি আপনার ঘরে বাস করছি!"

এয়ার-হোসটেস্ হিল-তোলা গোড়ালি দিয়ে ছাতের ওপর আঘাত ক'রে বললেন—"ন্যাকা নাকি আপনি? ঘরখানা আমার নয়তো কি আপনার? কাল একটু বেশী নেশা করে ফেলেছিলাম। নেশার ঘোরে কি যে করেছি না করেছি মনে করতে পারছি না। হুঁশ হতে তো বুঝতে পারলাম, আপনি আমার মাথায় মরিয়া হয়ে জল ঢালছেন। আচ্ছা, বলুন দেখি সব গুছিয়ে, নার্ভাস না হয়ে বলুন তো আগাগোড়া ব্যাপারটা। কোথা থেকে এসেছেন আপনি? কেন এসেছেন? এভাবে লুকিয়েই বা আছেন কেন? কে আপনাকে এনে ঢোকালে এখানে? বলুন সব একে একে। দেরি তো হয়েছেই, এখন গেলে হয়ত মিস্ করব প্লেন। এডিথ বোধ হয় ম্যানেজ করে নেবে। যাকগে, যা হবার হোকগে, আসুন আমার সঙ্গে। কোনও ভয় নেই আপনার। অন্তত আমাকে একজন বন্ধু হিসেবে ধরতে পারেন। চলুন, খাবেন চলুন। খেতে খেতে আমায় শোনাবেন সমস্ত। তারপর দেখি, কি ব্যবস্থা করা যায় আপনার জন্যে।"

কথাটা শেষ করবার আগেই তিনি পিছন ফিরলেন। চলতে আরম্ভ করলেন ঘরের দিকে। অগত্যা পিপিকেও অনুসরণ করতে হল।

ঘরের মধ্যে পা দেবার আগে পেছন থেকে পিপি বলল—"একটা অনুরোধ করতে পারি আপনাকে?"

মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—"কি?"

দু'হাত জোড় করে পিপি বলল—"অনেক অত্যাচার তো সহ্য করেছেন আমার। আর-একটি অত্যাচার সহ্য করুন। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। আপনি ওই চাকরির পোশাকটা খুলে নিজের কাপড়-জামা পরুন। এ পোশাকে আপনাকে মোটে ভালো দেখাচ্ছে না।"

ভয়ানক ভারীগলায় তিনি বললেন—"ভালোমন্দ যাই দেখাক আমাকে, তাতে আপনার কি ?"

সহজ গলায় পিপি বলল—"অনেক-কিছু লাভ-লোকসান হবে তাতে আমার। কিছুক্ষণ আগে আপনার ওই গালে আমি একটি চড় মেরেছি। চড় মেরে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম ট্যাঙ্কের পাশে। যখন চড় মারি, তখন আপনি এ পোশাকে ছিলেন না। এ পোশাকে থাকলে কি চড়টা মারতে পারতাম ?"

"চড় মেরেছিলেন গালে ? কি সর্বনাশ !" বলতে বলতে তিনি হাত তুলে গালটা ঘষলেন একবার। তারপর হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে হালকা গলায় বললেন—"আবার মারবেন বুঝি চড় ? চড় মারবার অসুবিধে হবে বলে পোশাকটা বদলাতে বলছেন ?"

তৎক্ষণাৎ পিপি জবাব দিল—"ঠিক তাই। যাকে আপনার লোক মনে না করা যায়, তাকে চড় মারা যায় নাকি ? এই পোশাকে থাকলে আপনাকে যেমন চড় মারতেও পারব না, তেমনি আপনার কাছে মন খুলে সব কথা বলতেও পারব না। তাই তো বলছি, ওই খোলসটা ছেড়ে ফেলুন না !"

এয়ার-হোস্‌টেস্‌ আর কথা বাড়াল না। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। মিনিট-তিনেক পরে যখন আবার দরজা খুলল, তখন চোখ জুড়িয়ে গেল পিপির। চওড়া লালপাড় শাড়ি-পরা একটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ঢিপ করে তার পায়ের ওপর এক প্রণাম করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে বলল—"এবার ভেতরে চলুন। আমার ঘরে আপনি অতিথি। কদিন আছেন, তাও জানি না। দিন-পাঁচেক এখানে থাকি নি।

ডিউটি করেছি, আর ডিউটি শেষ হলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হল্লা করে ঘুরে বেড়িয়েছি। যাকগে, যা হবার হয়েছে। আজ অন্তত অতিথির আদরযত্ন করি। আসুন, ভেতরে আসুন।"

এতক্ষণ পরে পিপি হেসে ফেলল। বলল—"তাহলে দেখছি, আবার আপনার চড় খাবার বাসনা হয়েছে। বেশ, চলুন, অনাহূত অতিথি যদি আবার চড়-চাপড় মেরে বসে তখন কিন্তু রাগ করতে পারবেন না। কিন্তু তার আগে জানতে চাই নামটি, নাম না জানলে কি বলে ডাকব ?"

"আমার নাম নন্দা, নন্দা মৈত্র আমি। কিন্তু নন্দার গালে কেউ চড় কষিয়েছে, এ যে অসম্ভব কাণ্ড ! সত্যিই আপনি চড় কষিয়েছেন ? কেন, করেছিলাম কি আমি ?" বলতে বলতে নন্দা ঘরের ভেতর ঢুকল।

পিপিও ঢুকল ঘরে। ঢুকে বলল—"কিচ্ছু না। আমার আর কি করবেন আপনি ! যা করছিলেন তা নিজের সঙ্গেই করছিলেন। অনর্থক ভেঙচাচ্ছিলেন নন্দাকে। সহ্য হল না, চড় কষালাম।"

স্তব্ধ হয়ে গেল নন্দা। বড় ঘরের পেছনের ছোট ঘরখানার মধ্যে আসন পেতে সামনে থালা রাখা হয়েছে। সেই থালাতে পেঁড়া মিঠাই বরফি পুরি আর কিছু মেওয়া মিষ্টি দই। খেতে বসতেই পিপি জিজ্ঞাসা করল—"এই সব হিন্দুস্থানী খাবার খান বুঝি আপনি রোজ ? অন্য-কিছু বুঝি আপনার মুখে ভালো লাগে না ?"

নন্দা তখনও স্তব্ধ হয়ে আছে। এ-ঘর ও-ঘরের মাঝখানের দরজার ওপরেই সে বসে পড়েছে। কেমন যেন ঝিম মেরে গেছে নন্দা। লালপাড় শাড়ির একটা খুঁট থেকে একগাছি লাল সুতো যত্ন করে টেনে বার করছে। শুনতেই পেল না যেন কথাটা ভাল করে। অন্যমনস্ক হয়ে জবাবটি কিন্তু দিল।

"আমার স্বামী যা খেতে দেবেন, তাই তো খাব। স্বামী যে ভরণ-পোষণের কর্তা। তাই তো তাঁর আর-এক নাম ভাতার।"

জবাবটা কানে যেতেই সজোরে একটা বিষম খেল পিপি। মুখে পুরেছিল একখানা বরফি না কি, বার করে থালার পাশে ফেলে বিষমটা সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ব্যস্ত হয়ে উঠল নন্দা। বলল—“দই খান, একটু দই মুখে দিয়ে গিলে ফেলুন। ইস্, আমার স্বামীর কথা কানে যেতেই আপনার বিষম লাগল! তাঁকে দেখলে বোধ হয় আপনি ভিরমি যাবেন!”

বিষমটা সামলে নিল পিপি। মুখচোখ তার লাল হয়ে উঠেছিল দম আটকাবার ফলে। দমটা আর ফেলতে পারল না, বিষম সামলেই বিষম হাসি শুরু করে দিল।

নন্দা বলল—“হয়েছে খাওয়া! আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি আপনাকে নিয়ে। খেতে বসে দুষ্টুমি করছেন কেন? জানেন, এখুনই এক চড় লাগাতে পারি।”

ঝপ্ করে হাসিটা থামিয়ে ফেলল পিপি। থামিয়ে বলল—“পারেন, একশো বার মানছি, তা আপনি পারেন। যাঁর স্বামী তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পুরি মোণ্ডা মিঠাই মেওয়া খাওয়ান, তিনি এক চড় লাগাবেন, এ আর বেশী কথা কি। তা এত ভালো ভালো খাবার খাওয়াতে পারেন যখন তিনি আপনাকে, তখন আপনি আবার চাকরি করেন কোন দুঃখে?”

নিরীহ ভাবে নন্দা বলল—“টাকা জমাচ্ছি যে। বুড়ো বয়েসে তীর্থ-ধর্ম করব কিনা।”

পিপি আর-কিছু না বলে আর-একটা কি মুখে পুরে দিল।

নন্দা তখন আসল কথাটি পাড়ল—“বলুন এবার, এখানে এসে লুকিয়ে আছেন কেন? কে নিয়ে এল আপনাকে এখানে?”

পিপি বলল—“কেন লুকিয়ে আছি তা বলা সম্ভব নয়। কে আনল, তা বলতে পারি। আমার ভগ্নীপতির এক লক্ষ্মীমন্ত মক্কেল আমাকে এখানে এনে তুলে দিয়েছেন। ভদ্রলোককে আপনিও চেনেন। আপনার সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন যে। খুব আমোদ-

আহ্লাদ করে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাকেও নাকি কয়েকদিন লুকিয়ে থাকতে হবে।"

নন্দা একটু চুপ করে থেকে বলল—"নাম জানেন না মক্কেলটির? হরবন্স্ আগারওয়াল বাবু, দেখুন তো নামটা ঠিক হল কি না!"

পিপি বলল—"ঠিক তাই। চমৎকার আন্দাজ করার শক্তি তো আপনার!"

নন্দা বলল—"উনিই আমার স্বামী। উনিই রোজ খাবার পাঠান।"

কি সর্বনাশ!" আঁতকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল পিপি নন্দার দিকে। একগাল পুরি মুখে তুলতে যাচ্ছিল। সেটা হাত থেকে খসে পাতে পড়ে গেল।

নন্দা হাসল। খুবই নিঃশব্দে হাসল একটু নন্দা। হেসে বলল—"কি! পছন্দ হল না বুঝি আমার স্বামীকে? কি করব বলুন, ভগবান যাকে যা দেন। স্বামী যেমনই হোক, তবু স্বামী তো। জানেন বোধ হয়, স্বামী-নিন্দে কানে শোনাও মহাপাপ।"

পিপি তৎক্ষণাৎ সায় দিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব জানি। হিন্দুর ছেলে, ওটা আর জানব না? আমি তো আপনার স্বামীর নিন্দে করছি না। রামশ্চন্দ্রঃ, অমন স্পর্ধাই বা কেন হতে যাবে আমার! আমি বরং তারিফই করছি আপনার স্বামীর মারাত্মক আধুনিক মনোভাবের। বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদ অনেকেই খায়, কিন্তু স্ত্রীকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ইয়ার-বন্ধুদের সামনে—"

নন্দা এবার শব্দ করে হেসে উঠল। বললে—"খুব হয়েছে, থামুন এখন। যার খাচ্ছেন, খাবার হাতে নিয়ে মুখে তুলতে তুলতে তারই নিন্দে করছেন। অতটা ধর্মে সইবে না। নিন, এখন স্পষ্ট করে বলুন, কেন ফেরার হয়ে আছেন?"

পিপি বলল—"ওই যে বললুম, কারণ আছে, বলতে পারব না।"

চোখ পাকিয়ে নন্দা জিজ্ঞাসা করল—"বারণটা কার, শুনি?

কে সে? ইস্, না বললেন তো বড় বয়েই গেল। আমি যেন কিছু জানতে পারি নি। মনে করছেন বুঝি, কিছু শুনি নি আমি? একটি ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করে ফেরার হয়ে আছেন। কথাটা এতই পবিত্র যে, বলতে বারণ আছে—ইস্!" ভেঙচে উঠল নন্দা।

"কি বললেন!" দম বন্ধ হবার উপক্রম হল পিপির। মুখ-চোখে একবিন্দু রক্ত রইল না তার। আর-একটিবার কোনওক্রমে উচ্চারণ করলে—"কি বললেন!"

প্রাণান্ত চেষ্টায় মোক্ষম একটি মোচড় দিল নন্দা। ঘৃণার চোটে তার ঠোঁট কুঁচকে উঠল। জঘন্যভাবে পালটে গেল গলার আওয়াজ। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলতে লাগল—"আহা-হা, আমার সাধু পুরুষ রে! আমি মদ খাই, আমার স্বামী আমাকে মদ খাইয়ে ইয়ারদের সামনে আমাকে নিয়ে হল্লা করেন, এতে ওঁর কত লজ্জা! আর উনি যে ঘুঘু সেজে ভদ্রলোকের মেয়েদের সর্বনাশ করে বেড়ান, সেটা যেন লোকে জানে না। লজ্জা করে না, ভদ্রলোকের মেয়েটাকে নরকে ডুবিয়ে এভাবে লুকিয়ে থাকতে? যান না, মানুষ হন তো আদালতে দাঁড়িয়ে নিজের দোষ কবুল করে শাস্তি নিন না গিয়ে। কিংবা সেই মেয়েটাকে বিয়ে করে তার বাপ-মাকে বাঁচান। দেখি কেমন সাধু পুরুষ—"

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল পিপি আসনের ওপর। তারপর চিৎকার! চিৎকার করে উঠল—"মুখ সাম্‌লে কথা বলো বলছি নন্দা। জান না তুমি, কাকে কি বলছ জান না। ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করে বেড়াই আমি—না? বলব, আমি কি করে এসেছি? শুনবে? তাহলে শোন! দু'দুটো নরপশু একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে অন্ধকার গলিতে ধরে তাকে সাবাড় করার চেষ্টা করছিল। তাদের দুটোকেই সাবড়ে এসেছি আমি। জান তারা কে? তারা এই দেশের সরকারের পোষা প্রহরী। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার

কথায় ? আচ্ছা যাও, এখনই দেখা করে জানগে সেই মেয়ের কাছ থেকে। মেয়েটার নাম স্বাতী সোম। তার বাপের নাম আদিশূর সোম। একশো সাতান্ন নম্বর দেশজ্যোতি ভাতুড়ীমশাই রোড হল তাদের ঠিকানা। যাও, জেনে এসগে।"

নন্দাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। পিপির কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের কাছে বসে পড়ে পা ছ'খানা চেপে ধরল। অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ল তার গলা—"মাপ কর দাদা, তোমার হতভাগী বোনটাকে ক্ষমা কর। যা বলেছি সব ইচ্ছে করে বানিয়ে বানিয়ে বলেছি। ওরকম ভাবে আঘাত না দিলে যে সত্যিকথাটা তোমার মুখ দিয়ে বার করতে পারতাম না।"

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিপি। এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হল, কি করে ফেললে সে। বলা কথা কি আর ফিরিয়ে নেবার উপায় আছে!

তারপর আবার বসতে হল তাকে থালার সামনে। আবার ছ'গাল মুখে দিতে হল, নয়তো হতভাগী বোনের হাত থেকে নিস্তার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ভয়ংকরী রজনীর সমস্ত ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বললে পিপি, ততক্ষণ নন্দা কিছুতেই ছাড়ল না। সমস্ত বলা-কওয়ার পরে উঠে গেল সে। আলমারি খুলে কাপড়-চোপড় নামিয়ে পেছন থেকে টেলিফোনের সরঞ্জাম বার করলে। চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেলে একটা নম্বর।

"হ্যালো, আমি নন্দা বলছি। বাবুজী কোথা ? দিন একবার।"

এক মিনিট পরে—"হ্যালো, হ্যাঁ আমি। যিনি এখানে আছেন, তাঁর ব্যাপারটা কি ঢুকল না ? ঢুকে গেছে ? কি করে ঢুকল ?"

টেলিফোনের ওপার থেকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনেক কথা বলা হল। হ্যাঁ হুঁ আচ্ছা ইত্যাদি মাঝে মাঝে বললে নন্দা। তারপর ফোনটিকে আবার গুছিয়ে তুলে রাখলে আলমারির মধ্যে।

সবই শুনছিল এতক্ষণ পিপি চুপ করে। এইবার জিজ্ঞাসা করলে—"কি কথা হল আমার সম্বন্ধে ?"

নন্দা বলল—"লাইন ক্লিয়ার। সে হতভাগা ছুটো মরে নি। জখম হয়েছিল শুধু। তাদের সাজপোশাক আর রিভলভার নিয়ে গিয়েছিল কয়েকটা লোকে। তারা ধরা পড়েছে। ব্যাস্—তাদেরই ধরে চালান দিয়েছে পুলিস। যাক্ শত্রু পরে-পরে। চলুন, এবার বেরনো যাক।"

পিপি জিজ্ঞাসা না করে পারল না, "কোথায় যেতে হবে।"

নন্দা আর সে-কথার জবাব দিল না।

অক্লেশে অনায়াসে লিফটে করে নেমে এল ওরা নিচে। সামনেই রাজপথ। পথে পা দিয়ে পিপি আবার নিজেকে ফিরে পেল। হঠাৎ তার মাথায় ঢুকল এক খেয়াল। জিজ্ঞাসা করলে—"সত্যি বল তো নন্দা, ওই আগারওয়ালটি তোমার কে হয়?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ তো, চলুন আমার সঙ্গে। প্রমাণ করেই দিচ্ছি, তিনি আমার স্বামী কি না।" নন্দার কণ্ঠে কৌতুক উপচে উঠল।

কোনওক্রমে উদ্গত নিঃশ্বাসটাকে চেপে পিপি বললে—"না থাক, প্রমাণ আর দিতে হবে না।"

নন্দা একখানা ট্যাক্সি থামিয়ে পিপিকে প্রথমে তুলে দিয়ে তারপর নিজে উঠে বসল। উঠতে উঠতে ড্রাইভারের ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে কোথায় যাবার জন্যে যে বললে, পিপি তা শুনতে পেল না। চুপ করে সে বসে রইল গাড়িতে, বসে ভাবতে লাগল, কি করে ওই আগারওয়ালটা এমন একটা মেয়ের স্বামী হতে পারে! আর স্বামীই যদি সে, তবে কেন অমনভাবে মদ খাইয়ে ইতর মাতালদের সামনে স্ত্রীর ইজ্জত নষ্ট করে! আরও বহু রকমের বহু প্রশ্ন ভেসে উঠল পিপির মনের মধ্যে, মনের মধ্যে উঠল, মনের মধ্যেই আবার তলিয়ে যেতে লাগল। সেসব প্রশ্ন কেউই কোনও ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না।

ভদ্রমহিলা!

হঠাৎ পিপির নজর পড়ল পাশে। লালপেড়ে শাড়ি পরে গম্ভীর মুখে যিনি পাশে বসে আছেন, তাঁকে ভদ্রমহিলা ছাড়া আর কি ভাবা যায়, ঠিক করতে পারল না পিপি।

ভদ্রমহিলা, হ্যাঁ, সত্যিই ভদ্রমহিলা। কিন্তু মদ খেলেই অন্যরকম হয়ে যায়। আচ্ছা, মদই বা খায় কেন!

সেই প্রশ্নটাই করে ফেলল পিপি। সামান্য একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ফিসফিস করে বলল—"আচ্ছা নন্দা, তুমি মদ খাও কেন?"

নন্দা নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিল। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল—"কি! কি খাই কেন?"

পিপি একটা ঢোঁক গিলে আবার সেই প্রশ্ন করলে—"এই বলছিলাম কি, মদটা তুমি কেন খাও? ওটা না খেলে কি তোমার চলে না?"

যাকে বলে, খিলখিল করে হাসা, সেইভাবে হেসে উঠল নন্দা। বলল—"ওমা, তা আবার চলবে না কেন? ও জিনিস কি দিনরাত খাচ্ছি নাকি আমি? কখনও কোনও দিন একটু-আধটু খেতে হয়। নয়তো স্বামী যে রাগ করেন।"

এবার চটে গেল পিপি। ঝাঁজিয়ে উঠল—"খালি স্বামী স্বামী আর স্বামী। স্বামী পেঁড়া-পুরি গেলান, তাই খাও; মদ না খেলে স্বামী চটে যান, তাই মদ গেলো। উঃ, কি রাক্ষুসে স্বামীভক্তি তোমার! এবার স্বামীটির সঙ্গে একবার মোলাকাত হলে হয়। স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করব, কেন তিনি নিজের স্ত্রীকে ওই বিচ্ছিরি জিনিস গেলান। কি লাভ হয় তাঁর? যত সব বেহেড্ কাণ্ড—"

নন্দা ভালোমানুষের মত বলল—"করবেন, নিশ্চয়ই করবেন। এখন নামুন, এই যে আমরা এসে পড়েছি। এই, এই, এই বাঁ-হাতি একশো সাতান্ন। রোখকে···রোখকে—"

একশো সাতান্ন নম্বরের রোয়াক ঘেঁষে গাড়ি থেমে গেল।

"এ কি! কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?" আঁতকে উঠল পিপি।

ততক্ষণে দরজা খুলে নেমে পড়েছে নন্দা। ড্রাইভারকে বলছে—"দশ মিনিট ঠারিয়ে জী, দশ মিনিট ভি নেই লাগেগা।"

গাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বলল—"আঃ, নামুন না। নেমে আসুন শিগ্‌গির। দেরি করলে ট্যাক্সি পালাবে। এখানে আবার ট্যাক্সি মিলবে না।"

তাড়ার চোটে নেমে পড়তে হল পিপিকে। নন্দার মতলবটা যে কি, বুঝতে না পেরে বেশ হকচকিয়ে গেল।

রাস্তা থেকে তিন ধাপ উঁচুতে দরজা। ডাকাডাকি না করে দরজা পার হল নন্দা। পিছন ফিরে বলল—"বসুন আপনি বাইরের ঘরে। এ-বাড়িতে যখন দু'বছর এসে পড়িয়ে গেছেন, তখন নিশ্চয়ই বাইরের ঘরটা চেনেন। আমি ভেতরে যাই। ডেকে নিয়ে আসি স্বাতীকে।"

চাপা গলায় কি যেন বলতে গেল পিপি। নন্দা ততক্ষণে কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেছে। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—"বসুন না বাইরের ঘরে গিয়ে। চাদরখানা উদ্ধার করে নিয়ে এখনই চলে যাব।" বলে আর এক মুহূর্ত সে অপেক্ষা করল না, ভেতরের দরজার পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হল।

অগত্যা আর তখন কি করবে পিপি! বাঁ দিকে বাইরের ঘরের দরজা। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সেই দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা দিল সে।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কে বলে উঠল—"এস মাস্টার। আমাকে চিনতে পারছ বোধ হয়! তুমি যখন পড়াতে এ-বাড়িতে, তখন একবার এসেছিলাম আমি। কি একটা ব্যাপার নিয়ে তোমাতে আমাতে ঘণ্টাদেড়েক তর্ক হয় যেন! নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ছে আমাকে!"

ছু' হাত তুলে কপালে ঠেকাবার মত একটু ভঙ্গি করল পিপি। বলল—"এই যে। নিশ্চয়ই চিনতে পারছি, কেমন আছেন আপনি?"

"ভালো থাকাটা আমার কুষ্টিতে লেখা নেই মাস্টার, কুষ্টিতে ভালো থাকার ঘরে বেড়ালে-বেঁজিতে খেয়োখেয়ি চলছে। তোমরা ভালো থাকতে দিলে তো ভালো থাকব।" গুরুতর ধরনের একটি শ্বাস ফেলে মেসো মুখ বুজলেন।

মেসোর কথা বলার বাঁকা ধরনটা পিপি লক্ষ্য করল, কিছু বলল না। মানুষটিকে সে একবার এ-বাড়িতে দেখেছিল। ঘণ্টাদেড়েক তর্কাতর্কিও করেছিল ওঁর সঙ্গে নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে। শ্রদ্ধা জন্মেছিল পিপির মনে, ওঁর জানাশোনা লেখাপড়ার বহর দেখে। তিন-তিনটে বিদেশী ভাষার যাবতীয় মনস্তত্ত্ব-ঘাঁটা পুঁথি-পুস্তকগুলো গুলে খেয়ে বসে আছেন।

মেসো সোজা হয়ে উঠে বসলেন। এতক্ষণ আড় হয়ে পড়েছিলেন লম্বা সোফাখানায় হাতে একটা ঢাউস খবরের কাগজ নিয়ে। কাগজখানা পাশে রেখে বললেন—"বোস মাস্টার, বোস, এই আমার পাশেই বোস। খুঁজে তোমায় বার করতে হতই আমাকে, এসে পড়ে সে তকলিফটা থেকে রক্ষা করলে।"

বসে পড়ল পিপি, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল—"খুঁজে বার করতেন আমায়! কেন? খুব জরুরী কিছু, মানে কোনও বইটই বুঝি আপনার, মানে—"

"মানে ও সমস্ত কিছুই নয়। গতবার তোমায় বই-বই করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলাম, কথাটা তুমি ভুলতে পার নি দেখছি। না না, ওসব বইটই কিছু নয়। সাপের বিষ নামাতে হবে, তাই। তুমি নাকি সাপের বিষ নামাতে জান?" খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন মেসো।

আকাশ থেকে পড়ল পিপি—"মানে, রোজাগিরি? কি সর্বনাশ! কিন্তু সাপে কামড়াল কাকে?"

"ধরো না কেন, আমাকেই। কেন, সাপেও কি আমায় কামড়াতে পারে না নাকি? আমার চামড়া কি গণ্ডারের চামড়া থেকে পুরু?" চোখ পাকিয়ে রুখে উঠলেন মেসো।

হেসে ফেলল লিপি। বলল—"নাঃ, একটুও আপনি বদলালেন না দেখছি। তা যাই হোক, হঠাৎ সাপের বিষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? ভেনম্ নিয়ে খুব পড়াশোনা করছেন বুঝি আজকাল?"

মেসো একটি চাপড় লাগালেন পিপির হাঁটুর ওপর। বললেন —"ধরেছ ঠিক। ভেনম্ অ্যাণ্ড ভাইস্, এই নাম দিয়ে একটা বই লিখব। তার মালমশলা যোগাড় করছি।"

পিপি মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে রইল মেসোর মুখের দিকে। মেসো বলতে লাগলেন—"শোন তাহলে, শোনাই তোমায় আমার সেই বইটার প্রথম খানিকটা। মুখে মুখে শোনাই। একটা মেয়ে ছিল, মেয়ের মত মেয়ে। ছিঁচকাঁদুনী ন্যাকা শাড়ি-ব্লাউজ-সর্বস্ব রঙ-মাখা থুবড়ী নয়। সত্যিকারের জ্যান্ত একটা মেয়ে। হাসতে জানত, হাসাতে জানত। কারণ মেয়েটা বড় হয়েছিল বটে, কিন্তু তার মনে কোনও রকম ভাইস্—মানে, হিজিবিজি ভাবনা-চিন্তা জন্মায় নি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, মেয়েটা হাসতে ভুলে গেছে। কেন? কিছুতেই কেউ জানতে পারল না কেন'র জবাবটা। তখন একজনকে সাপে খেল। সর্পাঘাত, সাক্ষাৎ সর্পাঘাত! মরছে সে লোকটা সাপের বিষের চোটে। মেয়েটাকে সে অনুরোধ করল, 'বল্ মা বল্, আমি তো ওপারেই চলে যাচ্ছি। এখন—এখন আমায় তোর মনের ব্যথাটা বল্ মা! আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না!' তখন সেই মেয়ে সব বলল। ব্যাস্—সাপের বিষ কেটে গেল। এমনই কিছু বলেছিল মেয়েটা তার কানে-কানে, যে, সাপের বিষটাও গেল কেটে! লোকটা আবার বেঁচে উঠল।"

পিপি প্রায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনছিল এতক্ষণ। মেসো থামতেই বলে উঠল—"তারপর?"

মেসো উঠে দাঁড়ালেন সোফা ছেড়ে। প্যাণ্টের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভয়ানক চিন্তিতভাবে পায়চারি শুরু করলেন। চিন্তিতভাবেই বললেন—"তারপরের ব্যাপারটা নিয়েই তো বই। কি এমন কথা বলেছিল মেয়েটা! কি সম্বন্ধে বলেছিল!"

পিপি বলল—"কি বলেছিল তা তো সেই সাপে-কাটা লোকটাই জানে। তার মুখ থেকেই জানা যাবে কি বলেছিল। আপনার বইতে নিশ্চয়ই লিখেছেন সে-কথা। কি বলেছিল মেয়েটি?"

মেসো বললেন—"ভাইস্-পাপ-অন্যায়-অধর্ম-সিন্। মেয়েটার মনে ওইসব ঢুকে গিয়েছিল, যার নাম—মনের বিষ। মনের বিষের এতখানি শক্তি আছে যে, শরীরের বিষ কাটিয়ে দিতে পারে। জান তো—বিষস্য বিষমৌষধং।"

পিপি উঠে দাঁড়াল উত্তেজনায়। বলল—"কি বিষম কাণ্ড! মনস্তত্ত্বের খুব উঁচু স্তরের গবেষণা করছেন আপনি এবার। এ জিনিস যদি ছাড়েন বাজারে, বিজ্ঞান-ফিজ্ঞান সব কাদা হয়ে যাবে। এ সমস্ত আমি বিশ্বাস করি। সত্যি বিশ্বাস করি। এই তো কত শোনা যায়, শুধু ফুঁ দিয়ে রোগ সারিয়ে দেন মহাপুরুষরা। ফুঁ কিছুই নয়, শুধু মনের জোর। বিষই বলুন আর যাই বলুন, মেয়েটার মনে জোর ছিল। বলতে পারেন সেটা ভাইস্ বা পাপ। কিন্তু ওই বস্তুটাই এত কড়া-জাতের ছিল, যে, মেয়েটার মনের শক্তির কাছে সাপের বিষ হেরে গেল। মেয়েটা তারপর—"

মেসো মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—"ঠিক ধরেছ। তারপর মেয়েটা বুকের মধ্যে সেই বিষ নিয়ে বেঁচে থাকে কেমন করে? তার মনের বিষ কি দিয়ে ঘোচানো সম্ভব?"

চিন্তিতভাবে পিপি বলল—"সেও একটা কথা বটে! কিন্তু যতক্ষণ না জানতে পারা যাচ্ছে, মেয়েটার মনে কি হয়েছিল—"

মেসো ঘুরে দাঁড়ালেন বোঁ করে। চোখ পাকিয়ে বললেন—"শুনবে? শুনতে চাও সে কেচ্ছা?"

পিপি বলল—"বলুন না। কি এমন দিতে চান আপনি আপনার বইতে, তা জানবার জন্যে সত্যি আমি খুব—"

মেসো কথাটা শেষ করলেন—"উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছ। মানে, জিরাফের মত গলাটা তোমার লম্বা হয়ে গেছে। আচ্ছা বলছি, শোন। শুনতে শুনতে গলাটা আবার খাটো না হয়ে যায় তোমার। যাই হোক, বলছি। শুনে যাও, মিলিয়ে নাও। ছাখো, কোথাও ভুলটুল হল কি না। সেই মেয়েটার সঙ্গে দু'বছর একটি ছোকরা মিশেছিল। তার সামনের চেয়ারে বসে তাকে পড়িয়েছিল। তারপর স্রেফ একদিন বলে বসল, মেয়েটাকে মোটে চিনতেই পারছে না।"

খোঁটার মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন পিপি। দুই চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরচ্ছে তার। হিসহিস করে জিজ্ঞাসা করল—"তারপর?"

মেসো হাল্‌কা ভাবে বললেন—"তারপর এখন আমায় লিখতে হবে, দু'বছর ধরে কি বিষ ঢুকিয়েছিল সেই মাস্টার মেয়েটার মনে, সেটা আমাকেই লিখতে হবে।"

পিপি হাঁ করেছিল কিছু বলার জন্যে, বলার অবকাশ পেল না। ঘরে ঢুকলেন মাসী, তাঁর সঙ্গে নন্দা ও স্বাতী। উচ্ছ্বসিতা মাসী রাউ-রাউ রব তুলে ঘরে ঢুকলেন—"ছাখ গো, কে এসেছে। চিনতে পার কি না ছাখ। সেই যে সেই উড়োজাহাজের মেয়েটি, চিনতে পারছ না? সেই যে সেবার বর্মা থেকে আসবার সময় ভয়ানক অবস্থা হল আমার। এই মেয়েটা না থাকলে কি যে দশা হত! তুমি তো নিজেই ভাম মেরে পড়লে প্লেনের দোলুনির চোটে, আর আমার বমি! বমির সঙ্গে বুকের মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু হল। ভাগ্যিস এ ছিল সেই প্লেনে। দমদম থেকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে একবেলা থেকে সে কি যত্ন! আমার পেটের মেয়ে হলেও অতটা—"

মেসো বললেন—"করত না। নিশ্চয়ই না। অতটা আদিখ্যেতা পেটের মেয়ে সহ্য করবে কেন। তা কেমন আছ মিসেস্ আগারওয়াল? চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় হাওয়াই ঝোপ্পাঝাপ্পিগুলো ছাড়ার ফলে। এই না হলে মানায়! লালপাড় শাড়ি-পরা যেন মা-লক্ষ্মীটি। তা হঠাৎ আজ এখানে এসে পড়লে যে?"

নন্দা দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলল—"এলাম আমার দাদাকে নিয়ে। দাদার একখানা চাদর আছে এ-বাড়িতে। চাদরখানার জন্যে দাদার খুবই মন খারাপ—"

পিপি চিৎকার করে উঠল—"মন খারাপ? চাদরের জন্যে?—"

মেসো ভালোমানুষের মত বললেন—"একই কথা, একই কথা। যে-কারণেই মন খারাপ হোক, মোটের ওপর মনটা খারাপ।"

পিপি খুব শান্তস্বরে বলল—"ভুল করছেন সবাই আপনারা। মন আমার মোটেই খারাপ নয়"

মেসো বললেন—"মিসেস্ আগারওয়াল, মানুষ তুমি অনেক দেখেছ। তোমার দাদার মত এমন ডাহা মিথ্যুক আর একটিও দেখেছ কোথাও? তুমি সেবার আমাদের শুনিয়েছিলে তোমার বিয়ের ব্যাপারটা। মিস্টার আগারওয়াল যখন নিতে আসেন তোমায়, তখন তাঁর সামনেই শুনিয়েছিলে। আমার বেশ মনে পড়ছে। শুনবে নাকি মাস্টার, মিসেস্ আগারওয়ালের বিয়ের কাহিনীটা? আ রে! আচ্ছা মানুষ তো আমি! ও যখন তোমার বোন, তখন তুমি নিশ্চয়ই বোনের ব্যাপারটা জান।"

পিপি বলল—"আজ্ঞে না। বোনটিকে ঘণ্টা-কতক আগে পেয়েছি। বলুন না, দয়া করে বলুন। সত্যিই আমি—"

মেসো বললেন—"জিরাফের মত লম্বা গলা তোমার। গলাটা খাটো হবেই দেখছি। আচ্ছা শোন। এই মিসেস্ আগারওয়াল ব্রাহ্মণের মেয়ে। একটি বিবাহ-বিশারদের সপ্তমা স্ত্রী। সেই বিশারদ বিয়ে করে স্ত্রীটিকে উপযুক্ত মূল্যে যথাস্থানে বিক্রি করে দিতেন।

এঁর ক্রেতা এলেন আগারওয়াল। এলেন, একরাত এঁর সংস্পর্শে রইলেন। তারপর বিবাহ-বিশারদ আর যাতে কোনও মেয়ের সর্বনাশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করলেন তাকে জেলে পাঠিয়ে। তারপর রেজেস্ট্রি করে এঁকে বিয়ে করলেন। আগারওয়াল আমায় বলে গেছে, এইরকম দুর্দান্ত মেয়ে একটি সে চায়। ঘরে স্ত্রী আছে, ঘরোয়া স্ত্রী। আর-একটি এইজাতের মেয়ে তার প্রয়োজন। তারপর এই দুর্দান্ত মেয়ের আবদার এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আগারওয়ালই এর এয়ার-হোস্‌টেসের চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছে। সে ভদ্রলোকের বিশ্বাস, দুর্দান্তপনা না করতে পেলে তার এত দামী স্ত্রীটি বাঁচবে না। অ্যাড্‌ভেঞ্চার বস্তুটা যার রক্তে মিশে গেছে, তার ঘাড়ে হরদম উদ্ভট ঝুঁকি না থাকলে সে বাঁচবে কেমন করে?"

স্বাতী এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল—"আঃ, আমিও যদি ওইজাতের একটা কিছু করতে পেতাম!"

মাসী বললেন—"ষাট ষাট, অমন কথা মুখে আনতে আছে! কেন? কি হয়েছে এমন তোর যে এই সব বিতিকিচ্ছি কাজ করতে যাবি?"

মেসো ঘোর রবে বললেন—"হয়েছে। আলবাত হয়েছে। সেই বিবাহ-বিশারদ তবু বিয়েটা করত। বিয়ে করে বেচারা মেয়েগুলোর সর্বনাশ করত। কিন্তু আইবুড়ো-বিশারদরা সেটুকু দয়াও করেন না। দু'বছর চেনা-পরিচয়ের পরেও বলেন, 'কই, তোমায় চিনতে পারলাম না তো!' বিষ, এমন বিষ ঢোকায় মেয়েটার মনে যে, সে বিষের কাছে সাপের বিষও কিছুই নয়।"

দম আটকে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ পিপি। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল—"স্বাতী, তুমি আমার ছাত্রী। ছাত্রী—মেয়ের মত। মেয়ের মতই আমি দেখি ছাত্রীদের। বলো মা, সত্যি করে বলো, ইনি যেসব ইঙ্গিত করছেন তা কি তোমার মনের কথা? সেদিন সেই ভয়ংকর রাত্রে অন্ধকারে সত্যিই তোমায় চিনতে পারি নি আমি। সেই

খুনোখুনির পরে মাথাটাও আমার ঠিক ছিল না। তাই তোমায় চিনতে পারি নি প্রথমে। সেই অপরাধের জন্যে জঘন্য অপমান করছেন ইনি আমায়। বল মা, এগিয়ে এসে বল, তোমার মাস্টারমশাই কোনও দিন কখনও—"

আর বলতে পারল না পিপি। বলার আর দরকারও ছিল না। বজ্রাহত হয়ে ঘরের প্রতিটি প্রাণী দাঁড়িয়ে রইল।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল স্বাতী। মাস্টারমশায়ের দু'পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"মাস্টারমশাই, আমায় ক্ষমা করুন। আমার জন্যেই এত কাণ্ড, এত অপমান সহ্য করতে হল আপনাকে মিছিমিছি। মিছিমিছি এঁরা এসব করছেন। কখনও আমি আপনার নামে কিছু—" ছুটে পালিয়ে গেল স্বাতী কথাটা শেষ না করে। মেসো আর মুখ তুলতে পারলেন না।

তারপর কখন কিভাবে নন্দা তাকে টেনে এনে ট্যাক্সিতে তুলেছিল, পিপি তা মনে করতেও পারে না। শুধু তার মনে পড়ে, একসময় ট্যাক্সি থামিয়ে নন্দা ড্রাইভারের হাতে দশ টাকা দিয়ে বলেছিল—"ইনি যেখানে যেতে চান, পৌঁছে দিও।"

পিপি আরও কিছুক্ষণ বসে ছিল ট্যাক্সির মধ্যে। নির্জন পার্কটার পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার খেয়াল হল, দশ টাকায় আর কতক্ষণ ট্যাক্সি চাপা সম্ভব। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে মিটার দেখল—ন' টাকা পার হতে চলেছে। ট্যাক্সি বিদায় দিয়ে পার্কটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মুক্ত, একদম মুক্ত সে এখন। কোনও বন্ধনই কোথাও নেই। বন্ধনের জ্বালা, বন্ধনের মদিরতা, বন্ধনের নেশা সব উবে গেছে। অনেক উঁচুতে আকাশের গায়ে দু'খানি মুখ ফুটে আছে কিন্তু তখনও। থাকুক, ক্ষতি নেই। একদিন ও মুখ দু'খানিও হয়তো মন-আকাশের গা থেকে মুছে যাবে।

মুছে যাবে নিশ্চয়ই সব-কিছু। মুছবে না শুধু শ্রীপুনর্বসু পালিতের নিজস্ব মৌলিকতাটুকু। ওটুকু বজায় রাখতে না পারলে স্বয়ং শ্রীপুনর্বসু পালিতই যে মুছে লোপাট হয়ে যাবে দুনিয়ার বুক থেকে।

আইসক্রীম

প্রেম সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত ছিল বাসব দত্তর। ওর ধারণা ছিল, প্রেম ব্যাপারটা এমনই মামুলী ধরনের ব্যাপার, যা নিয়ে গল্প লেখাও চলে না। আকছার মানুষে প্রেমে পড়ছে, পড়ে একটুও গড়িমসি না করে তলিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের প্রেম নিয়ে গল্প লিখলে সেটা প্রেমের গল্প হয় না, তলিয়ে যাওয়ার গল্পে দাঁড়িয়ে যায়। যেমন ভূতের গল্প লিখতে গেলে সেটা ঘাড় মটকাবার গল্প হয়ে দাঁড়ায়। কাউকে ভূতে পেল এবং ভূত তৎক্ষণাৎ তার ঘাড়টি মটকে ছাড়ল। ব্যাস্, লেঠা চুকে গেল। কিন্তু এর মধ্যে গল্পটুকু কোথায়! প্রেমের ব্যাপারেই হোক বা ভূতুড়ে কাণ্ডেই হোক, আসল গল্প লুকিয়ে থাকে নাকানি-চোবানি খাওয়া আর নাজেহাল হয়ে মরার মধ্যে। প্রেমে পড়ে কে কতক্ষণ কি ভাবে নাকানি-চোবানি খেল, ভূতের খপ্পরে পড়ে কাঁহাতক নাজেহাল হয়ে মরল বাছাধন, সেইটুকুই গল্পের পরমায়ু। তারপর কে তলিয়ে গেল, কার ঘাড় মটকাল, তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাতে যায় না।

বাসব দত্ত নিজেও কখনও প্রেমের ব্যাপারে মাথা ঘামাত না। ও বাজি ধরত। বাজি ধরত দমের জোরের ওপর। বাসব দত্ত বলত, দমের জোরটাই আসল জিনিস। প্রেমে পড়া বা ভূতের পাল্লায় পড়া, দু' ব্যাপারেই যথেষ্ট দমের জোর চাই। দমের জোর থাকলে প্রেমে পড়ে প্রেমিক-প্রেমিকা বিস্তর সময় টালবাহানা করে কাটাতে পারে। যাকে ভূতে পেল, তার যদি তেমন দমের জোর থাকে তাহলে ভূত বাবাজীকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়তে পারে। দমের জোর থাকলে অনেক ক্ষেত্রে শেষ রক্ষাটাও হয়। প্রেম বা ভূত, কারও কাছে হার মানতে হয় না। সসম্মানে অক্ষত দেহে উদ্ধার

পাওয়া যায়। কিন্তু কটা মানুষের দমের জোর আছে আজকাল! দমের জোর বাড়াতে অভ্যাস চাই, সাধনা চাই। হরদম প্রেমে পড়তে হবে, যেখান থেকে হোক ভূত খুঁজে বার করে তার হাতের গোড়ায় ঘাড়টি বাড়িয়ে দিতে হবে, তারপর নাকে দম থাকা তক্ দম দিয়ে যেতে হবে। তবে তো দমের জোর বাড়বে। কিন্তু এসব আজকাল করছে কটা লোকে। তাই তো দেখা যায়, যেমন ঢুম করে প্রেমে পড়ছে মানুষে, অমনি টুপ করে তলিয়ে যাচ্ছে। ভূতে কারও ঘাড়ে হাত দিয়েছে, তো অমনি ঘাড়টি মটকে ছেড়েছে। অভ্যাস নেই, সাধনা নেই, চর্চা নেই, সকলেরই দম একেবারে গোঁফের ডগায়। এ হেন অবস্থায় প্রেম বা ভূত যা নিয়েই গল্প লেখা হোক না কেন, কোনওটাই ঠিক ওতরায় না।

গল্প না ওতরালেও বাজি ধরা চলে। প্রেম বা ভূত, দুটো ব্যাপারেই একটু বুঝেসুঝে কিছু ধরতে পারলে লাভ না হোক, লোকসান তেমন একটা কিছু হয় না। তবে ঝুঁকি আছেই। বাসব দত্তের মতে, জীবনটাই একটা মস্তবড় জুয়াখেলা। আর জুয়া-খেলাটাই হল ঝুঁকির খেলা। নানান ফ্যাকড়া বেরতে পারে। বাজি ধরার পরে হয়ত দেখা গেল, প্রেম বলে মনে হয়েছিল যেটাকে সেটা আগাগোড়াই ধাপ্পাবাজি। কিংবা প্রেমটা অবৈধ প্রমাণ হয়ে বসল। কিংবা ঘোরতর রকমের অশ্লীল দাঁড়িয়ে গেল। ভূতের কারসাজিতেও হাজার রকমের মারপ্যাঁচ ঘটতে পারে। ভূতে ধরেছে, বেশ ধস্তাধস্তি চলেছে ভূতে-মানুষে। ভূতের রোখ চেপে গেছে ঘাড় মটকাবার জন্যে। মানুষেরও গোঁয়ারতুমি, কোনও মতেই ঘাড়ে হাত দিতে দেবে না ভূতকে। এমন সময় বন্ধি এসে বাতলে দিল, ভূতটুত কিছুই নয়, ভূরিভোজনজনিত চিত্তবিকার। ব্যাস্, বাজির ওপর সজোরে বজ্রাঘাত।

মোটের ওপর ঝুঁকি সব ব্যাপারেই কিছু-না-কিছু আছে। বাসব দত্ত ওই ঝুঁকিটুকুর ভয়েই প্রেমে পড়ার দিকে পা বাড়াত না।

প্রেমে পড়াটাও তো কম ঝুঁকির কাজ নয়। প্রেমে পড়লেই এক শো রকমের ফ্যাচাং পোয়াও। এটা আন, ওটা কেন, সেটা জোটাও। নিত্যনতুন ফ্যাশন পালটাচ্ছে জামা কাপড় জুতোর। সেই সব ফ্যাশন মুখস্থ কর। সিনেমা দেখাও, হোটেলে খাওয়াও, মোটরে চড়িয়ে নিয়ে দুর্গাপুর ডায়মণ্ডহারবার চক্কর দাও। এ সমস্ত কি কম ঝঞ্ঝাট নাকি!

ভূতের বেলাতেও তাই। ঘাড় মটকাবার আগে কম ঝক্কি সামলাতে হয় না ভূতকে। আনল ডেকে রোজা। রোজা এসে বসে গেল আগড়-বাগড় মন্ত্র ঝাড়তে। তারপর আছে সর্ষে-পড়া, লঙ্কা-পড়া, গোলমরিচ-পড়া। আদা মৌরি গরম মসলা পেঁয়াজ রসুন ধনে জিরে কত রকমেরই না ঝাঁঝালো জিনিস আছে মুদীর দোকানে। সেই সব মসলাপাতি দোকান উজাড় করে এনে তার ওপর ঝাঁঝালো মন্ত্র পড়ে ভূতের দিকে তাক করে ছোঁড়া হতে লাগল। সেই সমস্ত ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে তবে তো ভূত ঘাড় মটকাবে।

বাসব দত্ত তাই প্রেম বা ভূত দুটোকেই সাবধানে এড়িয়ে চলত। তবে বাজি ধরতে বাধে না। ঝুঁকি তো আছেই। প্রেমে পড়া বা ভূতে ধরা এ দুটো মূল কর্মেই যখন এন্তার ঝামেলা-ঝক্কি পোয়াতে হয়, তখন ও-দুটোর ওপর বাজি ধরাটাই বা কম ঝুঁকির কাজ হয় কি করে। ঝুঁকিটুকু কবুল করে তাক বুঝে কিছু ধরে ফেল, দেখবে লাভ না হোক, তেমন একটা কিছু লোকসান দাঁড়াবে না।

৷

বাসব দত্তর বাজি ধরায় লাভের প্রশ্ন উঠতই না। ও বাজি ধরত একতরফা। হারলে বাসব দত্ত হারবে, জিতলে কিছুই ওর লভ্য হবে না। যা বাজি ধরেছিল, সেগুলো শুধু খোয়াবে না। এ ধরনের বাজিতে কারই বা আপত্তি থাকতে পারে। অহেতুক খানিকটা কথা কাটাকাটি করলেই হল, বাসব দত্ত ঠিক বাজি ধরে ফেলবে। সেবারও ঠিক তাই হল। প্রেমে পড়েছিল ভবভূতি, আলোচনা

চলছিল ভবভূতির প্রেম নিয়ে। ভবভূতির মত খাঁটি মানুষে কি করে প্রেমে পড়তে পারল, তাই নিয়ে সকলে মাথা ঘামাচ্ছিল। প্রেমে পড়াটা সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন-কিছু তাজ্জব কাণ্ড নয়। সাধারণ মানুষে যেমন খায়-দায় ঘুমোয় আড্ডা মারে, তেমনি সময়ে-অসময়ে একটু-আধটু প্রেম-ট্রেমও করে। তা বলে ভবভূতি! ভবভূতির মত খাঁটি মানুষ কটা মেলে আজকালকার বাজারে!

বাসব দত্ত ক্রস-ওয়ার্ড মেলাচ্ছিল নিবিষ্ট চিত্তে। কাগজের ওপর থেকে নজর না তুলেই বলল—"দূর, ওটা প্রেম নয়। একটা বোগাস ব্যাপার। পয়লা নম্বরের পরকীয়া পাগলামি।"

সানু মিত্তির উকিল। নতুন শ্বশুর পেয়েছে, তিনিও হাইকোর্টের জাঁহাবাজ উকিল। সানু মিত্তির ভরসা রাখে, শ্বশুর একদিন জামাইকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেই ভরসায় বিয়ে করা পরিবারের সঙ্গে চুটিয়ে স্বকীয়া প্রেম চালাচ্ছে। সে বললে—"পরকীয়া! মানে—ডিভোর্স হয়ে গেছে তো? নয়ত আইনের দিক থেকে ফ্যাসাদে পড়বে যে ভবভূতি।"

ধ্রুবজ্যোতিবাবু সাইকলজির অধ্যাপক। তিনি আইনের ওপরে মনঃসমীক্ষণকে স্থান দেন। তিনি বললেন—"রেখে দাও তোমার ডিভোর্স আর আইন। আগে দেখ, হঠাৎ কেন প্রেমে পড়তে গেল ভবভূতি। ভবভূতিকে আমরা সবাই চিনি। ভবভূতির মত মানুষ কটা আছে? আগে অ্যানালিসিস্ কর ওর মনটা। ছোটবেলা থেকে ও উপদেশ শোনার ওস্তাদ। পাঁচ ক্রোশ দূরে উপদেশ দান করার জন্যে কেউ উপস্থিত হয়েছেন জানতে পারলে ও তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটবে খাতা-পেন্সিল নিয়ে। শোনার যা তা তো কান ভরে শুনে আসবেই, উপরন্তু কিছু-না-কিছু লিখিয়ে নিয়ে আসবে ওর খাতায়। যেন তেন প্রকারেন একটি বাণী আদায় করে আনবেই ভবভূতি। বাণীর তলায় থাকবে বাণীদাতার নামসই আর তারিখ। হাজার হাজার উপদেশ আর বাণী, হাজার হাজার নামসই আর

তারিখ যোগাড় করেছে ভবভূতি। ছোট বড় বেঁটে মোটা গণ্ডা গণ্ডা খাতা ভরতি করছে বাণী কুড়িয়ে। এখন দেখ, কোন উপদেশ বা বাণীর জোরে ভবভূতি নিজেকে নামিয়ে ফেলল এই অশ্লীল ব্যাপারের মধ্যে। এটা স্রেফ একটা সাইকসিস্। নিয়ে যাও ভবভূতির কেস্‌টা একজন সাইকো-অ্যান্যালিস্টের কাছে। তখন টের পাবে আসল ব্যাপারটা।"

জাগুয়ার রায়ের আসল নাম জগদ্ধাত্রীপ্রসাদ রায়। নামটা সেকেলে, মানুষটা একেলে। কড়া ধাতের কেমিস্ট। দু'দুবার জর্মানি গিয়েছে, চিটেগুড় জ্বাল দিয়ে অ্যাটমিক্ এনার্জি উৎপাদনের কায়দাটা শিখে আসবার জন্যে। জাগুয়ার গাড়ি চড়ে বেড়ায় বলে নামটাও জাগুয়ার হয়ে গেছে। সে বললে—"প্রেম যদি একটা মৌলিক পদার্থ হয়, তাহলে ওটা অ্যান্যালিসিস্ করা যাবে কেমন করে। ভবভূতির প্রেমটা উলটো দিক থেকে বিশ্লেষণ করা দরকার। দেখতে হবে, ওর প্রেমটা পজিটিভ্ না নেগেটিভ্। তারপর দেখতে হবে, কতটা পরিমাণ রেডিও-অ্যাক্‌টিভ প্রেমটা, ওপেক্ ম্যাটার্ পেনিট্রেট্ করার মত কোনও শক্তি আছে কি না ওর প্রেমের। তারপর দেখতে হবে, কতটা পরিমাণ কম্বাস্‌টিবিলিটি আছে ওর প্রেমের মধ্যে। তারপর দেখতে হবে—"

বাসব দত্তর আর সহ্য হল না। ক্রস্-ওয়ার্ডের কাগজখানা আছড়ে ফেলে বলল—"হাতি। যত সব বোগাস ফর্‌মিউল্যা। বাজি রাখ, প্রেম-ফ্রেম কিস্‌সু নয়। ভবভূতি ফাঁদে পড়ে গেছে। গিয়েছিল কোন আশ্রমে উপদেশ গিলতে। গিলে এসেছে ওই পরকীয়াটিকে। কিংবা এ কথাও বলতে পার, ওই পরকীয়াটি ভবভূতির মস্তিষ্ক চর্বণ করেছে। ছিবড়ে করে তবে ছাড়বে। বাজি রাখ, কিছুদিন বাদে ভবভূতি পরিত্যক্ত হবে ছেঁড়া চটির মত। তখন বুঝবে, ব্যাপারটা প্রেম নয়, সেই পরকীয়াটির পায়ের পয়জার।"

লেগে গেল তুলকালাম কাণ্ড। বাসব দত্ত একদিকে, বাকী সবাই অন্যদিকে। ভবভূতির মত মানুষে যখন প্রেমে পড়েছে, তখন সে

প্রেমটা অত তুচ্ছ বস্তু নয়। আখেরে আপসাতে হয়, এমন কর্ম কিছুতেই ভবভূতি সোম করতে পারে না। ছোটবেলা থেকে ভবভূতি এন্তার উপদেশ কানে ঢুকিয়েছে। উপদেশ অবশ্য সকলেই কিছু-না-কিছু শোনে, কিন্তু শোনার মত করে শোনে কে। উপদেশ এক কান দিয়ে প্রবেশ করে অপর কান দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। দোষ উপদেশেরও নয়, যে শোনে তারও নয়। দোষটি হল খোদ সৃষ্টি-কর্তার। প্রত্যেকটি মুণ্ডের দু'পাশে দুটি কান না লটকে যদি এক পাশে একটিমাত্র কান লটকাতেন তিনি, তাহলে মাথার মধ্যে প্রবেশ করার পরে কোনও উপদেশই বেরবার পথ খুঁজে পেত না। মগজে আশ্রয় নিত। তার ফলে জগদ্দলপ্রমাণ এক-একটি মগজ ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াতে হত মানুষকে, কিন্তু উপদেশগুলো কাজে লাগত। অনর্থক গোল্লায় যেত না।

ভবভূতি কিন্তু শোনার মত করে উপদেশ শুনেছে। এক কানে ছিপি এঁটে অন্য কান দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করেছে মাথার মধ্যে। একটি উপদেশকেও পালাতে দেয় নি ফসকে। সেই ভবভূতি প্রেমে পড়েছে। প্রেমে পড়বার সময় কুল শীল গণ গোত্র কি বিচার করে দেখে নি ভবভূতি! অপরের বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে প্রেম করাটা যে কতদূর বিপজ্জনক কাণ্ড, তা কি বিবেচনা করে নি ভবভূতি! নিশ্চয়ই আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে ভবভূতি সোম। প্রেমে পড়ার ফলে দায়রায় সোপরদ্দ হবে, এমন কাঁচা কাজ নিশ্চয়ই ও করবে না।

অতএব রাখলে বাজি বাসব দত্ত। ওর আংটি বোতাম ঘড়ি গাড়ি সব বেচে থোক টাকাটা ভবভূতির বিয়েতে খরচা করে দেবে। বিয়ে মানে সেই আশ্রম দুহিতাটির সঙ্গে বিয়ে। যার সঙ্গে ভবভূতি মরিয়া হয়ে প্রেম চালাচ্ছে।

মরিয়া বলে মরিয়া। যার নাম একেবারে বেহেড বেআক্কেলে কাণ্ড। চিরকালের মুখচোরা আদর্শ চরিত্রের ভবভূতি, যে ভবভূতি এ ফুটপাথ

দিয়ে কোনও মেয়েকে আসতে দেখলে তৎক্ষণাৎ অন্য ফুটপাথে গিয়ে উঠত, সে একই ফুটপাথ দিয়ে জলজ্যান্ত একটা মেয়ের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বসংসারসুদ্ধ মানুষের চোখের সামনে দিয়ে হুড়হুড় করে কত কি আওড়াতে আওড়াতে চলতে লাগল। চলেছে তো চলেছেই, কোনও দিকে দৃক্‌পাত করার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে বলে মনেও করছে না।

কাউকে গ্রাহ্য করার প্রয়োজন ছিল না বটে ভবভূতির, কিন্তু ওর চালচলন লক্ষ্য করার গরজ ছিল অনেকের। কারণ বাসব দত্তর বে-আন্দাজী পরিমাণ বাজি ধরা রয়েছে যে। আর সত্যিকথা বলতে কি, অতটা বেপরোয়া ভাব সত্যিই সহজে সহ্য করা যায় না। সিঁথিতে সিঁদুরপরা মেয়ের সঙ্গে বেহদ্দ বেহায়ার মত বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা কেই বা বরদাস্ত করতে পারে। পরকীয়া প্রেমের জাতটাই মেরে দেবার যোগাড় করলে ভবভূতি। পরকীয়া কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু শিহরণ জাগে মনে। বেশ একটু সংকোচ থাকবে, দস্তুরমত সংগোপন থাকবে, সংকেত থাকবে, সংক্ষোভ থাকবে, তবে না পরকীয়ার মত পরকীয়া। তা নয়, ওদের পরকীয়ার সংঘটনে এতটুকু সংবরণ বা সংযম রইল না। অবশেষে ওদের মরিয়া হয়ে ওঠা ভাবটা সংক্রমিত হল অনেকের মনে। ভবভূতির পরকীয়াটি যে সৌভাগ্যবানের দৌলতে সিঁথিতে সিঁদুর পরে বেড়ান, তার খোঁজ পাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল অনেকে। এবং শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেয়েও ফেলল।

কতকটা ঘটনাচক্রেই সম্ভব হল ব্যাপারটা। সাঁচ্চা বোস তার খুড়তুত বোনের বিয়েতে চলে গেল এলাহাবাদে। ফিরে এল সাঁচ্চা এক সংবাদ নিয়ে। স্বচক্ষে দেখে এসেছে সাঁচ্চা বোস ভবভূতির পরকীয়ার স্বামীটিকে। মস্তবড় এক সাধু মহারাজ তিনি, দুধে গরদ গেরুয়ায় ছুপিয়ে অঙ্গে ধারণ করেন। মাখন মেওয়া আর মিষ্টি মাত্র আহার করে শরীর রক্ষা করেন। এবং মেয়েমানুষ ছাড়া পুরুষ-

মানুষের ছোঁওয়া জলটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। নাহক মিছে কথা বলার মানুষ নয় সাঁচ্চা বোস। সাঁচ্চা কথা মানুষের মুখের ওপর নির্বিচারে ছুঁড়ে মারতে পারে বলেই সে সাঁচ্চা। ওর ঠাকুরদাদা বোধানন্দ বোস নাতির নাম রেখেছিলেন সচ্চিদানন্দ। নিজ গুণে নামটাকে ও সাঁচ্চায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। সুতরাং সাঁচ্চা বোসের সংবাদ সকলেই মেনে নিলে। তবে একটু যেন খটকাও থেকে গেল। সাধু মহারাজের বয়েসটা সাঁচ্চা বোস কিছুতেই ঠিক আন্দাজ করতে পারলে না। বললে—"দেড়শো দুশো বছর তো হবেই, চাইকি আরও এক-আধ শো বছর বাড়তেও পারে।" এ আবার কেমন কথা রে বাবা! সাঁচ্চা বোসের কাছে রহস্যটা ভাল করে বুঝতে যাওয়াও মুশকিল। কথাটা পাড়তে গেলেই সাঁচ্চা দাবড়ানি দেবে—"আমি ঘুঘু দেখে বাড়ি ফেরার পাত্র নই বাওয়া, বুঝলে।" সত্যিই সাঁচ্চা বোস কচি খোকাটি নয় যে তাকে বক দেখিয়ে কেউ ঘুঘু চেনাবে। কাজেই সাধু মহারাজের ওপর সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা বিশেষ রকম বেড়ে গেল। বেড়ে যাওয়ার ফলে সবাই তলে তলে খোঁজ নিতে লাগল, সাধু মহারাজের কলকাতার আড্ডাটি কোথায়। অত বড় সাধু যখন, তখন নিশ্চয়ই যাওয়া-আসা আছে কলকাতায়। তাছাড়া সাধুর সহধর্মিণী যখন কলকাতায় বিচরণ করছেন, তখন ঠিকানা নিশ্চয়ই আছে একটা। এখন সেই ঠিকানাটির খোঁজ পেলেই হয়। তা হলেই একদিন না একদিন সাধুজীর দর্শন পাওয়া সম্ভব হবে।

অবশেষে ঠিকানা পাওয়াও সম্ভব হল। সম্ভব হল পিরামিড পুরকায়স্থর কৃপায়। লাইটহাউসে ম্যাটিনি শোতে গিয়েছিল পিরামিড, শো ভাঙতে তার নজরে পড়ে গেল পরকীয়াসহ ভবভূতিকে। তখন ডুব মারল পিরামিড ভিড়ের মধ্যে। পিরামিডের তুল্য শরীরখানা নিয়ে কাউকে ফলো করা সম্ভব না। ডুব মেরে পিরামিড টুকে নিলে ওদের ট্যাক্সির নম্বরটা। সেটি নিয়ে নিজের ভগ্নীপতির হাতে দিলে। ভগ্নীপতিটি ভেহিক্‌ল্ ডিপার্টমেন্টের ভিজে

ভাল্লুক। মানুষে লরী ট্যাক্সি হাঁকায়, এই অপরাধে তলে তলে তিনি আড়াইখানা বাড়ি হাঁকড়েছেন। নম্বরটি পেয়ে সাত-সাতটা সাজোয়ান পাঞ্জাবীকে তলব করলেন তিনি। এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার করে ফেললেন, কোন রাস্তার কত নম্বর বাড়িতে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল ভবভূতিরা। সেই বাড়ি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেই সন্দেহ ভঞ্জন হল সকলের। সাঁচ্চা বোস সাঁচ্চা টিপই এনেছে এলাহাবাদ থেকে। ভয়ানক নামকরা একজন সাধু মহারাজের বাড়ি সেখানি। মাঝে মধ্যে কখনও সখনও মহারাজ এসে অধিষ্ঠান করেন সেই বাড়িতে। বাড়িতে বাস করেন মহারাজের এক শিষ্যা, তাঁর মেয়ে নিয়ে। মেয়েটি কলেজে পড়ে।

এত সংবাদ পাবার পরেও ব্যাপারটা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

দুটি রহস্যের কূলকিনারাই করা গেল না। সাধু মহারাজের বয়েসটা কত, তা কেউ ঠিক করে বলতেই পারল না। তলার দিকে দুশো, ওপর দিকে চার শো, এর মধ্যে সকলের আন্দাজ নামা-ওঠা করতে লাগল। যাঁর কাছেই সাধুজীর বয়েস সম্বন্ধে আঁচ নেবার চেষ্টা করা গেল, তিনিই চোখ বুজে দু'হাত জোড় করে বার বার কপালে ঠেকাতে লাগলেন। দুর্ভেদ্য ভক্তির পাঁচিলে মাথা ঠুকে বয়েসের প্রশ্নটি ভোঁতা হয়ে গেল। প্রথম প্রশ্নটির হাল দেখে দ্বিতীয়টি তোলবার আর সাহসই হল না কারও। ওই পরিমাণ বয়েস যাঁর, তাঁর একটি অতটুকু সহধর্মিণী থাকার প্রয়োজন কি, এ প্রশ্নটি আর তোলাই গেল না সাধুজীর ভক্তবৃন্দের কাছে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায়!

ধৈর্য ধারণ ক[illegible] হবে খোদ সাধু মহারাজের জন্যে। একটিবার আসুন মহারাজ তাঁর কলকাতার বাড়িতে, তখন তাঁর দর্শন লাভ হবেই। তারপর যে যার বুদ্ধি-বিবেচনা মত তাঁর বয়েসটা ঠাহর

করে নিতে পারবে। এবং তখন দেখা যাবে, শ্রীমান ভবভূতি সোম কি করে। মহারাজকে ভাল করে জানিয়ে দিলেই হবে যে, ভবভূতি সোম নামক এক ব্যক্তি তাঁর বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে এ হেন আচার-ব্যবহার করছে, যেটাকে চরম বাড়াবাড়ি বললেও অন্যায় বলা হয় না। পত্নীর ষোলআনা আইন-বিরুদ্ধ চালচলন কি জাতের প্রতিক্রিয়া করে তাঁর মন শরীর বয়েসের ওপর, সেটুকু বিশ্লেষণ করলেই সব রহস্যের কিনারা পাওয়া যাবে। তারপর দেখা যাবে, ভবভূতির পরকীয়া-ভজন কতদূর গড়ায়।

এখন খোদ যিনি, তিনি একটিবার কৃপা করে পশ্চিম ছেড়ে পুবে মুখ ফেরালেই হয়।

ইতিমধ্যে নানা পথ ধরে নানান সংবাদ আসতে লাগল ভবভূতিদের সম্বন্ধে। সবই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। গঙ্গার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় তাঁর কোলে মাথা দিয়ে ভবভূতি শুয়ে ছিল, লেকের ধারের কদম গাছের ছায়ায় তিনি ভবভূতির কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। দক্ষিণ অঞ্চলের অভিজাত কফি-হাউসে বসে তিনি ভবভূতির মুখে কি তুলে দিচ্ছিলেন। আর উত্তরাঞ্চলের খালসা হোটেলে ঢুকে ভবভূতি তাঁর শ্রীমুখে কি গুঁজে দিচ্ছিল। কোন সিনেমায় কবে ওরা কেমন ভাবে হাসতে হাসতে ঢুকেছে ছবি দেখতে, আর কোন থিয়েটার থেকে কবে ওরা কেমন অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়েছে অভিনয় দেখে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনার ফলে অনেকেরই প্রত্যক্ষদর্শী হবার নেশা চেপে গেল। বাসব দত্ত কিন্তু বিশেষ কাবু হল না। ওর সেই এক কথা—"দেখে নিয়ো তোমরা। বাজি আমি জিতবই। হতভাগা ভবভূতিটাকে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দিল বলে।" বাসব দত্ত নিশ্চিন্ত থাকলেও সান্তু মিত্তির নিশ্চিন্ত রইল না। সে আইনের ব[illegible]াটতে লাগল। আফ্‌টার অল্‌ ভবভূতিটাকে উদ্ধার করতে হবে তো।

ধ্রুবজ্যোতিবাবু সাইকো-অ্যানালিসিস্‌ করার জন্যে উঠে-পড়ে

লাগলেন। সাইকো-অ্যান্যালিসিস্ করতে গেলে নাকি নাম জানা প্রয়োজন। ভবভূতির নাম যে ভবভূতি, এ তো তাঁর জানা ছিলই, কিন্তু আর-একটি নামও যে জানা চাই। নামেরও একটা মোহ আছে কিনা। নামের মোহেই পড়ে গেছে নাকি ভবভূতি, এটুকু আগে অ্যান্যালিসিস্ করে দেখা দরকার। কিন্তু নাম জানা যায় কেমন করে!

বাসব দত্ত সে মুশকিলেরও আসান করে ছাড়লে। একদিন ক্লাবে এসে সে ঘোষণা করলে, ভবভূতির পরকীয়ার সঙ্গে পরিচয় করে ফেলেছে। ঘোষণাটি বিনা মেঘে বজ্রাঘাততুল্য মনে হল সকলের কাছে। জাগুয়ার-রায় হাঁকড়ে উঠল—"পরিচয়! মানে—সামনা-সামনি কথাবার্তা! মানে ইন্টিমেসি! মানে—"

বাসব দত্ত তাস শাফল্ করতে করতে বললে—"মানে—একটি পয়লা নম্বরের মেয়ে ইম্‌পস্টার। এই বয়সেই ব্রহ্মচিন্তা করছে। তাঁর সঙ্গে ব্রহ্ম আলোচনা করে খানিকটা সময় খরচ করে এলাম।"

ধ্রুবজ্যোতিবাবু তাড়াতাড়ি পকেট-বই খুলে নোট নিতে লাগলেন।

জাগুয়ার রায় ঠোঁট বিকৃত করে বলল—"ব্রহ্মচিন্তা করছে? চিন্তার খোরাক তো ভবভূতি, ভবভূতিটা কি ব্রহ্ম বনল নাকি?"

পুরকায়স্থ ডান হাতের আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললে—"ব্রহ্মরন্ধ্রের ওপর একটি ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য গাঁট্টা ঝাড়লে ব্রহ্ম বনে যাওয়া ছুটে যাবে।"

সাঁচ্চা বোস বলল—"ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মদত্যি বনে গেছে হতভাগাটা। কিন্তু ব্রহ্মপেত্নীর সঙ্গে যখন মোলাকাত হল তোমার, তখন ব্রহ্মদত্যিটা ছিল কোথা?"

বাসব দত্ত বলল—"তাল বুঝে পাকড়াও করেছিলাম। আন্দাজ করেছিলাম, সকালের দিকে ভবভূতি নিশ্চয়ই সাধুজীর বাড়ি যাবে না। গাড়ি হাঁকিয়ে উপস্থিত হলাম সেদিন সকালে ওই বাড়িতে। গাড়িখানা রাস্তার এধারে রেখে নামতে যাচ্ছি, দেখি, মা-মেয়ে

বেরচ্ছেন। লালপাড় গরদ শুধু পা, এলো চুল দেখে ঠাহর করলাম, নিশ্চয়ই কোথাও পুজোটুজো দিতে চলেছেন ওঁরা। মায়ের পরনে মটকা থান তার ওপর মটকা চাদর জড়ানো। দেখেই এক ঝলক ভক্তি খেলে গেল মগজের মধ্যে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে সেই রাস্তার ওপরেই প্রণাম করলাম।”

“প্রণাম করলে!” ধ্রুবজ্যোতিবাবু আরও উত্তেজিত হয়ে আর-একবার উচ্চারণ করলেন—“প্রণাম করলে!”

সানু মিত্তির চাপা গর্জন করে উঠল—“আঃ, কেন ইণ্টারাপ্ট করছেন? আপনার যদি জেরা করার কিছু থাকে, আপনি চান্স্ পাবেন। হ্যাঁ—বাসব, তুমি প্রণাম করলে রাস্তার ওপর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে। গুড্, তারপর?”

পুরকায়স্থ যেন বিশেষ রকম দমে গিয়েছে। চাপা গলায় বললে —“নিলে তোমার প্রণাম? এই বয়েসেই চরণের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম নেওয়াটা পর্যন্ত বরদাস্ত করে ফেলেছে। উঃ, একটি আস্ত উয়িচ্—”

বাসব দত্ত বলল—“না না, বয়েস নেহাত কম নয়। তা প্রায় আমার মায়ের বয়সীই হবেন—”

জাগুয়ার খেপে আগুন হয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে বলল—“গুল্, স্রেফ গুলমার্গে ঘুরিয়ে মারছে আমাদের বাসব। তোমার মায়ের বয়সী মানে ভবভূতিরও মায়ের বয়সী। তার মানে বলতে চাও, ভবভূতি মায়ের বয়সী একজনের সঙ্গে প্রেম চালাচ্ছে। দেখ বাসব, আর যাই হোক ভবভূতি আমাদের বন্ধু, তার সম্বন্ধে একটা রিমার্ক পাস করার সময়—”

বাসব দত্ত জাগুয়ারের চোখ রাঙানি কেয়ার করল না। ভাল-মানুষের মত বলল—“ভবভূতি প্রেম চালাচ্ছে মেয়ের সঙ্গে, আমি প্রণাম করলাম মেয়ের মাকে। মেয়ের মা আমার মায়ের বয়সী।”

ধ্রুবজ্যোতিবাবু বুকে আটকানো দমটা দমকা ভাবে ছেড়ে দিয়ে উচ্চারণ করলেন—"ওফ্!"

সাঁচ্চা বোস বলল—"যাঃ—বাওয়া! মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে তার বুড়ী মায়ের পা ধরে টানাটানি কেন?"

সান্নু মিত্তির আদালত মার্কা ধমক দিয়ে উঠল—"ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভাবে অনবরত বাধা দেওয়া চলতে থাকলে কোনও মতেই এজাহার নেওয়া সম্ভব হবে না।"

সবাই থামল। ধ্রুবজ্যোতিবাবু আবার নোটবই বাগিয়ে বসলেন। বাসব দত্ত এজাহার দিতে লাগল।

এজাহারের মধ্যে তেমন কিছু মালমসলা পাওয়া গেল না, যা নিয়ে আর্গুমেন্ট করা চলে। গল্পটা খুবই সাদাসিধে ধরনের। প্রণাম করল বাসব দত্ত। মেয়ের মা বললেন—"তোমাকে তো চিনতে পারলাম না বাবা!" বাসব দত্ত সবিনয়ে নিবেদন করল—"আজ্ঞে, আপনি চিনবেন না, উনি চেনেন।" মেয়েটি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বলল—"আমি আপনাকে চিনি!" বাসব দত্ত অমায়িকভাবে বলল—"চেনেন বইকি। তবে মনে রাখতে পারেন নি। সেটা আমার ভাগ্যের দোষ। অত বড় সাধুর কৃপা পেলাম বটে, কিন্তু ভাগ্যটা যে বদলাতে পারলাম না।" মেয়ের মা তটস্থ হয়ে উঠলেন একেবারে। বললেন—"ও, তুমি বুঝি মহারাজের চরণাশ্রিত!, এতক্ষণে বলতে হয়। তা সুধাকে কোথায় দেখেছ?" বাসব দত্ত কৃতার্থতায় জবুথবু হয়ে জবাব দিল—"আজ্ঞে, ওঁকেই এবার জিজ্ঞাসা করুন। এতক্ষণ পরে উনি বোধ হয় চিনতে পেরেছেন। ওঁর চোখ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

মেয়ে আর জবাব দেয় নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। চিনতে না পারার দরুন লজ্জা পেয়েছিল বোধ হয়। তারপর বাসব দত্ত নিজের গাড়িতে মা-মেয়েকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় নির্জলা

ব্রহ্ম আলোচনা হয়েছিল এন্তার। আবার তাঁদের ফিরিয়েও দিয়ে এসেছিল বাড়িতে। ব্যাস্, এইটুকুই বাসব দত্তর এজাহার।

এই এজাহারে কেউই তুষ্ট হল না। তবে নামটা পাওয়া গেল। নামটা তেমন কিছু আহা-মরি গোছের নয়। নেহাতই গরুর গাড়ি মেঠো পথ খড়ের চাল ঘেঁষা নাম। যাক্ গে, নাম নিয়ে আর কে ধুয়ে জল খেতে যাচ্ছে। ধ্রুবজ্যোতিবাবু খুঁতখুত করতে লাগলেন। সুধাময়ী না রানী না মুখী ঠিক জানা গেল না। সাইকো-অ্যান্যালিসিসের জন্যে পুরো নামটা পেলেই তাঁর সুবিধে হত। পুরকায়স্থ থোড়াই ধার ধারে কোনও অ্যান্যালিসিসের। সে বলল—"সুধা নয় জহর। একেবারে অ্যাব্সলিউট্ অ্যাল্কোহল। ওই অমৃত কি হজম করা যায়! বেচারা ভবভূতিটার মতিচ্ছন্ন হয়েছে।"

জাগুয়ার আর পুরকায়স্থ সহজপন্থী, ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারে না ওরা। ভবভূতির ব্যাপারটার জন্যে ওরা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। একটা বন্ধু উচ্ছন্নে যাচ্ছে কোথাকার কে একটা আশ্রমের মেয়ের জন্যে, এটা ওদের বুকে খুবই বেজেছিল। ঝটপট একটা ফয়সালা হয়ে গেলে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। ফয়সালা হয় একবার যদি তিনি এসে উপস্থিত হন, ভবভূতির সুধা যাঁর নিজস্ব সম্পত্তি সেই তিনি। কিন্তু তিনি যে কিছুতে এ-মুখো হচ্ছেন না।

শেষ পর্যন্ত ওরা দু'জনে পরামর্শ করল, এলাহাবাদেই যাবে। এলাহাবাদে গিয়ে সাধু মহারাজকে সব ব্যাপার জানিয়ে তাঁর সহধর্মিণীটিকে সামলাবার কথা বলে আসতে হবে। তাতেও যদি কোনও ফল না হয়, তখন—।

পুরকায়স্থ জাগুয়ারের দিকে তেরছা ভাবে তাকিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

সান্নু মিত্তিরও চোখ মটকাল সাঁচ্চা বোসের দিকে তাকিয়ে। তারপর বাসব দত্ত যখন চলে গেল, তখন খাটো গলায় সাঁচ্চা বোসের কানে কানে বললে—"ব্রীচ্ অফ্ কন্ট্রাক্ট। কিছুতেই

বাসব দত্ত যেতে পারে না ভবভূতি বা ভবভূতির সুধার কাছে। ঘটনাটাকে সেফ্‌লি গড়িয়ে যেতে দিতে হবে। তারপর ওদের বিয়ে হয় বাসব হারবে, না হয় হারবে না। ব্যাস্‌, চুকে গেল। মাঝখান থেকে ও এক পার্টনারের কাছে অ্যাপ্রোচ্‌ করতে যায় কেন? মোটিভ্‌টা কি?"

সাঁচ্চা বোস বল্‌লে—"ভাল নয়। আংটি বোতাম ঘড়ি গাড়ি, থোক অনেকগুলো টাকা যে। সামলাতে চায়, একটা কোনও নটখটি বাধিয়ে দিয়ে বিয়েটা ভেস্তে দিতে পার্‌লে এখন বাঁচে। টাকার অ্যামাউন্টটা বাসবকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

শুধু বাসবকে নয়, সকলকেই ভাবিয়ে তুলল ভবভূতি। সকলেই এক মনে একপ্রাণে কামনা করতে লাগল, ওদের মিলনটা যেন না হয়। বাসব দত্তর আংটি বোতাম ঘড়ি গাড়ি যেন বাসব দত্তর কাছেই থাকে। চুলোয় যাক সে বাজি, এখন একটা ভদ্রলোকের ছেলের জাত কুল মান সম্ভ্রম রক্ষা পেলে হয়। এ হেন উলটো মনোবৃত্তি গজাবার কারণ হল, হঠাৎ ভবভূতির দাদার আবির্ভাব। ভদ্রলোক সেই বোম্বাই না কোথায় ভারী গোছের চাকরি করতেন, আর মাসে মাসে ছোট ভাইকে টাকা পাঠাতেন। এই আশায় পাঠাতেন টাকা যে ছোট ভাই একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠবে থিয়সফির ওপর থিসিস্‌ লিখে। ভাইয়ের কাছে পৌঁছে তিনি টের পেলেন, ভাইয়ের থিসিসের বিষয় থিয়সফি নয়, পরকীয়া তত্ত্ব। ছেলেবেলায় কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্থ করেছিলেন তিনি, পরকীয়া কখনও মুখস্থ করেন নি। ভাবলেন, ওটা বোধ হয় খুবই উচ্চস্তরের কোনও অঙ্কশাস্ত্র। সেই কথাই বললেন ভাইকে। বললেন—"এই বয়েসে আবার অঙ্ক নিয়ে পড়লি। ডোবাবি দেখছি আমাকে। অঙ্কের ওপর থিসিস্‌ লিখতে আবার ক'বছর কাটে দেখ। খরচাপত্র চালান তো চাট্টিখানি কথা নয়। ওধারে পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ে করলেই ভাল

চাকরি করে দেবে শ্বশুরে। ওসব থিসিস্-ফিসিস্ এখন থাক। চল তুই এখন আমার সঙ্গে। বিয়ের পর শ্বশুরের টাকায় কড়াকিয়া পরকীয়া গণ্ডাকিয়া যা খুশি নিয়ে থিসিস্ লিখিস। আমি আপত্তি করব না।" দাদার অভিমত দাদা বললেন। ভাই চলল ভাইয়ের পথে। অঙ্কশাস্ত্রে দাদার বিতৃষ্ণা জেনেই বোধ হয় বেমালুম অন্তর্ধান করল ভাইটি। দাদা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ফাঁপরে পড়ে ভাইয়ের বন্ধুদের শরণাপন্ন হলেন। তারপর যখন ধ্রুবজ্যোতিবাবু কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া আর পরকীয়ার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন দাদাকে, তখন তিনি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। "কি! এত বড় আস্পর্ধা! আমার ভাই আমাকে না জানিয়ে পরকীয়া চালাচ্ছে! কেন, আমি কি মরে গেছি যে আমার সঙ্গে পরামর্শ করারও দরকার মনে করলে না! নেহি চলেঙ্গা ওসব চালাকি। যদি লাগে, ওরকম দশ গণ্ডা পরকীয়া আমি জুটিয়ে দোব। আমার নাম সত্যভূতি সোম। আমি কথা দিয়েছি পাত্রীপক্ষকে, আমার কথা মিথ্যে হতে পারে না। আগে করুক বিয়ে, তারপর পরকীয়া পাকড়ানো যাবে।"

ছোট ভাই ভবভূতি বড় ভাই সত্যভূতির সত্য বাক্য শুনতে পেল না। কোথায় যে রইল ঘাপটি মেরে, তা কেউ জানতেই পারল না। মোটা হাতে খরচা করতে লাগলেন ভবভূতির দাদা, পুলিস আইন আদালত খবরের কাগজ, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ভাইটিকে নিয়ে তিনি সরে পড়বেন। কাকে-বকে টের পাবে না, কোনও কেলেঙ্কারি হবে না। যে রকম ইঁচড়ে-পাকা একগুঁয়ে ভাই তাঁর, নিজেই হয়ত একটা বদখত কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। এদিকটাও সামলাতে হবে। সাপও মরে, লাঠিও আস্ত থাকে, এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করা চাই। অর্থাৎ কিনা, সুধা যাতে ভবভূতির কাছে গরল হয়ে দাঁড়ায়, সেইটুকু ব্যবস্থা করতে পারলেই হল।

উপায় উদ্ভাবন করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল জাগুয়ার

আর পুরকায়স্থ। সাঁচ্চা বোস আর সান্নু মিত্তির বাঘা-বাঘা উকিল-বাড়ি টহল দিতে লাগল। শুধু বাসব দত্ত ও ব্যাপারে একদম গরজ দেখাল না। বললে—"কেন খামকা তোলপাড় করছ ত্নিয়াখানাকে। বলছি, ওদের বিয়ে-ফিয়ে হবে না। ভবভূতিটা সটকেছে, ও আর এ-মুখো হবে না। যদি কখনও ফেরেও ভবভূতি, তাহলেও শ্রীমতী তার ছায়া মাড়াবে না। বিশ্বাস করছ না কেউ আমার কথা? আচ্ছা বেশ, আরও কিছু বেশী ধরে দিচ্ছি। আমার লাইফ ইন্‌সিওরের পলিসিগুলো—"

কেউই কান দিলে না বাসব দত্তর কথায়। জান মান নিয়ে টানাটানি চলছে একটা ভদ্রলোকের ছেলের, এ সময় কে যায় শুনতে বাসব দত্তর বারফট্টাই।

বাসব দত্ত নিজেও তফাতে রইল। ভবভূতির ব্যাপারটা যেন ভুলেই গেল একেবারে। ভয়ানক অমানুষিক ব্যবহার। জাগুয়ার পুরকায়স্থকে বলল—"যাকে বলে বীস্ট্‌লি তাই। টাকা আছে, বাজি রেখেছিস। হয় জিতবি নয় হারবি। তা বলে অমন বীস্ট্‌লি ব্যবহার করবি? ভবভূতিটা যে কোথায় লোপাট হল, তা নিয়েও একটু মাথা ঘামাবি না?

পুরকায়স্থ বলল—"দেখাচ্ছি মজা। ভবভূতিকে না পাওয়া গেলে থানা-পুলিস পর্যন্ত গড়াবেই। বাজি ধরেছে বাসব দত্ত, বাজি জেতবার জন্যে ভবভূতিকে কোথাও গুম করেছে কি না—"

জাগুয়ার বললে—"রাইট্! ঘুঘুই দেখেছে বাছাধন, ফাঁদ কাকে বলে জানে না।"

সংক্ষেপে পুরকায়স্থ মন্তব্য করল—"এবার জানবে।"

ভবভূতির দাদা সত্যভূতিবাবু বেশী জানাজানি হবার ভয়ে তল্পি গোটালেন। আফিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল, আর অপেক্ষা করা সম্ভব হল না তাঁর। যাবার সময় সরোষে ঘোষণা করে গেলেন, তাঁর

ভাই নেই। কস্মিনকালে ছিলও না। ভবভূতি যেন কারও কাছে তার দাদার পরিচয় না দেয়।

মর্মে মর্মে অনুভব করল সকলে দাদার মর্মবেদনা। কিন্তু উপায় কি! ভবভূতির টিকির ডগাও কেউ ছুঁতে পারল না। লোকটা যেন রকেটে চেপে মহাশূন্যে পাড়ি জমালে। ভবভূতির সুধা রইলেন মর্ত্যধামেই। তাঁর ওপর নজর রাখা হল। সন্দেহজনক কিছুই বোঝা গেল না। দিব্যি হাসিখুশিতে আছে, খাচ্ছে ঘুমচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখেমুখে লেশমাত্র বিষাদের ছায়া নেই। যেন কিছুই হয় নি।

রিপোর্ট শুনে ধ্রুবজ্যোতিবাবু খুব শক্ত একটা সাইকলজির সূত্র আওড়ালেন। ফ্রিজিডিটি পার্ভারশন্ পিউরিট্যানিজম্ ইত্যাদি দুর্বোধ্য কতকগুলো কথা আওড়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, ব্যাপারটা যে এই রকমই দাঁড়াবে, তা তিনি জানতেন। ভবভূতির মত মানুষে সহ্য করতে পারবে কেন ওকে। একটা টেম্পর‍্যারি ইন্‌স্যানিটিও বলা যায় ভবভূতির কেসটাকে। সামলে নিয়েছে, এবার ঠিক সেই আগের ভবভূতি হয়ে ফিরে আসবে।

ধ্রুবজ্যোতিবাবুর কথাটা ষোলআনা বিশ্বাস না করলেও দশ আনা ছ' আনা আন্দাজ বিশ্বাস করল সকলেই। এমন কি বাসব দত্ত পর্যন্ত তর্ক করলে না। তারপর আশায় আশায় দিন কাটতে লাগল। ফিরে না এলেও সংবাদ তো একটা দেবেই ভবভূতি, কোথায় আছে, কি করছে।

সংবাদ এল খবরের কাগজ মারফত। ভবভূতির নয়, সাধু মহারাজের। বড় বড় সাধু মহারাজরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন না দিয়ে মোটে চলাফেরা করেন না। সেই সূত্রেই সংবাদ পাওয়া গেল, কবে কখন সাধুজী শুভাগমন করছেন নগরীতে, কোন কোন ভাগ্যবান ভাগ্যবতীর বাড়িতে অবস্থান করে ভক্তজনকে দর্শন ও বাণী দান করবেন। সংবাদ পড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল সবাই, এইবার একটা

হেস্তনেস্ত হবেই। সাধু মহারাজ যখন আসছেন, তখন ভবভূতিও নিশ্চয়ই আসছে। এমনও হতে পারে, সাধুজীর সঙ্গে সঙ্গেই আছে সে। যাই হোক, আগে সাধু দর্শন তো হোক, সেই সুকৃতির বলে ভবভূতি দর্শন হবেই।

সাধু দর্শনের জন্যে তোড়জোড় চলতে লাগল। বড়মানুষের দরজায় হত্যা না দিয়ে সহজে কোথায় সাধু দর্শন করা সম্ভব, সেই খোঁজ নেওয়া হতে লাগল। নিভৃতে দর্শন পাওয়া চাই। মহারাজকে বলে-কয়ে বুঝিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হবে। হয় তিনি মানে মানে সামলান তাঁর বিবাহিতা পত্নীকে, নয়ত—

জাগুয়ার আর পুরকায়স্থ রয়েছে যখন, তখন ভাবনা কি।

অবশেষে সংবাদ পাওয়া গেল, ঢাকুরের পেছন দিকে মস্ত এক বাগানবাড়িতে সাধুজী দিন দু'য়েকের জন্যে নির্জন বাস করতে চলেছেন। সান্নু মিত্তির বলল—"এই মওকা ছাড়া যায় না।" সাঁচ্চা বোস সায় দিল। তারপর প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হল।

বাসব দত্তর গাড়ি যাবে। গাড়িখানা ছোট। ঢাকুরের রেল-গেট ছাড়িয়ে আরও মাইলখানেক যেতে হবে কাঁচা রাস্তায়। ও রাস্তায় বড় গাড়ি নিয়ে গেলে আতান্তরে পড়ার ভয়। কিন্তু বাসব দত্ত কি রাজী হবে যেতে!

সাঁচ্চা বোস বলল—"আলবত হবে। কেন—হলটা কি ওর? সাপের পাঁচ ঠ্যাং দেখেছে নাকি? আমাদের বাদ দিয়ে ও বাঁচতে পারবে?"

বাসব দত্তকে গাড়ির কথা বলা হল। বাসব দত্ত ছুটল ফুল কিনতে। বলল—"শুধু হাতে যেতে আছে নাকি সাধু দর্শনে? ফুল মালা মিষ্টি নিতে হবে না?"

ওর উৎসাহের বহর দেখে নেপথ্যে পুরকায়স্থ জাগুয়ারকে বলল—"হাম্বাগ্। সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

জাগুয়ার বলল—"বাজি হারলে তো বিস্তর খেসারত। খেসারতের

হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে বলে কিছু খরচা করছে, করতে দাও না। দুর্জনের কিঞ্চিৎ ধনক্ষয় হোক।”

নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে রওনা হল সকলে। ধ্রুবজ্যোতিবাবু গেলেন না। তাঁর মতে সাধু মাত্রেই পার্ভার্ট্। পার্ভার্ট্ না হলে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে আজগুবী কাণ্ডকারখানা নিয়ে মেতে থাকে কেন।

বাসব দত্তর গাড়ি, নিজেই ও চালায়। সানু মিত্তির ঢাকুরে অঞ্চল বেশ ভাল করে চেনে। সে বসল বাসব দত্তর পাশে, রাস্তা বাতলাবে। পেছনে বসল জাগুয়ার, পুরকায়স্থ আর সাঁচ্চা বোস। সাধুজীর কাছে পৌঁছেও পেছনে থাকবে ওরা, টুঁ শব্দটি করবে না। বলা-কওয়ার যা, তা সানু মিত্তিরই সারবে। আইন বাঁচিয়ে কথা বলতে হবে তো। বাসবও টিপ্পনী কাটতে পারবে না। দরকারই বা কি হুজ্জত বাড়িয়ে। দম দিয়ে কার্যোদ্ধার করা চাই। কোথায় আছে ভবভূতি, সেটুকু জানতে পারলেই হল। সেইটুকুই আসল কাজ, তারপর কথায় কথায় সাধুজীকে জানিয়ে দেওয়া যে তাঁর ধর্মপত্নীকে তিনি সামলান। নয়ত কেলেঙ্কারি বাড়বে বই কমবে না। এইটুকু নিবেদন করতে গেলে যদি হাঙ্গামা বাধে, তা হলে পেছনে তো জাগুয়ার আর পুরকায়স্থ রইলই। ভাবনা কি!

ভাবনা শুধু গাড়িখানা নিয়ে। ওখানা রেল-গেটের ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে না। তেমন যদি কিছু ঘটেই বসে, তাহলে দু'খানা করে পা তো সঙ্গেই রইল প্রত্যেকের। চরণের সাহায্যে কাঁচা রাস্তাটা টপকে এসে গাড়িতে উঠতে পারলেই হল। কিন্তু গাড়ি যদি রেল-গেটের ওধারে থাকে, আর ঠিক সময় যদি গেটটি ফেলে দেয়, তাহলেই চিত্তির। হাড়গোড় চূর্ণ তো হবেই পাড়ার লোকের হাতে, গাড়িখানাও আস্ত থাকবে না। গাড়ি জ্বালানো আবার ফ্যাশান হয়েছে আজকাল। সুতরাং তরণীখানি তৈরী হয়ে থাকুক। দরকার কি তরণীসুদ্ধ দয়ে নামবার!

তরণী তৈরী হয়ে রইল। সুধা-সমুদ্র থেকে বন্ধু ভবভূতিকে উদ্ধার করার সৎসংকল্পে চিত্ত পূর্ণ করে এগিয়ে চলল পাঁচজন রেল-গেট পার হয়ে। কাঁচা রাস্তাটাও ফুরিয়ে গেল। তারপর শুরু হল জঙ্গল। হাঁ, জঙ্গলই বলা চলে ওদিকটাকে। রাত্রে অন্তত জঙ্গল ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না। তেলের·আলো টিমটিম করছে, একটা এখানে আর একটা সেই সেখানে। স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না চোখে। নাকে উৎকট পচা গন্ধ পাওয়া যায়। আর কানে শোনা যায় মশাদের ঐকতান। মাঝে মাঝে হু'একখানি বাড়ি। বন্ধ দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে একটু-আধটু আলো পিছলে এসে পড়েছে পথের ওপর। তার ফলে বিচিত্র সব আঁকাবাঁকা রেখার সৃষ্টি হয়েছে। বেশ রহস্যময় স্থানটি, নিভৃতে সাধনভজনের পক্ষে খুবই অনুকূল। ওদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যেও বেশ জুতসই জায়গা। শহরের ভেতর সাধু দর্শন, কেমন যেন তেমন জমে না। সাধুরা থাকবেন পাহাড়ে জঙ্গলে, কাঠ খড় পুড়িয়ে সেখানে পৌঁছতে না পারলে কৃপা লাভ করা যাবে না, এই রকমটি না হলে কি জমে! তা ছাড়া শহরের মধ্যে পাড়ার ভেতর সাধুকে কাবু করতে যাওয়া দস্তুরমত ঝুঁকির কাজ। গোলমাল হলেই পাড়াসুদ্ধ মানুষ যদি তেড়ে বেরয়!

অবশেষে পৌঁছল ওরা বাগানবাড়ির গেটে। নিখুঁত নির্দেশ নিয়ে গিয়েছিল, বাড়িটি চিনে নিতে এতটুকু কষ্ট হল না। কিন্তু প্রত্যেকেরই বুকের ভেতরটা একটু কেমন কেঁপে উঠল। খুবই স্বাভাবিক কাঁপা, চেনা নেই জানা নেই, গেরুয়াধারী হুশো চারশো বছরের এক সাধুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কাজটা তো নেহাত সুবিধের কাজ নয়। ভাল কথায় কার্যোদ্ধার না হয়, চোখ লাল করতেই হবে। তারপর যা থাকে বরাতে, ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে।

ক্ষেত্রের কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হল সবাইকে। বাড়ির ভেতর থেকে উলুধ্বনি উঠছে। তার সঙ্গে বাজছে শাঁখ। এ আবার কি ব্যাপার!

ফিসফিস করে সান্নু মিত্তির বললে—"মহারাজের আরতি হচ্ছে বোধ হয়। আজকাল রক্তমাংসওয়ালা মানুষ-দেবতাদেরও আরতি হয়। যাই হোক গে, থামলে চলবে না। সাধু দর্শনটা তো হোক আগে। তারপর সুবিধে বুঝে আসল কথাটা পাড়া যাবে।"

গেট পার হয়ে বাগান শেষ করে বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠে দাঁড়াল পাঁচজন। সামনের দরজাটা খোলা হা হা করছে।

একটিও প্রাণী নেই সেখানে, ভেতরে ঢুকতে বাধা ঘটল না। সামনের ঘরেও কেউ নেই, একটা ঝুলন্ত আলো জ্বলছে। সেখানা পার হয়ে পৌঁছল গিয়ে ভিতরের দালানে। দালান থেকে নজর পড়ল উঠনের ওপর। গোটা আষ্টেক গ্যাসবাতি জ্বলছে উঠনে। স্পষ্ট পরিষ্কার সব কিছুই দেখা যেতে লাগল।

উঠন-জোড়া চন্দ্রাতপ খাটানো হয়েছে। ঠিক মাঝখানে লতা পাতা ফুল দিয়ে চমৎকার একটি কুঞ্জ রচনা করা হয়েছে। কুঞ্জের মাঝখানে আগুন জ্বলছে। গাওয়া-ঘি-পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। হোম হচ্ছে, হোমের গন্ধ নাকে যাওয়ায় মেজাজগুলো একটু অন্য রকম হয়ে গেল সকলের। হতেই হবে যে, হাজার হোক পাঁচজনেই হিন্দুসন্তান তো বটে।

ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার জন্যে হিন্দুসন্তানরা নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। আগুন জ্বলছে, হোম হচ্ছে। আগুনের ধারে টোপর মাথায় দিয়ে ও কে বসে আছে! আর ওর পাশে রক্তবর্ণ-বেনারসী-পরা যে বসেছে কপালে সিঁথিমউড় ঝুলিয়ে, ওঁর নামটিই বা কি! আ রে, ঘটছে কি ব্যাপারখানা এখানে!

বাসব দত্ত আর সাঁচ্চা বোস উত্তেজনার চোটে দালান থেকে নেমেই পড়ল উঠনে। নামতেই তাদের কানে গেল খনখনে গলার আওয়াজ। পুরুত ঠাকুর মন্ত্র পড়াতে শুরু করলেন।

"বলুন—প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ।"

টোপর মাথায় বর একটু কম চেঁচিয়ে মন্ত্রটি আওড়ালেন। বাসব দত্ত চিনে ফেললে গলা, চেনবার ফলে হুঁশই হারিয়ে ফেললে। কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, খেয়াল না করে সোজা সে এগিয়ে গেল বরের দিকে। ইতিমধ্যে আবার মন্ত্র পড়ানো শুরু হল।

"বলুন—ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী—"

বরও আরম্ভ করল—"ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা—"

পৃথিবী পর্যন্ত বরকে আর পৌঁছতে হল না। তার আগেই বজ্রাঘাততুল্য একটা আওয়াজ হল—"শাট্ আপ্, ইউ স্কাউণ্ড্রেল—" লাফিয়ে পড়ল সাঁচ্চা বরের পাশে।

বাসব দত্ত ছিটকে পড়ল এক ধারে সাঁচ্চা বোসের ধাক্কার চোটে। সাঁচ্চা বোস এক হেঁচকায় বরের মাথা থেকে টোপরটা তুলে নিলে।

চুপ।

যাকে বলে নীরব নিথর নিস্পন্দ নিষ্ক্রিয়, তাই হয়ে গেল উঠন-স্ুদ্ধ মানুষ। সকলের সব ক'জোড়া চক্ষু স্থির হয়ে রইল সাঁচ্চা বোস আর বাসব দত্তর দিকে। কাটল একটু সময় সেইভাবে। তারপর বরটি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ একটু লজ্জা পাওয়ার ভাব ফুটে উঠল বরের গলায়, যেন বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে— "আরে, এসে পড়েছ যে দেখছি তোমরা! বেশ করেছ ভাই, বেশ করেছ এসে। নানান হাঙ্গামায় তোমাদের খবরটাই দিতে পারলাম না। নেমন্তন্নের চিঠি ছাপাতে দিয়ে—"

"প্রেস থেকে নিয়ে আসবার সময় পাও নি।" ভেংচে উঠল সাঁচ্চা বোস সুর করে।

দালানের ওপর থেকে আস্তিন গোটাতে গোটাতে পুরকায়স্থ বলে উঠল—"শেম্লেস্ স্টুপিড্ ধড়িবাজের ধাড়ী। এই বিয়েতে তুমি

আমাদের নেমন্তন্ন করতে আর আমরা সুড়সুড় করে এসে উপস্থিত হতাম—না ?”

থতমত খেয়ে গেল বর। আমতা আমতা করে বললে—“তোমরা —মানে—তোমাদের যে কি মতলব—”

বাসব দত্ত সামলে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। হঠাৎ তার ইমোশন্ এসে গেল। থিয়েটারের সিরাজদ্দৌল্লা ঢঙে কনের দিকে একখানা হাত সোজা করে বাড়িয়ে ধরে সে বলতে লাগল—“জান না, জান না ভবভূতি, জান না কি আজ করতে বসেছিলে তুমি। ওই নারী, ওই যে বসে আছে মাথায় সিঁথিমউড় ঝুলিয়ে, ও জানে। ভাল করে জানে ওই নারী, কি জালে জড়াচ্ছে তোমায় ও। ওই নারী, ওর কাছে বিয়েটা নতুন ব্যাপার নয়। কতবার কত লোককে যে উনি মজিয়েছেন এই ভাবে, তা ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর। তুমি ভবভূতি—তুমি একটি আস্ত ইয়ে। হায় বন্ধু, কে বাঁচাবে তোমায় ওই নারীর খপ্পর থেকে।”

বাসব দত্তর বলাটা এমনই উতরে গেল যে, সানু মিত্তির আর পুরকায়স্থ হাততালি দিয়ে উঠল।

হাততালি থামবার আগেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কনে, ধীরে-সুস্থে সিঁথিমউড় খুলে ফেললে কপাল থেকে। তাড়াতাড়ি ভবভূতি হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে নিলে। তারপর কনে মুখ তুলে তাকাল একবার চতুর্দিকে। সাঁচ্চার মুখের ওপর চোখ ছুটি রেখে খুবই ঠাণ্ডা গলায় বলল—“তা বেশ তো। আপনারা চটাচটি করছেন কেন অনর্থক। নিয়ে যান না আপনাদের বন্ধুকে রাজী করিয়ে। আমি না হয় এ বিয়েটাকে বিয়ে নয় বলেই ধরে নোব।”

সুরটা যেমন হালকা তেমনি বাঁকা। সত্যিই অমন সুর শুনলে মানুষের পিত্তি জ্বলে ওঠে। সাঁচ্চা বোস ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। কনের মত বাঁকা সুরে বলে উঠল—“পারেন, তা যে আপনি পারেন, একশো বার মানছি। সে ক্ষমতা না থাকলে সিঁথিতে সিঁদুর পরে ভদ্রলোকের ছেলেদের মাথা চিবিয়ে বেড়াতে যাবেন কেন।”

সাঁচ্চা বোস হয়ত আরও কিছু বলত, বাধা পড়ল। এতক্ষণ বিয়েবাড়ির লোকেরা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে ছিলেন। অভাবনীয় অকল্পনীয় উৎপাতের আবির্ভাবে দারুণভাবে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন সবাই। এবার তাঁরা ফুঁসে উঠলেন। চারিদিক থেকে গর্জন উঠল : "মুখ সামলে কথা বল বলছি। ধর সব কটাকে। মার ব্যাটাদের। আচ্ছা করে দাও ধোলাই। ইতরামি করার আর জায়গা পায় নি। আস্পর্ধা দেখ শালাদের।"

বাধল কেলেঙ্কারি। ভাল ভাল শাড়ি-গয়না পরে মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল যেধারে, সেধার থেকে কান্নার রোল উঠল। ভবভূতি বেচারা ভেঙে পড়ল পিঁড়ির ওপর, পা দুটো যেন তার দুমড়ে গেল। কনেটি কিন্তু এতটুকু টলল না। একটানে ঘোমটা খুলে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ফেললে।

সেই প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে সান্নু মিত্তির দালানের কিনারায় এগিয়ে এল। চশমাটা ঠিক করে নিয়ে দু'হাত জোড় করে পাকা সভাপতির কায়দায় বক্তৃতা জুড়ে দিলে।

"সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ এবং পরমপূজ্য সাধু মহারাজ—আজ আমরা এখানে যে উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি—"

ওধার থেকে প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট পরা এক ছোকরা লাফিয়ে উঠল—"বার করে দিচ্ছি উদ্দেশ্য—"

সান্নু মিত্তির গ্রাহ্যও করলে না ছোকরাকে, অকম্পিত কণ্ঠে চালাতে লাগল তার বক্তৃতা।

"সে উদ্দেশ্য সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে এবং পূজ্যপাদ সাধু মহারাজের শ্রীচরণে নিবেদন করা আমাদের কর্তব্য ছিল।"

মোটামত একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক গদগদ কণ্ঠে বললেন— "আহা-হা, আমাদের কাছে কেন, আমাদের কাছে কেন, বাবা অন্তর্যামী, বাবার কাছেই মনে মনে নিবেদন করলে হত।"

সান্নু মিত্তির টপ্ করে ধরে নিলে ভদ্রলোকের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে

তার গলার স্বরে যেন শ্রাবণের মেঘ নেমে এল। ভক্তিরসে জবজব হয়ে সে বলতে লাগল—"ওঁর কাছেই তো আমরা এসেছি। ওঁর দর্শন লাভ করব, ওঁর কৃপা লাভ করব, এই বাসনা একান্ত মনে আমরা নিবেদন করেছিলাম ওঁর শ্রীচরণে, তাই তো এবার কৃপা করে উনি কলকাতায় পায়ের ধুলো দিলেন।"

ব্যাস্—আর যাবে কোথা। ওধার থেকে কে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সনিঃশ্বাসে—"ও হো হো হো—" বলে উঠল কে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছ'হাত মাথার ওপর তুলে—"এসেছে, এসেছে রে" সুর তুলে প্রায় নৃত্য জুড়ে দিলেন।

উঠনের পেছন দিকে ছোট্ট একখানি চৌকির ওপর অতি সুদৃশ্য আসনে বসে ছিলেন উনি, মানে—সাধু মহারাজ। একরাশ মালায় প্রায় ঢেকে গিয়েছিল তাঁর শ্রীঅঙ্গ, শুধু মুখখানি জেগে ছিল ফুলের গাদার ওপরে। অতি অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ, প্রমাণ সাইজের মানুষ দাঁড়ালে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছিল তাঁকে বসা অবস্থাতেই। শ্রীমুখখানি দেখলে বোঝবার উপায় নেই কত বয়েস তাঁর, ছশো চারশো বছর না হলেও বয়েস যে যথেষ্ট হয়েছিল তা কিন্তু বোঝা যায়। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে ছিলেন তিনি। এবার অল্প একটু নড়ে উঠলেন। ফুলের স্তূপের ভেতর থেকে একখানি হাত বার করে অভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরে অতি চমৎকার সুরে বলতে লাগলেন—

"ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্না সুনৃতেনার্জ্জবেন চ
বশী কুর্য্যাৎ জগৎ সর্ব্বং বিনয়েন চ সেবয়া।"

অর্থাৎ ক্ষমা দয়া প্রেম সত্য সরলতা বিনয় সেবা, এর দ্বারা বিশ্বসংসার বশীভূত হয়।

সান্নু মিত্তির তৎক্ষণাৎ আবার শুরু করল বক্তৃতা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল—"শ্রীমুখের বাণী আপনারা পেলেন। এখন

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার যা নিবেদন করার করছি। আমার বন্ধুরা হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। সর্বাগ্রে সেজন্যে আমি আমাদের পক্ষ থেকে অকপটে মার্জনা চাইছি। ওই উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণটুকু আপনাদের কাছে জানাতে পারলেই আমার বক্তব্য শেষ হবে। ওই যে বরটি, ওই ভবভূতি সোম, ও আমাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। হঠাৎ ও ফেরার হয়ে গেল। ওর দাদা সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। ওর জন্যে পাত্রী ঠিক করে তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন পাত্রীপক্ষকে। ওই ভবভূতি, এত বড় অমানুষ ওই ভবভূতি যে ওর দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে হল। এধারে তলে তলে এখানে যে এই কাণ্ড হচ্ছে, তা আমরা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারি নি। এখানে এসে হঠাৎ এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখে আমার বন্ধুরা একটু উত্তেজিত—"

বর ভবভূতি মুখ নিচু করে বসে ছিল। মুখ তুলে সানু মিত্তিরের দিকে তাকিয়ে খুবই বুক-ভাঙা সুরে বলল—"দাদার জন্যেই তো এভাবে বিয়েটা করতে হচ্ছে আমাকে। দাদা চান, দাদার কে এক দূর সম্পর্কের শালী আছে, তাকে আমি বিয়ে করি। সেই শালীর বাবা নাকি দাদার আফিসের বড়কর্তা। বড়কর্তার মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে দিতে পারলে দাদার চাকরির আরও উন্নতি হবে। কিন্তু আমি কেন—"

আর বলতে পারল না ভবভূতি, ক্ষোভে দুঃখে তার গলা বুজে গেল।

পিরামিড পুরকায়স্থর চেহারাটা পিরামিডের মত হলে হবে কি, প্রাণটা বেচারার তুলতুলে গোছের। ভবভূতির অবস্থাটা জেনে ভিজে গেল পুরকায়স্থ। গভীর গর্জন করে উঠল—"সার্ট্‌ন্‌লি নট্‌। দাদার চাকরির উন্নতির জন্যে দাদার শালীকে বিয়ে করতে বাধ্য নয় কেউ। কিন্তু মেয়ে কি আর মিলত না নাকি দুনিয়ায়? তোমার মত ছেলের কি পাত্রী জুটত না যে ওঁকে বিয়ে করতে বসেছ? আইবুড়ো মেয়ের

কি অভাব পড়ে গেছে নাকি দেশে ? মানুষে আইবুড়ো বিয়ে করে না বিয়ে-হয়ে-যাওয়া মেয়ে বিয়ে করে, তাই আমরা শুনতে চাই।”

“বিয়ে-হয়ে-যাওয়া মেয়ে!” অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠে একযোগে ফুটে উঠল আকাশ-থেকে-পড়া গোছের স্বর—“বিয়ে-হয়ে যাওয়া-মেয়ে! কি সর্বনাশ!”

হঠাৎ হো-হো শব্দে হাসি জুড়ে দিলেন সাধু মহারাজ। হাসির মত হাসি, হাসির তোড়ে সকলেই বেশ হতভম্ব হয়ে গেল। হাসি থামতে বেশ একটু সময় লাগল। তারপর তিনি কনের দিকে তাকিয়ে বললেন—“ওই কথা তো আমিও লিখে পাঠিয়েছিলাম, বিয়ে-হওয়া মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে গণ্ডগোল বাধবেই। তা কেউ কি বুড়ো মানুষের কথাটা মানলে!”

কোমর-বাঁধা কনে ঝংকার দিয়ে উঠল—“সেই কুড়ি বছর আগেকার বিয়ে কবে পচে গেছে। সেই বিয়ে আবার বিয়ে নাকি ? বেশ তো, সেই বিয়ের জন্যে এ বিয়ে যদি নাকচ হয়, বেশ তো। নিয়ে যান ওঁরা ওঁদের বন্ধুকে। কে যাচ্ছে বাধা দিতে ?”

দস্তুরমত গোলমেলে ব্যাপার। মস্ত বড় একটা রহস্য রয়েছে যেন ভেতরে। সাধু মহারাজের অনাবিল হাসি, নেহাত বে-শরম কনেটির কাটা ছেঁড়া অভিমত, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়া-গণের চাপা হাসি আর চাপা ইঙ্গিত, সবই যেন উলটো একটা কিছু প্রকাশ করছে। কিন্তু কি সেই ব্যাপারটি ?

গেঁয়ো ইয়ার্কি শুনলে পিত্তি জ্বলে ওঠে সাঁচ্চার। বরকনের সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বিকট ভঙ্গিমা করে কনেকেই বলতে লাগল—“কুড়ি বছর আগেকার বিয়েটা পচে গেছে ? তা হলে এই বিয়েটি আবার ক’বছর বাদে পচে যাবে, সেটুকু দয়া করে জানাবেন কি ?”

দালানের ওপর থেকে জাগুয়ার হাঁকার দিয়ে উঠল—“শুনলি

ভবভূতি? নিজের কানে শুনলি তো সব? উঠে আয় বলছি, এখনও উঠে আয় ওখানে থেকে। নামতে যদি হয় আমাকে উঠনে, তা হলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে গাঙায় চুবিয়ে মারব।"

থান-পরা এক ভদ্রমহিলা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ধারে। মুখ তুলে খুবই করুণ কণ্ঠে ভিক্ষে চাওয়ার মত সুর করে বললেন—"অনর্থক তোমরা রাগারাগি করছ বাবারা। কোনও কালে ওই মেয়ের বিয়ে হয় নি। হয়েছিল একটা উদ্ভট কাণ্ড। ভবভূতির বাবা আর সুধার বাবা দু'জনে গুরুভাই ছিলেন। এই মহাপুরুষের কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন দু'জনে। ভয়ানক বন্ধুত্ব ছিল দু'জনের মধ্যে। ওই ভবভূতির যখন আট বছর বয়েস তখন সুধা জন্মাল। সেই বছরই ভবভূতির খুব অসুখ করে। মস্ত বড় ফাঁড়া ছিল। মহাপুরুষ আদেশ দিলেন, এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও যার বৈধব্যযোগ নেই। আট বছরের ছেলের জন্যে পাত্রী পাওয়া যাবে কোথা। তখন মহাপুরুষই আদেশ দিলেন, ওই এক বছরের মেয়েটার সঙ্গেই বিয়ে দাও। ওঁর আদেশ অমান্য করবে কে। তখন সেই এক বছরের মেয়েটাকেই সাতপাক ঘুরিয়ে দেওয়া হল। আর মেয়েটা আমার ভয়ানক ফাজিল। শুধু শুধু মানুষকে খেপাবার জন্যে ও সিঁদুর পরে বেড়াত।"

"শুধু শুধু! শুধু শুধু কি রকম!" সাধু মহারাজ কপট ক্রোধে ফেটে পড়লেন একেবারে। সদানন্দ পুরুষের গলায় রাগটুকুও যেন হাসিতে ভেজানো বলে মনে হল। চোখ বড় বড় করে বলতে লাগলেন তিনি—"মোটেই শুধু শুধু নয়। তাহলে আমি কি হিসেব থেকে বাদ পড়ে গেলাম নাকি! দেশসুদ্ধ মানুষে জানে, আমার ওই পরিবারটিকে কলকাতার বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে আমি এই বয়েসেও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরছি। এটাও কি তাহলে শুধু শুধু? ওই দজ্জাল পরিবার আমার এই বুড়ো ঘাড় ছেড়ে যদি আর কারও ঘাড়ে চাপেন, তাহলে

হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। যা হোক, একটু আশা হয়েছিল এতদিনে, তা বাবাজীরা বাগড়া দিতে এলেন কোথা থেকে। কপাল আর কাকে বলে!"

বাসব দত্ত চুপ করে শুনছিল সব। আর চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে। ওপর দিকে ডান হাতখানা তুলে বলে উঠল—"আঃ, রাবিশ, রাবিশ। কোন যুগে বাস করছি আমরা! এই সমস্ত ছেলে-ভুলনো ছড়া আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? এই সমস্ত চাষাড়ে রসিকতা, একটা বিশ-বাইশ বছরের ভদ্রমহিলাকে নিজের পরিবার বলে রসিকতা করা, এই সব নোংরামি অজ পাড়াগাঁয়েও আজকাল চলে না। আর ভবভূতির সেই আট বছর বয়েসের ফাঁড়া কাটাবার জন্যে বিয়েটা—ছোঃ—। চল হে মিত্তির, যথেষ্ট হয়েছে। ইন্‌টলারেবল্—অসহ্য ন্যাকামি, উঃ।"

বাসব দত্ত যথেষ্ট ঘৃণা প্রকাশ করবার জন্যে মাথায় কাঁধে যথেষ্ট পরিমাণ ঝাঁকানি দিয়ে পেছন ফিরল।

সঙ্গে সঙ্গে কনের তীব্র স্বর শোনা গেল—"বাসববাবু।"

ভবভূতি উঠে দাঁড়াল ঝট্ করে। তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল—"আঃ, যেতে দাও না। তুমি আবার—"

সান্নু মিত্তির দালানের ওপর থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—"বাসবের আর্গুমেণ্ট তো ঠেলে রেখে দেওয়া যায় না। ভবভূতির আট বছর বয়েসের ঘটনাকে এস্ট্যাব্লিশ করার জন্যে উপযুক্ত এভিডেন্স কিছু না পাওয়া পর্যন্ত—মানে—মনে করবেন না কিছু আপনারা। ব্যাপারটা এতখানিই অবিশ্বাস্য যে—তাছাড়া ভবভূতির দাদা সত্যভূতি-বাবুর নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটা জানা উচিত ছিল। জেনেশুনে তিনি আবার ভাইয়ের বিয়ে ঠিক করতে গেলেন কেন?"

তাড়াতাড়ি কনের মা এগিয়ে এলেন—"এই যে বাবা, সত্যর নিজের হাতে লেখা চিঠি রয়েছে আমার কাছে। আজই পেলাম চিঠিখানা। এনে দিচ্ছি, পড়ে দেখ তোমরা। সত্য সব জানে, সে

আমায় শাসিয়ে চিঠি দিয়েছে যে, এ বিয়ে হলে সে আর ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবে না।"

দৃঢ় কণ্ঠে ভবভূতি বলল—"যাবেন না আপনি চিঠি আনতে। দাদা আমাকেও ওই ভাবে চিঠি দিয়েছেন একখানা। কিন্তু থাক, চিঠিপত্র বার করে কিছুই প্রমাণ করার প্রয়োজন করে না। ওদের যা খুশি ওরা করতে পারে।"

সাধু মহারাজ সহাস্য কণ্ঠে বললেন—"সত্য তো আমাকেও চিঠি দিয়েছে। আচ্ছা, সব চিঠিগুলোই না হয় দেওয়া হবে আপনার হাতে। কিন্তু তাতে ফলটা কি দাঁড়াবে। ভবভূতির বিয়েটা প্রমাণ হবে। সেটা হল একুশ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু একশো বছর আগের ঘটনাটা আমি প্রমাণ করব কেমন করে? একশো বছর আগে ওই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, বছর চল্লিশেক আমি ওকে নিয়ে সংসারধর্মও পালন করেছিলাম, এ সমস্ত বিশ্বাস করতে গেলে তো আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে।"

সাধুজীর রসিকতার মাঝখানেই আবার ঘুরে দাঁড়াল বাসব দত্ত। আগুনের শিষ বেরচ্ছে তার দু'চোখ দিয়ে। আগুনের হলকার মত কয়েকটা কথা ছিটকে বেরল তার মুখ থেকে।

"ভবভূতি, আরও যদি কিছু আমি প্রমাণ করতে পারি ওই মেয়ে সম্বন্ধে?"

পিঁড়ি থেকে নেমে গিয়ে ভবভূতি বাসব দত্তর দুই কাঁধের ওপর দু'হাত রেখে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল—"ছিঃ, এত মানুষের মাঝখানে কি পাগলামি করছিস। তোর চিঠি ক'খানা সব আছে আমার কাছে। আর সুধার চিঠি বলে যেগুলোকে তুই জানিস, ওগুলো সব আমার লেখা। এমন কি লেখাটা পর্যন্ত আমার হাতের। তোর তো মাথা গরম, খালি বাজি ধরতেই জানিস। মাথা গরম না হলে কবে তোর চোখ খুলে যেত।"

হাঁ করলে বাসব দত্ত। কি বলবার জন্যে হাঁ করলে তা ভুলে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে কনের দিকে তাকিয়ে রইল।

কনেও নামল পিঁড়ি থেকে। বাসব দত্তর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গলা খাটো না করেই বলতে লাগল—"বাজির টাকাটা আপনাকে দিতে হবে না বাসব বাবু। ভয়ানক ছেলেমানুষ আপনি। দু'দিন আলাপের পরেই একেবারে প্রেম নিবেদন করে বসলেন। তারপর সত্যিই বিশ্বাস করলেন, আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি। কি সহজেই আপনাকে ঠকালাম। এত সহজে আপনি ঠকলেন কেন জানেন? কারণ আপনি তো আর সত্যি আমার সঙ্গে প্রেমে পড়েন নি। আপনিও ঠকাতেই এসেছিলেন। প্রেমে পড়লে কি ধরনের কথা বলতে হয়, তা বোধ হয় কোনও বই থেকে মুখস্থ করে আসতেন। হাত দু'য়েক তফাতে বসে সেগুলো আওড়াতেন রোজ। চিঠিগুলোও সম্ভবত কোনও চিঠি লেখার বই থেকে চুরি করা। এমনই ছেলেমানুষী কাণ্ড যে হাসি চেপে বসে থাকাই এক এক সময় অসম্ভব হত। তারপর আপনি চলে গেলে দু'জনে মিলে প্রাণ ভরে হাসতাম।"

ভবভূতি বলল—"নে নে, বসে পড়। কাল সকালে তোর গাড়ি চড়েই তো আমরা ফিরব এখান থেকে। আংটি ঘড়ি বোতাম তোর কাছে থাকলেও যা, আমার কাছে থাকলেও তাই। গাড়িখানা শুধু দিস মাঝে মাঝে, চড়ে বেড়াব আমরা।"

এক ঝটকায় বাসব দত্ত মুক্ত করলে নিজেকে ভবভূতির হাত থেকে। তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে লাগাল দৌড়। বলতে বলতে গেল—ওই যাঃ, ফুল মালা আর মিষ্টি যে গাড়িতে পড়ে রইল। নিয়ে আসি গিয়ে—"

সাধু মহারাজ আবার হো-হো শব্দে হাসি জুড়ে দিলেন।

জাগুয়ার রায় বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের একটি কিল মেরে বলল—"জোচ্চুরি, জঘন্য জোচ্চুরি। তলে তলে এই সব চালাচ্ছিল

বাসবটা! সেই জন্যে বুক ঠুকে বলত হরদম, এ বিয়ে হতেই পারে না। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।"

পুরকায়স্থ বলল—"টুঁটি টিপে টাকাটি আদায় করে ছেড়ে দোব বাছাধনকে। দমবাজির আর জায়গা পায় নি।"

সাঁচ্চা বোস তেড়ে উঠল কনের দিকে তাকিয়ে—"আপনার স্বামীটি একটি আস্ত হাঁদা। বিয়ে করার সময় বন্ধুবান্ধবকে বাদ দিয়ে কি বিশ্রী কাণ্ডটা বাধিয়ে তুলেছে দেখুন তো।"

সানু মিত্তির গম্ভীর গলায় বলল—"নেভার মাইণ্ড। যেতে দাও বাজে কথা। মোটের ওপর বাসব বাজি হারল না। কারণ ভবভূতির বিয়েটা সেই আট বছর বয়েসে হয়ে গিয়েছে ওই ওঁর সঙ্গে। সেই বিয়েটাই আসল বিয়ে। এ বিয়েটা তো ধাপ্পাবাজি। ধাপ্পাবাজির ওপর বাজি রেখেছিল বাসব। সুতরাং আইনের দিক থেকে দেখতে গেলে এই বাজি ধরাটা টিকতেই পারে না।"

সাধুজীও ইংরেজী বলে ফেললেন, বললেন—"নেভার মাইণ্ড। এখন সকলে একটু স্থির হয়ে বসুন। এখনও বোধ হয় কিছু বাকী আছে মন্ত্র পড়ার। সেটুকু শেষ হোক এখন। বাস্ রে বাস্, মন্ত্র যে দেখছি ফুরতে চাচ্ছে না। এখন যদি সেধে ওই কনে বলে যে আমাকে আবার বিয়ে করবে, তাহলেও আমি রাজী হব না। অত মন্ত্রের ধকল এ বয়েসে সইবে না।"

আবার শাঁখ বেজে উঠল, উলুধ্বনি পড়ল আবার। ভবভূতি আর তার কনে বসে পড়ল আবার পিঁড়িতে। পুরুত মশাই খনখনে গলায় শুরু করলেন—"বল মা, হাত জোড় করে বল—অভিবাদয়ে কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রা শ্রীসুধাময়ী দেব্যমহস্মি ভোঃ।"

সেই রাত্রে সানু মিত্তিররা আর ফিরতে পারে নি ঢাকুরে থেকে। বাসব দত্ত সেই যে গেল ফুল মালা সন্দেশ আনতে, সেই যাওয়াই তার একদম যাওয়া। পরদিন ওখান থেকে ফিরে বাসব দত্তর খোঁজ

নিতে গিয়ে জানতে পারল ওরা, বাসব কলকাতা ত্যাগ করেছে। তারও কয়েক দিন পরে লয়েডসের ওপর দশ হাজার টাকার এক ড্রাফট্ এসে পৌঁছল সাধু মহারাজের নামে। সঙ্গে এল সংক্ষিপ্ত একখানি চিঠি। বাসব দত্ত সাধু মহারাজের শ্রীচরণে শত সহস্র কোটি প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করেছে, টাকাটা যেন ভবভূতিরা নেয়। একান্তই যদি না নেয় ওরা, তাহলে মহাপুরুষ তাঁর খুশিমাফিক যে কোনও কাজে লাগাতে পারেন।

সংবাদটি ভবভূতি এসে জানাল।

ধ্রুবজ্যোতিবাবু বললেন—"কমপ্লেক্স্, ভাল করে অ্যানালিসিস্ করা দরকার বাসব দত্তর কেস্‌টা। যে মানুষ প্রেমের ওপর বাজি ধরতে পারে, তার পক্ষে এই জাতের ডিগবাজি খাওয়া অসম্ভব নয়।"

সানু মিত্তির বলল—"খামকা দিয়ে মরতে গেল টাকাটা। আইনের পরামর্শ টা আগে শুনে নে, তারপর যা করবি কর। বিয়ে তো আগেই হয়েছিল ওদের। নতুন যে বিয়েটা হচ্ছিল, সেটা তো ধাপ্পাবাজি। ধাপ্পাবাজির ওপর বাজি ধরা যায় কখনও ?"

জাগুয়ার পুরকায়স্থকে বলল—"কি হাঙ্গামায় পড়া গেল আবার দেখ। বাসবটাকে এখন পাকড়াও করা যায় কোথা থেকে ?"

পুরকায়স্থ বলল—"প্রেম ব্যাপারটাই ষোলআনা দমবাজি। দমবাজির ওপর বাজি ধরতে গিয়ে ফেরার হল হতভাগাটা। ধরতে পারলে এমন এক হাত নোব—"

ধরা কিন্তু গেল না বাসব দত্তকে, লোকটা যেন রকেটে চেপে মহাশূন্যে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল।

প্রেমের দরুন লোকে সংসার ত্যাগ করে, ধর্ম ত্যাগ করে, রাজ্য ত্যাগ করে। বাসব দত্ত দুনিয়াখানাকেই ত্যাগ করে চলে গেল। কার প্রেমে পড়ে এত বড় একটা কাণ্ড করে ফেলল সে, তা কিন্তু কেউ বুঝতেই পারল না।

ব্যভিচার বাক্যটির একটি অসামান্য অর্থ বার করেছিলেন শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য। তাঁর মতে একঘেয়েমির নাম ব্যভিচার। প্রমাণ—সৃষ্টি-কর্তা স্বয়ং একঘেয়েমি একদম পছন্দ করেন না। নয়তো এই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম যে কটা গাছপালা মানুষ পশু পাখি জন্মেছিল, সেগুলোই আজ পর্যন্ত টিকে থাকত। কেউ বুড়ো হত না, কেউ মরত না, কেউ জন্মাতও না আর। অনবরত মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে, দুনিয়াটা বদলাচ্ছে, আকাশে বাতাসে আলোয় আঁধারে এত রকমের এত সব ওলটপালট ঘটছে। এ সমস্ত যে ঘটছে, এর একমাত্র কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একঘেয়েমি বরদাস্ত করতে পারে না বলে। আর যাই হোক, এ কথা তো মানতেই হবে যে বিশ্ববিধাতার বিধানে ব্যভিচারের স্থান নেই। সুতরাং হে গণ্ডমূর্খ ব্যভিচারীর দল, ওঠো, জাগো, কায়মনোবাক্যে একঘেয়েমি বিসর্জন দাও।

এই ছিল শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য মশায়ের বাণী। আচার্য মশায় তাঁর বাণীকে সর্বপ্রযত্নে তাঁর নিজের জীবনে রূপ দেবার জন্যে চেষ্টা করতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও' এই মহাবাক্যটি তাঁর স্মরণে স্থান পেয়েছিল। কাজেই নিজে তিনি কোনও মতেই ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতেন না।

তার প্রমাণ তাঁর নামে। একটা মানুষ কি করে সারাটা জীবন একটি মাত্র নামের লেবেল সর্বাঙ্গে সেঁটে ঘুরে বেড়ায়, এটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হত। তাঁর জীবনে এ পর্যন্ত এগারবার নাম পালটেছেন তিনি। প্রথম দিকে বার দু'তিন নাম রাখা আর নাম পালটানোয় তাঁর হাত ছিল না। তিনি জানতে পেরেছিলেন, একেবারে আদিতে তাঁর দু'টি নাম ছিল, খোকা আর

সোনা। খোকা নামটি তাঁর বাবা মা আত্মীয় স্বজন সকলে ব্যবহার করতেন। কেবল তাঁর ঠাকুমা সোনা বলে ডাকতেন তাঁকে। এই দুটো নামই তাঁর পাঁচ বছর বয়সে পালটে গেল। স্কুলের খাতায় লেখা হল—শ্রীমান নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য, পিতা শ্রীপ্রাণকেষ্ট ভট্টাচার্য। নৃসিংহ নামটা নস্যুতে গিয়ে দাঁড়াতে বেশী দিন লাগল না। নস্যু থেকে নোসো তারপর নোসো থেকে নোসে। স্কুলের পণ্ডিত মশায় নোসে নোসে করে সত্যিই নৃসিংহকুমারের মাথাটা গরম করে ফেললেন। তখনই নৃসিংহকুমার প্রতিজ্ঞা করেন, ম্যাট্রিকের সময় নামটা কোনও রকমে পালটে ফেলবেন। অবশেষে নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্যকে আদিত্য-নারায়ণ ভট্টাচার্য করে হেডমাস্টারমশায় পরীক্ষা দিতে পাঠালেন। হেডমাস্টার মশায়ের স্বার্থ ছিল। তিনি জানতেন, নৃসিংহকুমারই থাক বা আদিত্যনারায়ণই থাক, এবারে তাঁর স্কুল একটা-কিছু করবেই। করলেও, আদিত্যনারায়ণ সেবার ম্যাট্রিকে প্রথম পাঁচ জনের ভেতর দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু কলেজে ঢুকেই গণ্ডগোল শুরু হল। আদিত্যনারায়ণের নারায়ণকে সকলে স্রেফ ভুলে গেল। আদিত্য ক্রমশ কাটছাট হয়ে আদিদা' পর্যন্ত নামল। অগত্যা আদিত্য-নারায়ণ তাঁর নারায়ণত্বের মোহ পরিত্যাগ করলেন। ডিগ্রির আগে যে নামটি স্থান পেল, সেটি হচ্ছে শ্রীখদ্যোত ভট্ট। খদ্যোত আর কতক্ষণ টিকবে। নিবে গেল শিগগিরই। এটা হল বিপ্লবের যুগ। সুতরাং শ্রীবিপ্লব ভট্ বাজারে চালু হলেন। দাঁত-ভাঙা গোটা কতক প্রবন্ধ বেরল ইংরেজী কাগজের রোববারের শেষ পৃষ্ঠায়। দেশের ইংরেজী-জানা মানুষে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলে, বিপ্লব ভট্ স্রেফ কলমের কামড়ে দেশে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে এবার। তারপরই বেশ ভারি মাইনের এক চাকরি জুটে গেল বিপ্লব ভটের। জাঁদরেল এক ইংরেজ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বিভাগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে বসে পড়লেন বিপ্লব ভট্। বসে মনের সুখে ব্যভিচার-বিনাশিনী মহাবাণী প্রচার করতে লাগলেন।

তখন শুরু হল বাড়ি বদলানো, পাড়া বদলানো আর ঠিকানা বদলানোর পালা। এক পাড়ায় এক বাড়িতে মানুষ আমৃত্যু থাকবে কেন? পাখিরা বাসা বদলায়, সাপেরা গর্ত পালটায়, বাঘেরা চিরকাল এক বনে থাকে না। শুধু বেড়ালে আর গরুতে এক বাড়ির মায়া কিছুতে ছাড়তে পারে না। মানুষ নিশ্চয়ই বেড়াল বা গরুর তুল্য জীব নয় যে একই বাড়ি একই ঠিকানার মোহ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। তাছাড়া ভাড়াটে বাড়ি দালাল লাগালেই যখন মেলে, তখন বাড়ি বদলাতে আপত্তি কি? সুতরাং বাড়ি বদলাবার খুব সহজ উপায় বার করে ফেললেন বিপ্লব ভট্। দালালদের বলে দিলেন, ছ'মাস বা বড় জোর এক বছরের ভেতর নতুন পাড়ায় নতুন বাড়ি চাই। দালালদেরও বিশেষ অসুবিধে হল না। এক ভাড়াটেকে বিপ্লবের বাড়িটি দিয়ে বিপ্লবকে তাঁর বাড়িতে তুলে দিতে লাগল। নির্বিঘ্নে এক ঠিকানায় থাকার একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেলেন বিপ্লব ভট্।

তারপর বিপ্লব চুকে গেল। অফিসের বড় সাহেবদের বোঝালেন তিনি, এক নামের পাবলিসিটি অফিসার রাখা পাবলিসিটির পক্ষে মারাত্মক বিপদ। বিজ্ঞাপনের ব্যাঞ্জন মুখরোচক করতে হলে বিজ্ঞাপনের মালমশলা যেমন বদলাতে হয়, তেমনি বিজ্ঞাপন অধিকর্তার নামও পালটাতে হয়। সাহেবরা রাজী হলেন। ফলে মাস আষ্টেকের জন্যে বিপ্লব ভট্ বিশ্বমূর্তি শর্মা হলেন। ইতিমধ্যে পাইকপাড়া ঠিকানা শোভাবাজারে চলে এল। শোভাবাজার থেকে ঠিকানা যখন নিউ সি আই টি রোডে পালটে গেল, তখন নামটা দাঁড়াল শুভার্থী শর্মায়। তারপর বকুলবাগান, বকুলবাগান থেকে বাওয়ালী মণ্ডল রোড, সেখান থেকে নিউ আলিপুরে যখন পৌঁছলেন প্রসিদ্ধ হরমন্ হারকিউলিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর পাবলিসিটি অফিসার, তখন তাঁর নামটা দাঁড়িয়েছে শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য, আর বেতনটা বাড়তে বাড়তে চার অঙ্কের ওপরে গিয়ে পৌঁছেছে।

সুতরাং এটা মানতেই হবে, একঘেয়েমির অপর একটি নামই যে ব্যভিচার, এ কথা সার্থকভাবে সপ্রমাণ করেছেন শ্রীতূষ্ণীম্ তাঁর নিজের জীবনে। আরও একটু এগিয়ে চললে বলা চলে, শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্যের জীবনদর্শন হচ্ছে, একঘেয়েমি বরদাস্ত করা সব থেকে বড় পাপ।

নিউ আলিপুরের পি ১৯।৭।৩ নম্বর ফ্ল্যাটে বাস করেন শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য। ভট্টাচার্যের ভট্টকে বাদ দেবার পর থেকে দাড়ি কামানো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সপ্তাহে একবার করে চৌরঙ্গি পাড়ায় গিয়ে চুলদাড়ি ড্রেস করে আসতে হয়। ফলে কুচকুচে কালো চাপ-দাড়িতে আর সাড়ে-চার ইঞ্চি লম্বা চুলে অনেকটা আচার্য-আচার্য ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর চেহারায়। অফিসে যান ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরে। কোট-প্যাণ্টগুলো বাক্সবন্দী করে রেখেছেন। পরে আবার কাজে লাগবে।

কিন্তু সেই পরের তারিখটা আসতে ক্রমাগত দেরি হচ্ছে। ইতি-মধ্যে দালালরা বার পাঁচেক তাঁর সঙ্গে দেখা করে পাঁচ জায়গায় পাঁচখানা বাড়ির সন্ধান দিয়ে গেল। অফিসের সাহেবরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, দাড়ি চুল নাম ভোল পালটাতে এবার এত দেরি হচ্ছে কেন। চাকর শশী আর রাঁধুনী জগুর মা বাবুর হবিষ্য খাওয়া আর ছুঁচিবাই সহ্য করতে না পেরে পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে লাগল। আর সাত বছরের সঙ্গী স্কটল্যাণ্ডজাত কুলীন সারমেয়টি প্রভুর মুখের প্রসাদ হাড়গোড় চিবোতে না পেরে মনমরা হয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল। শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য তাঁর নামটিকে সার্থক করার জন্যে পরম তৃপ্তিতে গুম মেরে রইলেন। এমন সময় এক দুর্ঘটনা। হ্যাঁ— দুর্ঘটনাই বলা চলে এক রকম। বাড়ি চড়াও করে খামকা যদি কেউ গালমন্দ করে যায়, সেটাকে দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

সেদিন কি একটা ব্যাপারে ছুটি ছিল। আচার্য মশাই অনেকটা বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, রোদের একঘেয়েমি সহ্য করতে না পেরে আকাশটা মেঘবরনী শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে। দেখে তিনি তুষ্ট হলেন। শশীকে ডেকে বলে দিলেন, ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ে আর বাতাসা যোগাড় করতে। বলে বাথরুমে চলে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সবেমাত্র তিনি চুলদাড়িতে চিরুনী ছুঁইয়েছেন, শশী ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলে—নীচে একজন দেখা করার জন্যে বসে আছেন।

"দেখা করবার জন্যে! আমার সঙ্গে?" আচার্য মশায় কপাল কুঁচকলেন।

শশী বললে—"মেয়েমানুষ, ট্যাক্সি করে বাক্স-বিছানা নিয়ে এসেছেন।"

"বাক্স-বিছানা!" আচার্য মশায়ের হাত থেকে চিরুনীখানা পড়ে গেল। দু'হাত সজোরে নাড়তে নাড়তে তিনি বলে উঠলেন—"বলে দে, বলে দে গিয়ে, আমি বাড়িতে নেই।"

শশী বললে—"শোনবার মানুষ নন তিনি। বাড়িতে নেই শুনে বললেন, যখন ফিরবেন তখন দেখা করব।"

আচার্য মশায় ভেবে পেলেন না, এর পর কি বলা যায়। সজোরে তিনি তাঁর দাড়ি খামচে ধরে মুখ নিচু করে ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মেঘবরনী ঘোমটা-ঢাকা আকাশের চোখ দিয়ে অঝোরে বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। শশী ওধারে গিয়ে জানলা বন্ধ করতে লাগল।

সিঁড়ির মুখ থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে হুকুম করলে—"এই—কে আছ ওপরে। নেমে এস শিগগির। ড্রইংরুমের সব ভিজে গেল যে।"

হুকুম দেবার মত গলা বটে! কি তিরিক্ষি মেজাজ রে বাবা! আচার্য মশায় চট্‌ করে চাইলেন একবার শশীর দিকে। শশী তখন ওধারে মুখ করে প্রথম জানলাটার ছিটকিনি আঁটছে। আরও দু'টো জানলা তখনও বন্ধ করতে হবে তাকে। নিরুপায় হয়ে আচার্য মশায়

নিজেই বেরতে যাচ্ছিলেন ঘর ছেড়ে, সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গা থেকে আবার এক ঝংকার শোনা গেল।

"কি পাজী চাকরবাকর রে বাপু এ বাড়ির! সব কটাকে দূর করে দিতে হয়।"

কথা শেষ হবার আগেই একেবারে সশরীরে হাজির দরজার সামনে। দরজার বাইরে পা দিতে যাচ্ছিলেন আচার্য মশায়, ধাক্কা লাগবার ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে একটা ঝাপটা খেলেন মুখের ওপর।

"এই—কি নাম তোমার?"

থতমত খেয়ে গেলেন শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য, নামজাদা ইংরেজ কোম্পানীর স্বনামখ্যাত পাবলিসিটি অফিসার। কোনও রকমে তাঁর গলা দিয়ে বার হল—"আজ্ঞে—"

আবার এক ধমক—"আজ্ঞে—কথা বললে বুঝতে পার না নাকি? যত সব লোফার ভ্যাগাবণ্ডস্ ওয়ার্থলেস্ ওঁচা। ড্রইংরুমের সব-কিছু যে ভিজে গেল। ওপরে বসে ঘুমচ্ছ নাকি এতক্ষণ?"

শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য সেই মারমুখো মূর্তির সামনে থেকে সরতে পারলে তখন বাঁচেন। সাঁ করে তাঁর পাশ দিয়ে এক রকম পিছলে পালিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। পেছন থেকে আর-একটা ধমক খেলেন তিনি—"সাবধান, দৌড়ে যেতে গিয়ে আবার শুট করে বোস না কিছু। ড্রইংরুমের দরজার সামনেই তোমাদের সাহেবের মিষ্টির হাঁড়ি বসানো আছে।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ পাশে ঘুরলেই ড্রইংরুমের দরজা। শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য কস্মিনকালে ড্রইংরুম বলেন না ও ঘরটাকে। তিনি শশী জগুর মা, অর্থাৎ তাঁর সংসারের তাঁরা তিন জনই নিচের ঘর বলেন। নিচের ঘরখানি আর ওপরের ঘর দু'টি নিয়ে তাঁর পি ১৯।৭।৩ নম্বরের ফ্ল্যাট। ড্রইংরুমের সাজসজ্জাও নেই সে ঘরে। আছে একধারে একখানি ছোট তক্তাপোশ পাতা আর তার ওপর শশীর শতরঞ্জি

মোড়া বিছানা গোটানো। আর-এক ধারে আছে ছোট একখানি টেবিল আর খান দুই চেয়ার। কালেভদ্রে যদি অফিসের কোনও বাবুটাবু কেউ আসেন তাঁর কাছে, তাহলে ওখানেই বসে কথাবার্তা শেষ করেন আচার্য মশায়। সেই ড্রইংরুমের দরজার বাইরে সত্যিই বসানো রয়েছে গলায় দড়ি-বাঁধা মুখে সরা-চাপা-দেওয়া এক হাঁড়ি। তার পাশে রয়েছে ছোট একটি হোল্ড-অল আর একটা মস্ত বড় চামড়ার সুটকেস। হোল্ড-অল সুটকেসের গায়ে লেবেল লাগানো রয়েছে। আচার্য মশায় হেঁট হয়ে পড়লেন—কনক মৈত্র, গার্লস হাই স্কুল, ত্রিপুর। পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে ওপরে আবার ধমকাধমকি শুরু হয়ে গেছে। আচার্য মশায় কান পেতে শুনতে লাগলেন—

"এই, কে হে তুমি ? কি নাম তোমার ?"

ঘরের ভেতর থেকে জবাব হল—"শশী—শ্রীশশীভূষণ কুণ্ডু।"

"ওঃ, একেবারে—শ্রীশশীভূষণ কুণ্ডু। তা বেশ, আর ওই যে লোকটা নিচে গেল ওর নামটা কি ?"

শশী জিজ্ঞাসা করলে—"আজ্ঞে—কার নাম ?"

"ওই যে ওই লোকটা, ঝোপঝাড় গজিয়েছে মাথায় মুখে ?"

শশী বললে—"আজ্ঞে—সে অনেক রকমের নাম।"

"অনেক রকমের নাম! সে আবার কি ? করে কি লোকটা এখানে ? রাঁধে-টাঁধে বুঝি ?"

শশী বলে—"আজ্ঞে—রাঁধে জগুর মা।"

"জগুর মা রাঁধে! সে আবার কে ? তাহলে ও লোকটা আছে আবার কিসের জন্যে ? কটা লোক লাগে তোমাদের সাহেবের ? একপাল লোক রাখা হয়েছে, সব কটা ওয়ার্থলেস। কোথায় গেছে তোমাদের মনিব বলতে পার না। হ্যাঁ হে শশীভূষণ না সর্পভূষণ, কোথায় গেছেন তোমাদের সাহেব বলতে পার ?"

শশী বললে—"আজ্ঞে—উনি পারেন।"

"উনি কে? যে নিচে গেল? ও বলতে পারবে কোথায় গেছে তোমাদের মনিব? বেশ বেশ, চল তো নিচে, জিজ্ঞাসা করে দেখি ওকে।"

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে খুটখুট আওয়াজ শোনা গেল। ওই রে—নেমে আসছে যে আবার! আচার্য মশায় টপ্ করে নিচের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ত্রিপুর গার্লস হাই স্কুলের কনক আবার তর্জনগর্জন শুরু করলেন।

"এতক্ষণ লাগছে নাকি হে তোমার ঘরের জানলা কটা বন্ধ করতে? না ঘুমিয়েই পড়লে?"

ঘরের ভেতর থেকে আচার্য মশায় বললেন—"আজ্ঞে না, ঘুমোই নি তো।"

"ঘুমোও নি যখন, তখন বেরিয়ে এস না বাপু। তোমাদের সাহেব কোথায় গেছেন, বলতে পার?"

ঘরের ভেতরে সজোরে একটা জানলা বন্ধ হবার শব্দ হল। তারপরই জবাব হল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বইকি। গেছেন হানড্রেড্ ওয়ান ক্লাবে সেই হ্যারিংটন স্ট্রীটে।" সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা জানলা বন্ধ হবার শব্দ হল।

আরও অধীর কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠলেন কনক মৈত্র।

"হ্যারিংটন স্ট্রীটের হানড্রেড্ ওয়ান ক্লাব! সেখানে কেন সকালবেলা? করেন কি সেখানে?"

ঘরের ভেতর থেকেই জবাব হল—"আজ্ঞে—সাহেব সব দিন রাতে ফিরতে পারেন না তো। শরীরটা একটু ঠিক হলেই ফিরবেন।"

কয়েক মুহূর্ত একদম চুপচাপ কাটল। কনক মৈত্র দাঁত দিয়ে তাঁর নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। ফিসফিস করে নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করলেন—"ও, তাহলে আবার আরম্ভ হয়েছে বুঝি?"

তারপর আবার এক ধমক লাগালেন—"কি হে, তুমি বেরবে না নাকি ঘর থেকে? আমায় একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পার?"

"আজ্ঞে—পারি বইকি!" বলতে বলতে আচার্য মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসেই হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করলেন—"ওরে শশী, শশী। যা শিগ্‌গির একটা ট্যাক্সি ডেকে দে এখুনিই। বলগে যা, হ্যারিংটন স্ট্রীটের হানড্রেড্ ওয়ান ক্লাবে যেতে হবে।"

তীরবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, কনক মৈত্রের পাশ দিয়ে সিঁড়ির নিচের দরজা খুলে শশী বেরিয়ে গেল। আচার্য মশায় পড়লেন আবার জেরার মুখে।

"রোজই তোমাদের সাহেব ক্লাবে যান?"

মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দিলেন আচার্য মশায়—"আজ্ঞে না, তা রোজ আর কই! এই ছুটিছাটার দিন।"

"ও—আচ্ছা। এ বাড়িতে সাহেবের কাছে ক্লাবের কেউ আসে-টাসে না?"

একান্ত লজ্জিতভাবে আচার্য মশায় বললেন—"আজ্ঞে—তেমন আর কে আসে। মাঝে মাঝে আপনার মত দু'একজন—এই আর কি।"

"ও—আচ্ছা।" খুবই মুষড়ে গেলেন যেন কনক মৈত্র। একটু সময় চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তাঁদের সঙ্গেই যান বুঝি তোমাদের সাহেব?"

হাত কচলাতে কচলাতে আচার্য মশায় বার দু'য়েক মাথা নাড়লেন। যেন বেশ একটি গোপনীয় কথা বলছেন, এইভাবে বললেন—"আজ্ঞে—সত্যি কথা বলতে কি, ওনারা কেউ এসে ধরে না নিয়ে গেলে—" থেমে গেলেন আচার্য মশায়। যেন কথাটা শেষ করতে তাঁরই লজ্জা করছে।

এবার একটি মর্মভেদী শব্দ হল দাঁতে দাঁত চেপে—"ও—আচ্ছা।"

বাইরে ট্যাক্সির হর্ন শোনা গেল। কনক মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন—"কত নম্বর সেই ক্লাবটা বলতে পার ?"

শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য ঘনঘন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন—"আজ্ঞে—কিছু দরকার নেই। ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা জানে।"

"বেশ, রইল আমার জিনিসগুলো। আসছি আমি।" বলতে বলতে কনক মৈত্র তাঁর হিলওয়ালা জুতোর শব্দ তুলে এক রকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

পেছনে আচার্য মশায় দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। নমস্কারটা যে কাকে করলেন তিনি, তা নিজেই তখন বলতে পারতেন না।

ঘি দিয়ে ভাজা চিঁড়ে আর তার সঙ্গে বাতাসা খেতে বসলেন শেষে শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য তাঁর শোবার ঘরে। আরাম করে বিছানার ওপরেই বসলেন বাটিটা কোলে নিয়ে। শশীকে বলে দিলেন কফি বানাতে। বর্ষার দিনে কফি খাওয়া যাক। তারপর রান্না কর খিচুড়ি। জগুর মা ছুটি নিয়েছে এক দিনের জন্যে, তার বোনপোকে দেখতে যাবে চেতলায়। ভাল করে খিচুড়ি রান্না কর দু'জনের জন্যে। বিকেলে মিষ্টিটিষ্টি খেয়ে থাকলেই চলবে।

শশী ঘাড় চুলকে বললে—"কিন্তু আবার যদি তিনি ফিরে আসেন এখানে ?"

"ফিরে আসবে!" শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য ভুরু কুঁচকে রইলেন। চিঁড়ে চিবনো বন্ধ হয়ে গেল, একখানা বাতাসা তুলেছিলেন মুখে দেবার জন্যে, সেখানা তাঁর হাতেই রয়ে গেল।

শশী বললে—"জিনিসগুলো রয়েছে কিনা। ওগুলো ফিরিয়ে নিতে আসবেন তো!"

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্যের। নিজের সর্বশরীরে বেশ একটা ঝাঁকি দিয়ে তিনি বলে উঠলেন—"পাগল হয়েছিস তুই ?

সেই ব্যাঙো সাহেব ছাড়লে তো ফিরবে। তোর মনে পড়ছে না ব্যাঙো সাহেবকে? সেই যে রে, চৌরঙ্গির সাহেব-পাড়ায় গিয়ে যার কাছে থেকে তুই এ বাড়ির চাবি এনেছিলি। তুই তো এসে বললি, লোকটা পাঁড় মাতাল। বসে বসে মদ গিলছিল, যখন তুই গেলি। ও সেই ব্যাঙো সাহেবের কাছেই এসেছে। ইতিমধ্যে সাহেবকে যে এ পাড়ার লোকে তাড়িয়েছে, সে খবরটা এখনও ও পায় নি। তাই আমাদের সবাইকে ও সাহেবের চাকরবাকর ভেবেছে। খুব সাবধানে থাকবি, কেউ ডাকলে সহজে দরজা খুলে দিস নি। আগে দেখে নিবি জানলা দিয়ে কে এল। আসবে সাহেবের চাপরাসী-ফাপরাসী কেউ, এসে নিয়ে যাবে জিনিসগুলো। ব্যাস্—"

শশী কফি বানাতে গেল। বলে গেল—"ওরা সব সাংঘাতিক মেয়েমানুষ বাবু। সাহেবকে নিয়েই হয়ত আবার ফিরে আসবে। এসে আবার কি এক কাণ্ড না বাধিয়ে বসে।"

শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য নিজেকে নিজে শুনিয়ে দিলেন—"এলেই হল কিনা অমনি। এ রাজত্বে পুলিস নেই নাকি।"

ঘি দিয়ে চিঁড়ে ভাজা আর বাতাসা, তারপর কফি খাওয়া হয়ে গেল। শশী চলে গেল তেতলার ছাতে, সেখানে এক চিলতে রান্নাঘর আছে। শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য খবরের কাগজ খুলে বসলেন। মনটা কিন্তু তাঁর দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের নাস্তানাবুদ হওয়ার কাহিনীতে আটকে রইল না, ঘুরে-ফিরে বার বার একই জায়গায় গিয়ে উঁকি দিতে লাগল। জায়গাটা হচ্ছে, সিঁড়ির নিচের দরজাটি। যে দরজা দিয়ে তাঁর পি ১৯।৭।৩ নম্বর ফ্ল্যাটে ঢুকতে-বেরতে হয়। ভেতর দিক থেকে দরজাটায় তিনি খিল এঁটে এসেছেন স্বহস্তে। ফস্ করে যে কেউ ঢুকে পড়বে, সে ভয় অবশ্য নেই। কিন্তু দরজার বাইরে একটা হৈ-হল্লা যে হবেই, এটা আচার্য মশায় ধরেই নিয়েছিলেন। ত্রিপুর গার্লস হাই স্কুলের কনক মৈত্র নিশ্চয়ই একলা ফিরবেন না তাঁর মালপত্র নিতে, সঙ্গে

সেই ব্যাঙ্গো থাকবেই। আরও দু'একজন ব্যাঙ্গো মার্কা সাহেবও হয়তো আসবে। এসে যাচ্ছেতাই ব্যাপার না বাধায়। মানে—মাতাল তো সবাই, মাতালে কি না করতে পারে।

তাছাড়া ওই যে একটুখানি ইয়ার্কি করা হয়েছে কনক মৈত্রের সঙ্গে, ব্যাঙ্গো সাহেবকে এ বাড়ির মনিব বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, ওটুকু কি উনি মুখ বুজে সহ্য করবেন! কখনোই নয়, যা মেজাজ রে বাবা! নিশ্চয়ই পাঁচ কথা না শুনিয়ে নড়বেন না। তখন ওঁর বন্ধুরাও হয়তো আস্তিন গোটাবেন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তা শেখাবার জন্যে। নাঃ, অনর্থক এক উড়ো আপদে পড়ে যাওয়া গেল দেখছি। কোথা থেকে এসে বাড়ি চড়াও করে অপমান করে গেল, আবার আসছে হয়তো সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মারধোর করতে। শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য মশায় সত্যিই খুব নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লেন। খবরের কাগজের খবর, নানাজনের নানারকমের নাজেহাল হওয়ার মুখরোচক বিবরণগুলোর ওপর তাঁর অরুচি ধরে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে ওধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত দেখে এলেন একবার। না, কোনও ট্যাক্সি আসছে না এদিকে। কিন্তু এতক্ষণ তারা করছেই বা কি! এধারে প্রায় দু'ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল। মেয়েমানুষটাও বসে বসে মদ গিলছে নাকি!

শশী নেমে এল ওপর থেকে, খিচুড়ি ভাজাভুজি সব হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে তো বড় বয়েই গেছে। আচার্য মশায় তাঁর মহান তূষ্ণীমভাবটুকু অতি কষ্টে বজায় রেখে বললেন—"এখন ওসব রেখে দে। জিনিসগুলো নিয়ে গেলে পরে খেতে বসা যাবে।"

শশী বললে—"জিনিসগুলো আর তিনি নিতে আসবেন না বাবু।"

"আসবেন না! বলিস কি রে! কেন?" আচার্য মশায়ের চোখে মুখে দস্তুরমত ব্যাকুলতা ফুটে উঠল।

শশী বললে—"মেয়েলোকটাকে সেই সাহেবের কাছে পাঠিয়ে

ভাল কাজ হল না বাবু। তিনি হয়তো সেই সাহেবের কাছে আসেন নি। হয়তো ঠিকানা ভুল করেছিলেন, কোন বাড়িতে উঠতে কোন বাড়িতে উঠে পড়েছেন।"

আচার্য মশায় কিছুক্ষণ মিটমিট করে তাকিয়ে রইলেন শশীর মুখের দিকে। তারপর প্রায় চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রথমে সে কী জিজ্ঞেস করেছিল তোকে ?"

শশী বললে—"ট্যাক্সিওয়ালা ছুমদাম করে তাঁর বিছানা নামিয়ে দিলে দরজার সামনে। উনি খট্‌খট্‌ করে ভেতরে ঢুকে আমায় ধমকে উঠলেন—এই, তোদের সাহেব কোথায় ? আমি আপনার কাছে খবর দিতে সিঁড়িতে পা দিয়েছি। আবার এক ধমক দিলেন—এই, ওগুলো আগে বাড়ির ভেতর এনে রাখ। তাড়াতাড়ি বাক্স-বিছানা নিয়ে এলাম আমি। এনে নিচের ঘরের দরজার সামনে রেখে ওপরে এলাম আপনাকে বলতে।"

আচার্য মশায় তাঁর আচার্যসুলভ স্থৈর্য হারিয়ে ফেললেন—"চুপ কর গাধা কোথাকার। কত নম্বর বাড়ি খুঁজছে, এটাও জিজ্ঞেস করতে পার নি।"

শশী চুপ করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আচার্য মশায় দু'হাতে তাঁর দাড়ি ধরে টানাটানি করতে লাগলেন।

শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্যের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন যিনি, তিনি কিন্তু হ্যারিংটন স্ট্রীটের হানড্রেড ওয়ান ক্লাবের কথা বললেন না ড্রাইভারকে। বললেন—চল গড়পাড় রোড। মনে মনে বললেন—আগে দিদিকে গিয়ে জানাতে হবে সব ব্যাপার। ওরে বাপরে! কী বিচ্ছু মানুষ! এই জন্যেই ওভাবে লুকিয়ে রয়েছেন কলকাতায় এসে। কলকাতায় বদলি হয়েছেন, বাড়ি ভাড়া করেছেন, দিদিকে আনা হচ্ছে চাকরি ছাড়িয়ে। অথচ আমরা যে রয়েছি কলকাতায়, এ কথাটা একবার মনের কোণেও উদয় হল না। ভাগ্যিস দিদি প্রথমেই কাল

আমাদের বাড়ি উঠেছে, নয়ত কি দুঃখই পেত বেচারা। স্বামী মহারাজের বাড়িতে গেলে দেখত, মহারাজ হানড্রেড ওয়ান ক্লাবে মদ গিলতে গিয়েছেন। আচ্ছা দাঁড়াও, বার করছি ফুর্তি করার মজা। আগে দিদিকে গিয়ে ঠিক করে ফেলি।

গড়পাড় রোডের যে বাড়ির ঠিকানা বলা হল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে, সে বাড়িতে তখন জামাই আসবে বলে বেশ তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির মালিক যজ্ঞেশ্বরবাবু মোটা মানুষ, অল্পেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বহুকাল বিদেশে ঘুরে চাকরি করেছেন। সম্প্রতি কলকাতায় বাড়ি কিনে বসেছেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে। স্ত্রী নেই, দুই ছেলেও তাদের সংসার নিয়ে বিদেশে চাকরি করছে। সঙ্গে থাকে শুধু মেয়েটি। যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছোট ভাইয়ের মেয়ে হঠাৎ এসে পড়েছে আগের দিন রাত্রে। তার স্বামী নাকি কলকাতাতেই বাড়ি ভাড়া করেছে। মস্ত চাকরি করে জামাই, বিয়ের পর থেকে চীন জাপান কোরিয়া কায়রো করে বেড়াচ্ছিল। এবার কলকাতায় স্থায়ীভাবে বদলি হল। বউ স্কুলের চাকরি নিয়ে পড়েছিল সেই আসামের ওধারে কোন এক ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর গোছের জায়গায়। এবার বউকেও চাকরি ছাড়িয়ে আনাচ্ছে কাছে। এ সমস্ত তো অতি সুখের কথা। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন অন্য কারণে। এত কাছে জামাই থাকে, তবু সে শ্বশুরের খোঁজ নেয় নি একবার। জামাই বাবাজী নিশ্চয়ই ভাবে, জ্যাশ্-শ্বশুর তো। আরে জ্যাশ্-শ্বশুর মানে কি! মানে কনক কি তাঁর মেয়ে নয় নাকি? বার পাঁচ-সাত তিনি তাঁর ভাইঝিকে শুনিয়ে দিয়েছেন—"জানলি মা কনক, বাবাজী কি মনে করে জানলি? মনে করে তুই আমার মেয়ে নোস। তুই আর সুজাতা আমার দুটি মেয়ে, এ কথা বাবাজীকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে ভাল করে, বুঝলি।"

কনক চুপ করে আছে আর মুখ টিপে হাসছে। বেশ হবে, সুজাতা ধরে আনলে আগে একচোট বেদম বকুনি খাবে জেঠুর

কাছে, তাছাড়া সুজাতার যা মুখের তোড়, হিমশিম খাইয়ে ছাড়বে একেবারে।

ইতিমধ্যে যজ্ঞেশ্বরবাবু চাকর বামুন ঝি সবাইকে বকেঝকে অস্থির করে তুলেছেন। সমানে তিনি সাবধান করছেন সকলকে।

"দেখ ঠাকুর, ইলিশ মাছ যেন খুব বেশী গলে না যায়। আর মাংসটা যেন একটুও শক্ত না থাকে। জান, মাংস রান্নার তরিবত? আরে বাপু, মানুষ তো বাঘ-সিংঙি নয় যে কাঁচা মাংস খাবে। নেপালে থাকতে দেখেছিলাম, ওরা মাংসটা অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে চড়িয়ে দেয়।"

ঠাকুর চেনে তার মনিবকে, টুঁ শব্দটি না করে তৎক্ষণাৎ চলে গেল সামনে থেকে। যজ্ঞেশ্বরবাবু ডাক-হাঁক করে চাকর ভুজঙ্গধরকে সামনে আনলেন।

"তুমি বাপু কানে কম শোন, বুঝলে। কাল সকালেই তোমাকে ইয়ার নোজ থ্রোট স্পেসালিস্টের কাছে পাঠাতে হবে। আমার বন্ধু কারকুনের ছেলে পার্কসার্কাসে কোথায় কোন হাসপাতালে মস্ত কানের ডাক্তার। তার কাছে কাল তোমায় পাঠিয়ে দোব, তবে ছাড়ব।"

ভুজঙ্গধর ঘাড় নেড়ে বললে—"যে আজ্ঞে।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

"শুনলি মা কনক, কথাটা শুনলি ওর? সব কথায় 'যে আজ্ঞে'। কিছু শুনতে পায় না গোভূতটা, সব কথায় 'যে আজ্ঞে' বলে চালায়। সেদিন সুজাতা বললে—কেন ভাঙলি তুই বাবার গড়গড়াটা। ও বললে—'যে আজ্ঞে'। সুজাতারও রাগটা খুব বেশী। বললে—তোর তিন মাসের মাইনে কেটে নোব—গড়গড়ার দাম। ও বললে—'যে আজ্ঞে'। তুই-ই বল মা কনক, তিন মাসের মাইনে কাটলে ও বাড়িতে পাঠাবে কি? ওর বউ মা এরা সব খাবে কি? ফস্ করে অমনি রাজী হয়ে গেল—'যে আজ্ঞে' বলে। মনে হচ্ছে, সুজাতা কি

বলেছিল, ও মোটে শোনেই নি। বলে বসল 'যে আজ্ঞে'। এত বড় কালাকে নিয়ে কি করে চলবে ?"

বাইরে ট্যাক্সি থামার আওয়াজ শোনা গেল। যজ্ঞেশ্বরবাবু শুনতে পেলেন না, শুনল তাঁর ভুজঙ্গ, যাকে তিনি বদ্ধ কালা বলে জানেন। শুনেই ছুটল বাইরে। যজ্ঞেশ্বরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—"দেখলি মা কনক, দেখলি তুই কাণ্ডটা ওর। কালা মানুষ নিয়ে কি হাঙ্গামাই পোয়াতে হয় আমাকে। কোথাও কিছু নেই ছুটল।"

শ্রীমতী সুজাতা দেবী ঘরে ঢুকলেন ঝড়ের মত। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ঘোষণা করলেন—"নো হোপ্—আসামী ফেরার।"

শ্রীমতী কনক মৈত্র চেয়ার ছেড়ে একটু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ঝপ্ করে আবার বসে পড়লেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন ছুই বোনের দিকে। মুহূর্ত মধ্যে কনক সামলে উঠলেন। বললেন—"ও আমি জানতাম। ঘুরে বেড়াবার চাকরি তো। আবার বোধ হয় কোথাও যেতে হয়েছে। নয়ত স্টেশনে গেলেন না কেন। স্টেশনে না দেখেই ওই রকম একটা কিছু সন্দেহ হয়েছিল আমার। তাই তো তোকে আগে সেখানে পাঠালাম।"

যজ্ঞেশ্বরবাবু একটু একটু বুঝলেন এতক্ষণে ব্যাপারটা। বললেন—"ঠিক, আগে ডিউটি, তারপর অন্য সব। সরকারী কাজের ওইটুকুই হল আসল কথা। হঠাৎ এল এক টেলিগ্রাম, যাও এখনই অমুক জায়গায়। তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হওয়া চাই। স্ত্রী আসছেন বা কারও অসুখ—এ সমস্ত লেম এক্স্‌কিউজ চলবে না। বাবাজীর দায়িত্বজ্ঞান আছে, নয়ত এ বয়সে এতটা উন্নতি হবে কেন ?"

ছুই বোনে চোখে চোখে কি ইশারা হয়ে গেল। ছু'জনে উঠে চলে গেল। যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁর ভুজঙ্গধরকে ডেকে তামাক দিতে হুকুম দিলেন।

ডক্টর সুবিমল মৈত্র তাঁর নিউ আলিপুরের নতুন ফ্ল্যাটে যত জিনিস যোগাড় করেছিলেন নতুন সংসার পাতবার আশায়, সেগুলোকে আবার নিলামওয়ালার বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বন্ধু বিজয় বোসকে জিজ্ঞাসা করলেন—"একটা পুরনো ফার্নিচারওয়ালার ঠিকানা দিতে পার ?"

বিজয় বোস প্রফেসার মানুষ, দুনিয়ার তাবৎ কেনাকাটার মধ্যে বই আর দোয়াতের কালি কেনাকাটা করেন ন'মাসে ছ'মাসে। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী হৈমন্তী দেবী বাকী সব-কিছুর ব্যবস্থা করেন প্রফেসার স্বামীর জন্যে। কাজেই বিজয়বাবু আকাশ থেকে পড়লেন—"ফার্নিচার! ও ফার্নিচার—মানে—তোমার খাট বিছানা টেবিল চেয়ার এই সব তো ? খুব খুব, খুব কেনা যাবে। আগে তোমার স্ত্রী আসুন। তারপর হৈমর সঙ্গে একদিন পাঠিয়ে দাও তাঁকে। গাড়ি-গাড়ি ফার্নিচার এসে যাবে।"

ডক্টর মৈত্র হাল ছেড়ে দিলেন একেবারে। শুধু একবার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে এই যে এতগুলো কিনেছি, এগুলোর কি হবে ?"

বিজয়বাবু মাথা চুলকে বললেন—"তাও তো বটে। তাহলে আরও বড় একটা ফ্ল্যাট খোঁজা যাক, সব মালপত্র যাতে ধরে যায়।"

এ রকম মানুষের সঙ্গে কথা বলাও পাপ। চুপ করে ডক্টর মৈত্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর মুখের দিকে। তারপর উঠে পেছন দিকে দু'হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে পায়চারি শুরু করলেন।

হঠাৎ প্রফেসারের মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এসে গেল, যেন খুব শক্ত একটা প্রবলেম সল্‌ভ করার খুব সোজা একটা সংকেত পেয়ে গেলেন তিনি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন একেবারে, বলতে বলতে গেলেন—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, ফার্নিচার এখন থাক। ইস্—কি ভুলটাই হয়ে যাচ্ছে!

হেমকে নিয়ে আসি, চল এখনই, ওধারে তোমার স্ত্রী এসে পড়লেন যে এতক্ষণে।

ডক্টর মৈত্র ওধারে মুখ করেই অতি সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য প্রকাশ করলেন—"সে ট্রেন অনেকক্ষণ এসে পৌঁছে গেছে।"

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রফেসার বোস। আধ মিনিট পরেই চিৎকার করে উঠলেন—"এসে গেছে অনেকক্ষণ! কি সর্বনাশ, তাহলে কি হবে?"

মৈত্র বললেন—"আমি গিয়েছিলাম স্টেশনে, সে আসে নি।"

"আসেন নি! তার মানে?" দু'চোখ কপালে উঠে গেল প্রফেসারের।

মৈত্র আবার ফিরে গিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। একটি বেশ লম্বা গোছের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"সে যে আসবে না, তা আমি জানতাম।"

প্রফেসার বোস ফিরে এলেন বন্ধুর চেয়ারের ধারে। একটি কথাও বলতে পারলেন না, খুব পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর মুখের দিকে।

বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। তারপর শোনা গেল অদ্ভুত জাতের গলার স্বর, যেন অনেকগুলো কাচের বাটিতে একসঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে গেল। ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা—অতি আধুনিক ধরনের মোড়কে মোড়া অত্যাশ্চর্য এক শৌখিন সামগ্রী। বলতে বলতে ঢুকলেন—"কি এখনও বসে যে সব! ট্রেন যে এসে গেল ওধারে।"

ডক্টর মৈত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—"সে ট্রেন অনেকক্ষণ এসে গেছে।"

"কি!" ভদ্রমহিলা ফোঁস করে উঠলেন। তারপর প্রফেসারের দিকে ফিরে বললেন—"তবে যে তুমি বললে—"

প্রফেসার বোস সজোরে প্রতিবাদ করে উঠলেন—"বলি নি,

কখ্খনো ও রকম কথা বলি নি আমি। আন টাইমটেবল, দেখিয়ে দিচ্ছি—ট্রেন পৌঁছবে তিনটে ত্রিশ মিনিটে। স্পষ্ট লেখা রয়েছে—দেখিয়ে দিচ্ছি—"

মৈত্র হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে টাইমটেবলখানা নিয়ে ওঁদের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। হৈমন্তী দেবী ছোঁ মেরে সেখানা নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই—এই—এই হল বর্ধমান, এই বর্ধমানে পৌঁছল একটা আটত্রিশ মিনিটে, আর এই শিয়ালদায় তিনটে পঁয়ত্রিশ।" হৈমন্তী দেবী চোখ তুলে তাকালেন মৈত্রের দিকে।

মৈত্র বললেন—"ও গাড়ি নয়, আপার ইণ্ডিয়াতে আসার কথা ছিল, সকাল দশটা পঞ্চান্নয় যে গাড়ি আসে।"

হৈমন্তী দেবী বললেন—"কই দেখি টেলিগ্রাম, টেলিগ্রামখানা দেখি।"

মৈত্র পকেট থেকে টেলিগ্রামের লাল কাগজখানা বার করে বাড়িয়ে ধরলেন। হৈমন্তী দেবী নিয়ে পড়তে লাগলেন মুখ বুজে। তিন সেকেণ্ড পরে মুখ তুলে তাকালেন তিনি সুবিমলবাবুর মুখের দিকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার?"

মৈত্র ডিঙি মেরে দেখতে গেলেন কাগজখানা। মিউমিউ করে বললেন—"কেন, কেন? হয়েছে কি?"

হৈমন্তী দেবী কাগজ থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"কবে পৌঁছচ্ছেন লিখেছেন তিনি?"

মৈত্র থতমত খেয়ে বললেন—"কেন? আজ তেইশে—"

কথাটা তাঁকে শেষ করতে হল না। প্রফেসার বোস চিৎকার করে উঠলেন—"কি বললে—তেইশে! তেইশে তো কাল চলে গেছে, আজ আবার তেইশে আসবে কোথা থেকে?"

হৈমন্তী দেবী কাগজখানা মোচড়াতে মোচড়াতে দু'জনের দিকে

রক্তবর্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। সামান্য একটু ছোট্ট শব্দ বেরল তাঁর মুখ দিয়ে—"যত সব—"

অতঃপর ডক্টর সুবিমল মৈত্র এবং তাঁর বন্ধু অধ্যাপক বিজয় বোস যন্ত্রচালিত পুতুলের মত আস্তে আস্তে নিজের নিজের চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। কারও মুখে আর এতটুকু রা নেই। হৈমন্তী দেবী এক ঝট্‌কায় বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বলতে বলতে গেলেন—"আসছি আমি ফোন করে।"

কিছুক্ষণ পরে ডক্টর মৈত্র মুখ তুলে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় গেলেন উনি ?"

তাঁর বন্ধু বোস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। হঠাৎ বললেন—"কেন ? ফোন করতে গেলেন।"

মৈত্র জিজ্ঞাসা করলেন—"কাকে ?"

বোস খেঁকিয়ে উঠলেন—"তা আমি জানব কেমন করে। যাকে ইচ্ছে করুক না ফোন, তাতে আমাদের কি ?"

মৈত্র বললেন—"তাহলে আমরা এখন করব কি ?"

বোস খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আবার এক প্রব্‌লেম, আচ্ছা জ্বালাতন যা হোক। বেশ কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বললেন—"চল, আমরা খুঁজিগে তাঁকে। খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। নিশ্চয়ই এসেছেন তিনি কাল। স্টেশনে তোমায় না দেখে কোথাও গিয়ে উঠেছেন।"

মৈত্র বললেন—"অন্য কোথাও উঠতে যাবে কেন সে ? এ বাড়ির ঠিকানা তো তার জানা ছিল। সোজা এখানে চলে এলেই পারত।"

বোস বললেন—"তাও তো একটা কথা বটে। কিন্তু ধর—"

মৈত্র তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর মুখের দিকে, কি ধরতে হবে ঠিক বুঝতে পারলেন না। বোস হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। খপ্‌ করে বন্ধুর হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিলেন। রুদ্ধনিঃশ্বাসে

বললেন—"চল চল, ওঠ শিগ্‌গির। এখনই আমাদের যেতে হবে লালবাজারে।"

মৈত্রও দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিভ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"লালবাজারে। লালবাজারে কেন ?"

বোস ফিসফিস করে বললেন—"চল না, রাস্তায় সব বলছি।" বলে বন্ধুকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন দরজার কাছে। দরজা দিয়ে আর বেরতে হল না, ঝড়ের মত ঢুকলেন হৈমন্তী দেবী। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"শেয়ালদায় ফোন করে জানলাম, কাল আপার ইণ্ডিয়া আট ঘণ্টা লেটে পৌঁছেছে।"

তাঁর স্বামী বিষম উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"ঠিক, ঠিক মিলে গেছে। ওই রকমই একটা-কিছু আশা করেছিলাম আমি। সন্ধ্যার পর পৌঁছে তিনি ট্যাক্সি নিয়েছেন এখানে আসবার জন্যে। ট্যাক্সিওয়ালা তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে—"

মৈত্র একবার হাঁ করলেন কিছু বলবার জন্যে, বলবার সুযোগ পেলেন না। এক হেঁচকায় তাঁকে দরজার বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেললেন প্রফেসার বোস। সেখান থেকে তাঁর গলা শোনা যেতে লাগল—"লালবাজার, এক্ষুনি, আগে লালবাজার। হৈম, শিগ্‌গির এস, লালবাজারে নকুড় মামাকে ধরতে হবে এখুনি—"

হৈমন্তী দেবীও ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

নিউ আলিপুরের পি ১৯।৭।৩ নম্বর ফ্ল্যাটে শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য তাঁর শশীকে ডেকে হুকুম দিলেন—"ধরে আন একটা নাপিত, যেখান থেকে পাস।"

শশী বললে—"নাপিত পাওয়া যাবে না এখন, সকালে পাওয়া যাবে।"

আচার্য বললেন—"ওসব লেম্ এস্‌কিউজ শুনতে চাই না। এক টাকায় না হয় ছ'টাকায়, ছ'টাকায় না হয় পাঁচ টাকায় ঠিক পাওয়া

যাবে। যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয় আধ ঘন্টার ভেতর। নয়ত দেখিয়ে দোব মজা।”

শশী বেরিয়ে গেল। এক টাকায় একটা নাপিত পাওয়া যাবেই, তাহলে চারটে টাকা লাভ দাঁড়াবে। সুতরাং শশীর আর আপত্তি কোথায়। শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য বাক্স খুলে খুব দামী একপ্রস্থ কোট প্যাণ্ট টুপি টাই বার করে ফেললেন। অনেক দিন পরে পঁয়তাল্লিশ টাকার শু জোড়া বার করে ঝেড়ে-পুঁছে ফেললেন। তামাকের পাইপটাকে খুঁজে বার করে ধুয়ে নিলেন। তারপর খোঁজা শুরু করলেন হাত-ঘড়িটা। আচার্য হবার পর থেকে টেঁক-ঘড়ি কালো কারে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কোটপ্যাণ্টের সঙ্গে আবার হাত-ঘড়ির দরকার পড়ল। ঘড়িটা খুঁজতে খুঁজতে শুভার্থী শর্মা লেখা কার্ডগুলোও পাওয়া গেল। নাপিতও এসে গেল, শশী আরা জিলাসে সদ্য আমদানি হাজাম একটিকে ধরে এনে খাড়া করে দিলে। তাই সই—শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য তার হাতে মুখ মাথা সমর্পণ করে দাঁতে দাঁত দিয়ে বসে রইলেন।

মিনিট পনেরো পরে যখন নিস্তার পেল তাঁর মুখ মাথা, তখন দাড়িগোঁফের জায়গায় জ্বালা ধরে গেছে, আর মাথার মাঝখানে কয়েক গোছা চুল খোঁচা খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাহেব লোক্‌কা মাফিক্ বানিয়ে দিতে বলার ফল একেবারে ষোলআনা ফলে গেছে। তাতেই বা এল গেল কি, মাথা থেকে টুপি না খুললেই চলবে। আচার্য মশায় ছুটলেন বাথরুমে, শশীকে বলে গেলেন নাপিত যা চায় দিয়ে দিতে। শশী স্রেফ আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে তাকে বিদেয় করে দিলে।

তারপর মিনিট কুড়ির মধ্যে যে ব্যক্তিটি জন্মলাভ করল, তাকে দেখে কার সাধ্য ধারণা করবে যে তিনিই তিন কোয়ার্টার আগে শান্ত-শিষ্ট, তৃপ্তি আর স্থৈর্যের অবতার শ্রীতূষ্ণীম্ আচার্য ছিলেন। পায়ের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত নিখুঁত সাজে সজ্জিত এক দেশী সাহেব পাইপ

মুখে চেপে গট্ গট্ করে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। শশী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"যদি তেনারা এসে পড়েন বাবু?"

সাহেব বললেন—"নার্ভাস হোস নে, দরজাটা বন্ধ করে রাখ।"

দরজা বন্ধ করতে করতে শশী আবার বললে—"জিনিসগুলো চাইলে কি দিয়ে দোব বাবু?"

সাহেব পাইপ মুখে চেপে ধরে বললেন—"নো, সারটেনলি নট্।" বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শশী দরজায় খিল আটকে দিলে।

ট্যাক্সিতে উঠে মিস্টার শুভার্থী শর্মা প্রথমে গেলেন নিউ মার্কেটে এক কৌটো তামাক আর একখানা রঙিন চশমা কিনতে। পাইপ থেকে ধোঁয়া বেরনো চাই তো। তারপর হ্যারিংটন স্ট্রীটের হানড্রেড় ওয়ান ক্লাবে গিয়ে হানা দিলেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—ঠিকানা কেন দেওয়া যাবে না মিস্টার ব্যাঙোর। ক্লাবের কেরানীবাবুটি তটস্থ হয়ে ঠিকানা দিয়ে দিলেন। শুভার্থী শর্মা ঠিকানা নিয়ে আবার ট্যাক্সিতে চড়লেন। ঠিকানাটি পড়ে দেখলেন, তাঁর আগের বাসার ঠিকানা সেই বাওয়ালী মণ্ডল রোডে। ঠিক হায়, বাছাধনকে ধরতে একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু কেরানীবাবুটি যে বললে, এর আগে কোনও মহিলা এসে খোঁজ করে নি ব্যাঙোর, এ ব্যাপারটা আবার কি রকম! তাহলে কি তিনি তাঁর সাহেবের কাছে না এসে অন্য কোথাও চলে গেলেন নাকি! আচ্ছা, ফ্যাসাদ বটে তো! যাক্ গে, ব্যাঙোর সঙ্গে তো দেখা করা যাক, তাহলেই সব-কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে। ব্যাঙোকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে গছিয়ে দোব সেই বাক্স-বিছানা আর হাঁড়ি। ব্যাস্—তারপর তিনি খুঁজে মরুনগে সেই দাঁত-খিচুনে কনক মৈত্রকে। বাপস্—ওই রকম মেজাজ নিয়ে মানুষটা স্কুলের চাকরি করে কি করে! মিস্টার শুভার্থী শর্মা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আরাম করে বসলেন গাড়ির কোণায়। বসে মতলব ভাঁজতে লাগলেন, কি কায়দায়

ব্যাঙ্গোকে প্রথম দর্শনেই একেবারে কাত করে ফেলবেন। যত বড়ই সাহেব হোক না ব্যাঙ্গো, হরমন হারকিউলিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর পাব্‌লিসিটি অফিসারের প্যাঁচে পড়ে বাছাধন বুঝতে পারবে, চাল দেওয়া কাকে বলে। গোঁফ দাড়ি লম্বা চুল ধুতি চাদর পাঞ্জাবির নিকুচি করেছে। লোকে চাকরবাকর বলে ভাবতেও ছাড়ে না।

ট্যাক্সির কোণায় কায়দা মাফিক বসে মিস্টার শর্মা রুমাল বার করে কপালটা নাকের ডগাটা একটু ঘসে নিলেন। নিয়ে মনে মনে একটা চুমকুড়ি দিলেন। আর-একবার যদি দেখাটা হয়ে যায় সেই কনক মৈত্রের সঙ্গে, তাহলে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে মেজাজ কাকে বলে। কিন্তু যদি—

ছ'তিন মুহূর্ত একটু আড়ষ্ট হয়ে রইলেন মিস্টার শর্মা। আরে দূর, তা কি হতে পারে কখনও। শশীটা অনর্থক ভয় ঢুকিয়ে দিলে মাথার মধ্যে। পয়লা নম্বরের স্টুপিড তো, একটা কিছু বলে বসলেই হল। "মেয়েলোকটাকে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে ভাল কাজ হল না বাবু"—ব্যাস্‌ দিলে একটা যা-তা আইডিয়া মাথায় ঢুকিয়ে। কেন? তিনি কি কচি খুকী যে ব্যাঙ্গো তাকে হাতে পেয়েই গিলে ফেলবে? আর ওই তো ক্লাবের বাবুটি বললেন, খুব সাদাসিদে দিল-দরিয়া মানুষ ব্যাঙ্গো। মদ খায়, বেশ করে। তা বলে মানুষটাকে একটা আস্ত রাক্ষস ভাববার কি দরকার। ভদ্রমহিলা যদি আসতেন ব্যাঙ্গোর কাছে, তাহলে ব্যাঙ্গো নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা একটা করে দিত তাঁর। খুবই সম্ভব, সত্যিই তিনি ব্যাঙ্গোকে খুঁজতে পি ১৯।৭।৩ গিয়ে ওঠেন নি। হয়ত ঠিকানা ভুল করেছিলেন, হয়ত ভুল ঠিকানাই নিয়ে গিয়েছিলেন। শশীটা আস্ত হাঁদা তো, জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে পারলে না, কোন সাহেবকে খুঁজছেন তিনি। সব ব্যাপারেই নার্ভাস হয়ে পড়ে—গরু কোথাকার।

বাওয়ালী মণ্ডল রোডের ফ্ল্যাটটি ছিল তিনতলায়। মিস্টার শর্মাকে তাঁর ছেড়ে যাওয়া ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছতে একটুও কষ্ট পেতে হল

না। সবই ঠিক আছে, শুধু দরজার গায়ের নেমপ্লেটটা বদলেছে। যেখানে এস. শর্মা ছিল, সেখানে লাগানো হয়েছে এইচ. ব্যানার্জি। কলিং বেল টিপলেন মিস্টার শর্মা, একটা বুড়ী নেপালী মেয়েমানুষ মুখ বার করলে।

"সাহেব হায় ?" মিস্টার শর্মা দাঁতে পাইপ চেপে গোঁ গোঁ করে উঠলেন। বুড়ী বার তিন-চার মাথা নাড়লে।

পকেট থেকে কার্ডখানা বার করে বুড়ীর হাতে দিয়ে শর্মা বললেন—"সেলাম দেও," বুড়ীটার মুখ দরজার ভেতর ঢুকে গেল। মিনিট দুয়েক পরে খদ্দরের লুঙ্গি খদ্দরের ফতুয়া পরা গোলগাল মুখ বেশ ভারী শরীরের একজন দেখা দিলেন দরজা খুলে।

হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথা থেকে আসছেন ?"

শর্মা পাইপ চিবিয়ে বললেন—"নিউ আলিপুর থেকে। মিস্টার ব্যাণ্ডোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

ভদ্রলোক বললেন—"আমিই হিরণ্ময় বাঁড়ুয্যে। দালালি করি, তাই ব্যাণ্ডো ব্যাণ্ডো করে অনেকে। আসুন ভেতরে।"

ভেতরে মাত্র দু'খানি ঘর আর বাথরুম রান্নাঘর। শর্মা ভাল করেই জানতেন ঘর দু'খানাকে মাস দুয়েক বাস করার ফলে। একখানিকে তিনি বসবার ঘর করেছিলেন, আর-একখানিতে খেতেন ঘুমতেন। এবার ব্যবস্থা পালটেছে। শর্মার শোবার ঘরখানি বোঝাই করা হয়েছে রাশি রাশি কাগজের তাড়া আর ছোট বড় বাক্স ঝুড়ি প্যাকেট দিয়ে। কোণের ঘরখানি, যেখানি শর্মা বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন, তাতে মেঝে জোড়া এক গদি পাতা হয়েছে। গদির ওপর ধবধবে চাদর, তাকিয়া গোটাকতক। কাঠের ক্যাশ-বাক্স দোয়াত কলম সব রয়েছে গদির এক পাশে। খান পাঁচেক মোটা মোটা খেরো বাঁধানো খাতাও রয়েছে সাজানো। এক কোণে একটা ব্রাকেটে গণেশ ঠাকুর বসে আছেন আর দেওয়ালের গায়ে কালিঘাটের কালী ঝুলছেন। বুঝতে মোটে কষ্ট হল না, হিরণ্ময় বাঁড়ুয্যে খাঁটী দেশী মতে ব্যবসা করেন।

হিরণ্ময়বাবু বললেন—"বসুন। চেয়ার-টেয়ার নেই আমার, বসতে আপনার অসুবিধে হবে।"

শর্মা সাহেব পাইপটাকে নিবতে নিবতে বললেন—"খামকা এগুলো পরে এলাম।"

হিরণ্ময়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"তার মানে ?"

"মানে কপালের দুর্ভোগ আর কি, বুঝলেন না। উঃ, এখনও জ্বালা করছে মশাই মুখখানা। ব্যাটা মেড়ো নাপিত একেবারে ছুলে ছেড়ে দিয়েছে।" বলতে বলতে তিনি তাঁর রঙিন চশমাখানা খুলে আছড়ে ফেললেন গদির ওপর। তারপর হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন।

হিরণ্ময়বাবু তাঁর কোমরের কষি আঁটতে আঁটতে বললেন—"মেড়ো নাপিতের কথা বলছেন ? ও ব্যাটাদের অস্তরের কাছে গাল পাততে নেই মশায়, ওরা একেবারে চশমখোর। চামড়া নিয়ে তবে ছাড়ে।"

শর্মা সাহেব জুতো খুলে পা মুড়ে বসে পড়লেন গদির ওপর। বসে জিজ্ঞাসা করলেন—"আগে আপনি পি ১৯।৭।৩ নম্বর নিউ আলিপুরে থাকতেন ?

হিরণ্ময়বাবুও ততক্ষণে বসে পড়েছেন তাকিয়া হেলান দিয়ে। বললেন—"থাকতাম বইকি। আরও কত জায়গাতেই তো থাকতাম। কোথাও টিকতে পারলাম না। এ বাড়িটাও ছাড়ব ছাড়ব করছি।"

শর্মা সাহেব সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন ? আপনিও বুঝি একঘেয়েমি পছন্দ করতে পারেন না ?"

"একঘেয়েমি—হুঁঃ"—হিরণ্ময়বাবু তাঁর মাঝারি সাইজের ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"একঘেয়েমির চেয়ে মিঠে কিছু আছে মশায় ? একবার যা ভাল লাগল, বরদাস্ত হয়ে বসল যা একবার, তা কি আর ছাড়তে আছে কখনও ? আঁকড়ে ধরে চক্ষু বুজে জীবনটা কাটিয়ে দিলেই নিশ্চিন্তি। একদম মার দিয়া কেল্লা

যাকে বলে। কিন্তু তা কি আর হবার জো আছে। সবই যে হাত ফসকে পিছ্‌লে পালায়।"

শর্মা আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তবে হরদম বাড়ি বদলাচ্ছেন কেন ?"

হিরণ্ময়বাবু বললেন—"বাড়ি কোথা মশায়, এ হচ্ছে বাসা। যে কদিন বরদাস্ত হল, রইলাম। তারপর আর-এক বাসায় উঠে গেলাম। বরদাস্ত মানে—আমার বরদাস্ত নয়, আমার পাড়া-প্রতিবাসীর বরদাস্ত।"

শর্মা একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন—"তা পাড়া-প্রতিবাসীর অব্‌জেক্‌শান আপনি শোনেন কেন ? আপনার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তারা হস্তক্ষেপ করার কে ?"

হিরণ্ময় বললেন—"তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বা আমি হাত দি কি করে ? তারা যখন স্বাধীন মানুষ হিসেবে মারতে তাড়া করে, তখন আমায় বাঁচায় কে ?

"মারতে তাড়া করে। কি সাংঘাতিক কথা ! মারবে কেন ?" চোখ কপালে তুলে বললেন শর্মা সাহেব।

"আমার একটা সামান্য দুর্বলতার জন্যে," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন হিরণ্ময়বাবু। "এ কথাও বলতে পারেন, সে আমায় স্বপ্নে দেখা দেয় বলে। রোজ সন্ধ্যার পর সে আসে, দেখা দেয় আমায়, কিন্তু ধরা দেয় না। তারপর আমি যাকেই দেখতে পাই, ধরতে ছুটি।"

"কি ভয়ানক কাণ্ড ! কে সে ?" ভয়ানক দমে যাওয়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার শর্মা।

হিরণ্ময়বাবু দু'হাত বুকের ওপর রেখে খুবই খাদে খুবই চাপা স্বরে বলতে শুরু করলেন—"কে সে ? কে সে ? সে কে ? এইটি হল চিরন্তন প্রশ্ন। এর একমাত্র উত্তর—সে আমার চিরন্তনী। সে আমার চিররহস্যময়ী চিরনীহারিকা। সে যে কে, তা আমি বলব না, বলতে পারব না, পারব না, পারব না।" বলতে বলতে

হিরণ্ময়বাবু কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। টপ্‌ করে উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে, এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন হাতে একটা কালো বোতল নিয়ে। বোতল নিয়ে ধপাস করে গদির ওপর বসে পড়লেন। তারপর বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে চোঁ-চোঁ করে খানিকটা টেনে নিলেন চোখ বুজে।

ব্যাপার দেখে মিস্টার শর্মা গদির কিনারায় সরে এসে আবার জুতো পায়ে দিয়ে ফিতে কষতে শুরু করলেন। ফিতে বাঁধা শেষ হবার আগেই চোখ খুললেন হিরণ্ময়বাবু। বোতলটা ছ'হাতে কোলের ওপর চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠলেন—"ওকি! ওকি! ওকি! জুতো পরছেন যে। বললেন না তো দাদা, কেন এসেছেন এ হতভাগার কাছে। বলুন, বলে যান, নয়ত আজই আমি আত্মহত্যা করব। লাফিয়ে পড়ব ওই বারান্দা থেকে নিচের ফুটপাথের ওপর, ছাতু হয়ে যাব একেবারে।"

এমন ফ্যাসাদে কখনও পড়েন নি মিস্টার শর্মা তাঁর একঘেয়েমি-হীন জীবনে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"শুনুন হিরণ্ময়বাবু, আজ সকালে একজন খুঁজতে এসেছিলেন আপনাকে আমার ওখানে। নিউ আলিপুরের পি ১৯।৭।৩ নম্বরে তো আপনি ছিলেন আগে। এখন আমি থাকি সেখানে। যিনি এসেছিলেন, তিনি তাঁর বাক্স-বিছানা রেখে গেছেন।"

হিরণ্ময়বাবু ততক্ষণে আরও খানিক গিলে ফেললেন। বোতলটা ঢিপ করে বসিয়ে রাখলেন গদির ওপর। বোতল বসল না, গড়াতে লাগল। হিরণ্ময়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—"এসেছিল? মাইরি সে এসেছিল? মাইরি?" শর্মার বুকের ওপর নিজের তর্জনীটি ঠেকিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ভারি অপূর্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হিরণ্ময়বাবু শর্মা সাহেবের মুখের দিকে।

শর্মা বললেন—"হ্যাঁ, কাউকে পাঠিয়ে দিন না আমার সঙ্গে, তাঁর বাক্স-বিছানা দিয়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু—" হিরণ্ময়বাবু খুব গোপনীয় একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন শর্মার কানের কাছে মুখ নিয়ে।

"কিন্তু সে গেল কোথায় ?"

"তিনি আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।" জবাব দিলেন মিস্টার শর্মা।

"ঠিক হায়—" এক থাপ্পড় লাগালেন হিরণ্ময়বাবু শর্মার পিঠে। "ঠিক হায়, আমিই তাকে খুঁজে বার করব। দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান দাদা দয়া করে, লুঙ্গিটা ছেড়ে আসি। আমিই যাচ্ছি আপনার সঙ্গে, আগে তার বাক্স-বিছানা নিয়ে আসব, তারপর তাকে খুঁজে নিয়ে আসব।"

বলতে বলতে হিরণ্ময় ব্যানার্জি ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গিয়ে বারান্দাতে দাঁড়িয়েই তাঁর সাজপোশাক পরতে লাগলেন। বুড়ী নেপালী মেয়েমানুষটি কোথা থেকে তাঁর কোট প্যান্ট জুতো মোজা এনে উপস্থিত করলে। হিরণ্ময়বাবু তারই সাহায্যে সব-কিছু শরীরে চড়িয়ে ফেললেন। তারপর মিস্টার শর্মার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। মুখ কিন্তু তাঁর বন্ধ নেই। ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন—"আমি তাকে বার করবই, ধরবই তাকে খুঁজে, কোথায় যাবে সে আমার হাত ছাড়িয়ে, কোথায় যাবে ? যাবে কোথায় ?"

ওধারে গুরুতর পরামর্শ হয়ে গেল দুই বোনে। শ্রীমতী সুজাতা দেবী দিদির স্বামীর বাড়িতে গিয়ে কি কি দেখে এলেন, শুনে এলেন জেনে এলেন যে সমস্ত বৃত্তান্ত, তা সবিস্তারে জানিয়ে দিলেন দিদিকে। দিয়ে দু'হাত মোচড়াতে মোচড়াতে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন—"তুই কিচ্ছু ভাবিস নি দিদি, চুপ করে বসে থাক এখানে। এর উপযুক্ত প্রতিবিধান আমি করবই, করবই, করবই।"

শ্রীমতী কনক মৈত্র কোনও রকমে একটা নিঃশ্বাস চেপে বললেন —"এ রকম তো কখনও ছিল না ভাই, সে। মদ তো দূরের কথা,

কখনও সিগ্রেট পর্যন্ত খায় নি। আমার সঙ্গেই ভাল করে কথা বলতে পারে না যে মানুষ, সে অন্য মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে, এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না ভাই।"

সুজাতা বিছানা ছেড়ে নেমে মেঝের ওপর পা ঠুকে বললেন—"বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিচ্ছু করার দরকার করে না কোনও পুরুষ-মানুষকে। ওরা সব পারে। প্রথমেই আমার একটু খটকা লেগেছিল, কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে আছে দু'মাসের ওপর, তা আমরা কি দোষ করলুম যে একবার দেখাটা পর্যন্ত করে গেল না। তারপর যখন স্টেশনে গেল না তোকে আনতে—"

কনক বাধা দিয়ে বললেন, "ট্রেনটাও তো ভাই আট ঘণ্টা লেটে পৌঁছল।"

"পৌঁছল না ঠিক সময় ট্রেন, কাজেই তিনি আর কি করবেন। ফিরে চলে গেলেন। কচি খোকা কিনা, স্টেশনে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারতেন না যে ক'ঘণ্টা লেট রান করছে ট্রেন? বউ আসছে সেই গাড়িতে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে ছুটে আসছে ওঁর জন্যে, গাড়ি লেট্। কি অবস্থায় বউটা এসে নামবে তা চিন্তা করার তাঁর অবসর হল না। তিনি চলে গেলেন। যাবেনই তো, ওধারে ক্লাব-সহচরী যে পথ চেয়ে বসে আছে। তুই চুপ কর দিকিনি দিদি, আর তোকে ভালমানুষি ফলাতে হবে না।" নিদারুণ বিতৃষ্ণায় মুখখানা কিম্ভুত-কিমাকার করে সুজাতা দেবী চুপ করলেন।

কনক মৈত্র এবার আর নিঃশ্বাস চাপতে পারলেন না। নিঃশ্বাসটি ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে কি রকম যেন চুপসে গেলেন তিনি। ছাড়ো-ছাড়ো ভাঙা-ভাঙা কয়েকটি কথা বেরল তাঁর বুকের ভেতর থেকে।

"সবই আমার কপাল ভাই। সেই মানুষ নয়ত অমন হয়ে যাবে কেন। তাহলে এবার আমি করব কি?"

সুজাতা দেবী ফিরে গিয়ে বসলেন দিদির পাশে বিছানার ওপর। বসে অল্প একটু সময় ভুরু কুঁচকে মাথা হেঁট করে নিজের পায়ের রঙ

করা নখগুলো ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন—"হয়েছে—পেয়ে গেছি।" বলেই ফটাস্ করে এক হাতের ওপর আর-এক হাত দিয়ে চাপড় দিলেন। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন বিছানা থেকে, বোঁ করে এক পাক ঘুরে নিলেন ঘরের মধ্যে। শেষে দিদির সামনে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে অনেক কথা বলে গেলেন। শুনতে শুনতে শ্রীমতী কনকের মুখে বার কতক আলোছায়ার খেলা দেখা গেল। সুজাতা দেবী দিদিকে ছেড়ে ঘরের মধ্যে আবার এক পাক ঘূর্ণি নাচ নেচে নিলেন।

শ্রীমতী কনক বললেন—"যা পারিস তুই কর ভাই, আমি আর ভাবতে পারছি না। শুধু জেঠু যেন কিছু জানতে না পারে, তাহলে আমি আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।"

"ঠিক হায়।" সুজাতা দেবী আবার এক চাপড় লাগালেন নিজের দুই হাতে। তারপর টপ্ করে হাতে বাঁধা ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন—"ইস্, বড্ড দেরি হয়ে গেল। তৈরী হয়ে নে, তৈরী হয়ে নে।"

কনক বললেন—"আমাকে আর জড়াচ্ছিস কেন ভাই, যা পারিস তুই-ই করে আয়।"

সুজাতা এক হেঁচকায় টেনে নামালেন তাঁর দিদিকে বিছানা থেকে। বললেন—"চুপ, মুখ বুজে যা বলছি—করে যা। দূরে দাঁড়িয়ে থাকবি, দেখবি ও রকম পুরুষকে কি করে টেনে আনি আমি। ঠিক যেমন করে মাকড়সার জালে মাছি পড়ে, তেমনি ভাবে তিনি আমার জালে পড়বেন। তারপর—"

বলতে বলতে দিদিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লালবাজারের নকুড় মামা গোঁফের ডান দিকটা ধরে বার কতক পাক দিয়ে তাঁর ভাগনীকে বললেন—"দাঁড়া দাঁড়া, মেলা বকবক করিস নি তুই হিমি। বুড়ো হলি, বকবক করা স্বভাব গেল না

এখনও। এখন চুপ করে বসে থাক তুই, আমি সব জেনে নি স্থবিমলবাবুর কাছ থেকে।" বলে স্থবিমলবাবুর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা স্থবিমলবাবু, এমনও তো হতে পারে যে আপনার স্ত্রী মোটে স্টার্টই করেন নি সেখান থেকে।"

ডক্টর মৈত্র নকুড় মামার ভাঁটার মত ছুই চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা ঘটলেও ঘটতে পারে। কনক হয়ত কোনও কারণে আটকা পড়ে গেছে। এখন পর্যন্ত রওয়ানাই হতে পারে নি।

ভাগনী হৈমন্তী চুপ করে থাকার পাত্রী নন।. খুট্ করে বলে ফেললেন—"তাহলে এতক্ষণে একটা তার আসত।"

নকুড় মামা বললেন—"বলেছিস ঠিক বটে। কিন্তু আসল কথা সেখানে একটা খোঁজ নিতে আপত্তি কি। দাঁড়া—" বলে কলিং বেল টিপলেন। তাঁর সহকারী ঘরে ঢুকলেন তৎক্ষণাৎ। নকুড় মামা স্থবিমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"সেই ত্রিপুর কোন থানার আণ্ডারে জানেন?"

,ডক্টর মৈত্র বললেন—"আজ্ঞে—জানি বইকি। থানার সামনেই গার্লস স্কুল, আমি একবার গিয়েছিলাম যে সেখানে।"

নকুড় মামা বললেন—"গুড!" তারপর সহকারীর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কি বলে দিলেন। সহকারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নকুড়মামা তাঁর বাঁ হাতের আঙুলে আটকানো ভয়াবহ চুরুটটা মুখে তুললেন। তুলে সেই বাঁশের মত বস্তুটা দাঁতে চেপে ধরে স্থবিমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার স্ত্রীর ফোটো এনেছেন সঙ্গে?"

ডক্টর মৈত্র আবার ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ আনেন নি। নকুড় মামা বললেন—"হিমিটা আমার ভাগনী হলে হবে কি, এখনও মানুষ হল না। পুলিসের কাছে এলে ফোটোখানাও সঙ্গে আনতে হয়, এটুকু বুদ্ধিও যোগাল না ওর ঘটে।"

নকুড় মামার ভাগনীজামাই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। এক ধাক্কায় চেয়ারখানাকে দু'হাত পিছিয়ে দিয়ে বললেন—"ফোটো? মানে ওর স্ত্রীর ফোটো? আনছি এখুনি আমি। ওদের দু'জনের ফোটোই আছে আমার কাছে। সেই যে হে মৈত্র, তোমার বিয়ের পর তোমাদের ফোটো তুলেছিলাম আমি—"

নকুড় মামা বললেন—আহা, ছটফট করছ কেন? বোস না ঠাণ্ডা হয়ে। এখন সেই নিউ আলিপুরে যেতে কতটা সময় লাগবে জান? ফোটো পরে পেলেও চলবে, হয়ত দরকারই করবে না ওসবের। আচ্ছা সুবিমলবাবু, কলকাতায় আপনাদের কোনও আত্মীয়স্বজন নেই? আপনার বা আপনার স্ত্রীর জানাশোনা কেউ নেই?"

সুবিমলবাবু আবার মাথা নাড়লেন—অর্থাৎ নেই।

নকুড় মামা বললেন—"গুড। আচ্ছা সুবিমলবাবু, এবার একটা খুব ডেলিকেট প্রশ্ন করব আপনাকে। যেমন ধরুন—এই—এই—আচ্ছা ধরুন আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে আপনার স্ত্রী একটু বদরাগী গোছের মানুষ কি না, আপনি কি জবাব দেবেন তার?"

ডক্টর মৈত্র বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন একবার। প্রফেসার বোস বললেন—"না না না, সে রকম নয় ওর বউ, একদম মাটির মানুষ যাকে বলে—"

নকুড় মামা এক ধমকে থামিয়ে দিলেন তাঁর ভাগনীজামাইকে—"আহা, তুমি বাবু অত বকছ কেন? তোমার কাছ থেকে কে শুনতে চাচ্ছে ওঁর স্ত্রীর কথা। এ তো ভ্যালা আপদ হল দেখছি।"

নকুড় মামার সহকারী ঘরে ঢুকলেন একখানা কাগজ হাতে নিয়ে। কাগজখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নকুড় মামা বললেন—"নাঃ, তিনি পরশুই রওয়ানা হয়েছেন ঠিক সময়—ত্রিপুর থানা জানালে। আচ্ছা এবার ওঠ তোমরা, চল একবার সুবিমলবাবুর বাড়িটা ঘুরে আসি।" নকুড় মামা উঠে পড়লেন।

উঠলেন সকলেই। হৈমন্তী দেবী বললেন—"সেখানে গিয়ে কি

হবে? সেখানে এসে সে লুকিয়ে বসে আছে বুঝি। সবতাতেই মামার বাড়াবাড়ি।”

“বুঝবি না রে তুই পাগলী, বুঝবি না,” ভুঁড়িতে বেল্ট আঁটতে আঁটতে নকুড় মামা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেসে উঠলেন। বেরিয়ে এলেন টেবিলের ও-পাশ থেকে, দরজার দিকে চলতে চলতে বলতে লাগলেন—“আমাদের কাজের শুরু হচ্ছে ঘটনাস্থলের কাছ থেকে। আগে গিয়ে দেখি, যিনি হারিয়েছেন তাঁর স্বামীর স্টেটমেণ্ট সাচ্চা কি না, তারপর তো অ্যাক্‌শান্ নেব। কত রকমের কত স্টেটমেণ্টই তো দেয় মানুষ। কিন্তু কাকে কান নিয়ে গেল বললেই তো আর কাকের পেছনে ছোটা যায় না। আগে মাথায় হাত দিয়ে দেখে নিতে হয়, কান দুটো যথাস্থানে আছে কি নেই।”

এতক্ষণ পরে ডক্টর সুবিমল মৈত্র কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন—“হোয়াট ডু ইউ মিন স্যার?”

“মিন অবশ্য এখন কিছুই করছি না। শুধু রেগুলার প্রোসিডিওর ফলো করছি। মানে—এমনও তো অনেক ক্ষেত্রে হয় ডক্টর যে কেউ কাকেও খুন করে এসে হারিয়ে গেছে বলে স্টেটমেণ্ট দিতে পারে পুলিসকে। হতে পারে কি না পারে বলুন?” নকুড় মামা বাঁকা চোখে সুবিমলবাবুর দিকে তাকালেন।

সুবিমলবাবু বললেন—“কি সর্বনাশ!”

হৈমন্তী দেবী বললেন—“দেখ কাণ্ড!”

প্রফেসার বোস বললেন—“কি ফ্যাসাদ রে বাবা।”

নকুড় মামার পিছু পিছু সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

লাগল হুলস্থুল কাণ্ড নিউ আলিপুরের পি ১৯।৭।৩ নম্বরের সামনে। “কনক মৈত্র গার্লস হাই স্কুল, ত্রিপুর” ছাপ মারা বাক্স-বিছানা কিছুতেই ছোট ট্যাক্সির পেছনে আঁটে না। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় থপাস করে বসে পড়লেন পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পায়ের সামনে। বসে দু'হাতে তার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন।

"হেই বাবা পাঁয়জী না পিঁয়াজী, লে চলো বাবা মালপত্র, হামকো জান্‌সে মেরো না বাবা বুকমে পা দিয়ে। লেও বাবা, লেও দশঠো রূপেয়া। কুছ পরোয়া নেই। আউর দশঠো দে দেগা বাড়িমে পৌঁছায় দেনে সে—"

অগত্যা ঠেলাঠেলি করে বিছানাটা কোনও রকমে ঢোকানো হল ট্যাক্সির মাল নেবার খোপে। ডালাটা কিন্তু বন্ধ হল না। মস্ত বড় স্যুটকেসটা পেছনের বসবার জায়গায় তুলে দিলে শশী। হিরণ্ময় বাবু ড্রাইভারের পাশে আসন গ্রহণ করলেন। গলায় দড়ি বাঁধা হাঁড়িটা টপ্ করে তুলে দিলেন মিস্টার শর্মা হিরণ্ময়বাবুর কোলের ওপর। হিরণ্ময়বাবু চেঁচাতে লাগলেন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে।

"ভুলবেন না দাদা, এ হতভাগাকে ভুলবেন না। দয়া করে একটি বার পায়ের ধুলো দেবেন এ অভাগার কুঁড়েঘরে। নয়তো আত্মহত্যা করব,স্রেফ ফুটপাথের ওপর লাফিয়ে পড়ে ছাতু হয়ে যাব। কিংবা খাব খানিক—"

আর শুনতে পাওয়া গেল না, পেছনে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে গভীর গর্জন করে ট্যাক্সি উধাও হয়ে গেল।

মিস্টার শর্মা আর শশী বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। শশী দরজার খিল আঁটলে ভাল করে। শিস দিতে দিতে তিন লাফে ওপরে উঠে গেলেন মিস্টার শর্মা। শোবার ঘরে গিয়ে টাই-টা একটু ঠিক করে নিলেন। মুখে একটু পাউডার দিয়ে ভাল করে মুছে নিলেন রুমালে। তারপর হাঁক দিলেন শশীকে মিস্টার শর্মা-স্টাইলে।

"শশী—এই স্টুপিড, ইধার আও।"

বহু দিন পরে শশী চাঙ্গা হয়ে উঠল তার মনিবের আদি এবং অকৃত্রিম মেজাজী ডাক শুনে। বাস্তবিকই তার অরুচি ধরে গিয়েছিল মনিবের আচার্যগিরির প্যাঁচ দেখে দেখে। এ কি রে বাবা! কোথাও কিছু নেই, একদিন বাবু দাড়ি রাখা শুরু করলেন, তারপর মাছমাংস ছাড়লেন। কোটপ্যাণ্ট সব বাক্সয় উঠল, আরম্ভ হয়ে গেল,

এটা ছুঁস নে, ওটা ধরিস নে, ওখানটায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে। বাসে চেপে খিদিরপুরে গিয়ে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল আনতে হয়েছে শশীকে। এ রকম করলে কি আর মানুষ বাঁচে। গলার আওয়াজটা পর্যন্ত বদলে গেল বাবুর। মিহি সুরে—শশীভূষণ এধারে একবার এস তো বাপু। এই কি মনিবের ডাক নাকি? সব যেন মিইয়ে গিয়েছিল এতদিন, এবার আবার তেতে উঠল। অনেক দিন পরে ডাকার মত ডাক শুনে শশী ছুটে গিয়ে উপস্থিত হল মনিবের সামনে।

মিস্টার শর্মা আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে বললেন—"যা, চলে যা এখুনি পার্ক স্ট্রীটের সেই হোটেলটায়। ফ্রায়েড রাইস্ আর ফাউল রোস্ট আর মাছের যা ভাল পাওয়া যায়, যা নিয়ে আয় দু'জনের মত। সন্ধ্যার পরই খেতে বসব। যা, যাবি আর আসবি, ট্যাক্সি নিয়ে যা মোড় থেকে।"

শশী ছুটল। অর্ধেক সিঁড়ি নেমে আবার তিন লাফে উঠে এল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"দরজাটা বন্ধ করলে—"

মিস্টার শর্মা খিঁচিয়ে উঠলেন—"আঃ, ফের নার্ভাস হচ্ছিস? স্টুপিড কোথাকার। যা বললাম, করে আয় আধ ঘণ্টার ভেতর।" আর বাক্যব্যয় না করে শশী ছুটল।

মিস্টার শুভার্থী শর্মা তাঁর পুরনো স্পিরিট ফিরে পেয়েছেন। নাক মুখ টাই ঠিক করে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে নিলেন তাঁর ঘরখানা। ঘরের মধ্যে অল্প অল্প আঁধার হয়ে উঠেছে তখন। সুইচ টিপলেন গোটা তিনেক, দেওয়ালের গায়ে একটা আলো জ্বলে উঠল, একটা ঝুলন্ত আলো জ্বলল, একটা টেবল্ ল্যাম্প বসানো ছিল চাদর-চাপা-দেওয়া একটা টেবিলের ওপর, সেটা থেকে সবুজ আলো বেরতে লাগল।

মিস্টার শর্মা সব কটা আলো দেখে নিয়ে বললেন—"রাবিশ, কালই এগুলো পালটাতে হবে। এত কম আলোয় ভদ্রলোকের চলে!" বলে এগিয়ে গেলেন টেবল্ ল্যাম্পটার কাছে। সেটাকে

টেবিলের ওপর থেকে তুলে বসিয়ে দিলেন একটা আলমারির মাথায়। তারপর সেই টেবিল থেকে চাদরখানা টেনে তুলে ফেললেন। বেরল একটা জাঁদরেল রেডিওগ্রাম। রেডিওগ্রামের চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরলেন একটা ফরেন স্টেশন, অদ্ভুত সুরের এক জগাখিচুড়ি সংগীত শুরু হল।

তারপর মিস্টার শর্মা তাঁর বিছানার ওপর বসলেন পা ঝুলিয়ে। বসে তামাক ঠাসতে শুরু করলেন পাইপে। এধারে জুতোসুদ্ধ পা নেড়ে গানের তালে তাল রাখা চলতে লাগল।

পাইপে অগ্নি সংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন লাগল দরজার বাইরে। চাপা গলায় কে চিৎকার করে উঠল—"এই, তোমরা সব গেলে কোথায়? চেঁচিয়ে মাথা ধরে গেল নিচে থেকে। এ বাড়ির চাকরবাকরগুলো সব জন্তু না কি?"

আর একটু হলেই পাইপটা খসে পড়ছিল মিস্টার শর্মার ঠোঁট থেকে। সামলে নিয়ে নেমে পড়লেন তিনি বিছানা ছেড়ে। প্যাণ্টের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁতে পাইপ চাপা সুরে বললেন—"কাম্ ইন প্লিজ।"

সেই বিচিত্র সুরের আহ্বান শুনে যিনি দরজার সামনে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁর পা দু'খানি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। মিস্টার শর্মা হাত বাড়িয়ে রেডিওর আওয়াজটা আরও একটু কমিয়ে দিলেন। দিয়ে আবার সেই অদ্ভুত আওয়াজ বার করলেন গলা দিয়ে। এবার বাঙলায়—"আসুন, দয়া করে ভেতরে আসুন।"

দরজার চৌকাঠের এ পারে পা দিলেন যিনি তাঁকে দেখে এক মুহূর্ত একটু থতিয়ে গেল মিস্টার শর্মার স্পিরিট। পরমুহূর্তেই একেবারে উথলে উঠল তাঁর অভ্যর্থনা।

"আসুন আসুন, বসুন ওই চেয়ারটায়। কি সৌভাগ্য আমার, আপনার মত মানুষের চরণধূলি পড়ল এই দরিদ্রের কুটীরে।"

শ্রীমতী সুজাতা দেবীর একটু সময় লাগল সামলাতে, তার কারণ হচ্ছে তাঁর সাজসজ্জা। মাকড়সা যেভাবে মাছি ধরে, তেমনি করে ভগ্নীপতিকে জালে ফেলে ধরবার জন্যে তিনি তাঁর আপাদমস্তক এমন কায়দায় সাজিয়ে এনেছেন যে তা নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াতে সত্যিই একটু বাধবাধ ঠেকে বইকি। সারা শরীরের অনেক জায়গার অনেকটা করে মাংস অনর্থক অনাবৃত হয়ে রয়েছে। একটা চকচকে কালো জামা সেঁটে বসে গেছে গায়ে, তাতে ঢাকা পড়েছে অতি অল্প অংশই বুক-পিঠের। সামনে গলার নিচে থেকে প্রায় বুকের মাঝা-মাঝি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আবার ইঞ্চি তিনেক পরেই নাভিস্থল পর্যন্ত কিচ্ছু নেই। পিঠের দিকে প্রায় সবটুকু জায়গাতেই কিচ্ছু নেই। সেই রকমের জামার ওপর দিয়ে যে শাড়িখানি আলতোভাবে পেঁচানো রয়েছে, খুব সম্ভব সে কাপড় বুনেছে সত্যিকারের মাকড়সাতেই। নাভির ঠিক নিচেই ইঞ্চি দুয়েক চওড়া সোনালী জরির এক কোমরবন্ধনী একটি অদ্ভুত রঙের সায়াকে আটকে রেখেছে। মাকড়সার তৈরী শাড়ি অবশ্য ঘুরে গেছে সেই সায়ার ওপর দিয়েও, তাতে সায়ার ভাঁজগুলো আরও যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সায়ার তলার দিকটা পৌঁছেছে পায়ের গোছ পর্যন্ত, সেখানে আবার ইঞ্চি তিনেক চওড়া টকটকে লাল রঙ। তারপর শ্রীচরণ দু'খানির চোদ্দ আনা অনাবৃত পাদুকা। চকচকে কালো আধ ইঞ্চি চওড়া দুটি ফিতে শুধু আটকে রেখেছে চরণতলের আধ বিঘত উঁচু হিল দুটোকে। পায়ের দশটি আঙুলের আর হাতের দশটি আঙুলের সব কখানি নখ ঘোর লাল রঙে রাঙানো। আসল কথা, ঈষৎ গোলাপী রঙের মাংসের ওপর দু'তিন রকমের চড়া রঙের বৈপরীত্য ফোটাতে পারলে কি অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়, সেটুকু চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাবার জন্যেই যেন সেই বিচিত্র সাজে সজ্জিতা হয়ে এসেছেন শ্রীমতী সুজাতা দেবী। কিন্তু আশা করতে পারেন নি তিনি যে হরমন হারকিউলিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর স্বনামখ্যাত পাবলিসিটি

অফিসারের সামনে পড়তে হবে তাঁকে, যাঁর গলার টানটাই এমন ধরনের যেন গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়।

মিস্টার শর্মা ইতিমধ্যে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন তাঁর যা দেখার। দেখে তিনি ষোলআনা সাবধান হয়ে নিয়েছেন। চট্ করে ধরে ফেলেছেন তিনি, ওই জাতের সাজপোশাকের অর্থ। যে সাহেবকে পাকড়াও করার আশায় বাক্স-বিছানাসহ উপস্থিত হয়েছেন উনি, তার মাথাটি ভাল করে চর্বণ না করে কিছুতে ছাড়বেন না। সাহেব তো বাক্স-বিছানা নিয়ে সটকাল, এখন ভালয় ভালয় এই জাত-সাপকেও সেখানে পাচার করতে পারলে বাঁচা যায়। আর-একবার তিনি বার করলেন তাঁর সেই গায়ে-ছুঁচ-ফোটানো সুর। দুই কাঁধে বিলিতী কায়দায় এক ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—"নাউ—বলুন দয়া করে, কি করতে পারি আমি আপনার জন্যে ?"

শ্রীমতী সুজাতা দেবীও ততক্ষণে তৈরী করে ফেলেছেন নিজেকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"এ বাড়ির মালিককে দয়া করে একটু সংবাদ দিন না।"

প্যাণ্টের পকেটে দু'হাত ঢোকানো অবস্থায় মাথা ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত নুইয়ে মিস্টার শর্মা বললেন—"আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে সেই অকিঞ্চন লোকটাই আপনার সামনে খাড়া রয়েছে।"

সুজাতা দেবী দাঁতে দাঁত টিপে উচ্চারণ করলেন—"অ—আই সি।" তারপর একটু থেমে থেকে খুব সুর টেনে বললেন—"তাহলে কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়ে গেছে। আপনাকে ঠিক আমি খুঁজছিলাম না। আচ্ছা, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা যদি জানতে পারতাম।"

মিস্টার শর্মা বাঁ হাতখানা বার করলেন পকেট থেকে, হাতে একখানি ছোট্ট কার্ড। বাড়িয়ে ধরে বললেন—"একশোবার, একশোবার জানতে পারেন। খুব একটা ভারি গোছের কিছু নয়,

অতি সাধারণ নাম, একেবারে আটপৌরে গোছের নামও বলতে পারেন।”

সুজাতা দেবী কার্ডখানার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন—“অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিলাম। আর একটু কষ্টও দিতে হচ্ছে। দয়া করে আপনার চাকরবাকর কাউকে ডেকে দেবেন একবার। খানিক আগে ভুল করে এ বাড়িতে আমি একটা বেডিং আর একটা বাক্স রেখে গিয়েছি। সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।”

“বেডিং আর বাক্স!” ওপর দিকে চোখ তুলে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় একটুখানি সময় স্থির হয়ে রইলেন মিস্টার শর্মা। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে কপালে ছটো টোকা দিলেন। তারপর চোখ নামিয়ে বললেন—“হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। কে যেন—কেন যেন খানিক আগে এসে নিয়ে গেল সেগুলো—!” খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন মিস্টার শর্মা।

এবং সঙ্গে সঙ্গে সযত্নে তৈরী করা মুখোশটা খসে পড়ল সুজাতা দেবীর মুখ থেকে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—“নিয়ে গেছে! কি সর্বনাশ!”

মিস্টার শর্মা মনে মনে একটি চুমকুড়ি কেটে মনে মনেই বললেন—এবার পথে এস জাছ।

মুখে ফুটে উঠল তাঁর অকপট বিস্ময়। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—“কেন? কেন? আপনার জিনিস আপনার লোকই তো এসে নিয়ে গেলেন।”

সুজাতা দেবী আরও বিস্মিত হয়ে বললেন—“আমার লোক! কে আমার লোক? কি পরিচয় দিলে সে?”

মিস্টার শর্মা বললেন—“কি যেন নামটা বলে গেলেন ভদ্রলোক! আহা-হা, নামটাও যে কি রকম গোলমাল হয়ে গেল এর মধ্যে। কিন্তু তিনি তো স্পষ্টই বললেন যে কনক মৈত্রের কাছ থেকে আসছি। জিনিসগুলো নিতে চাই।”

সুজাতা দেবী এবার খেপে গেলেন। দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে বললেন—"নামটাও ভুলে গেছেন এর মধ্যে? যে-কেউ এসে চাইলেই জিনিসগুলো দিয়ে দিতে হবে নাকি? তার ঠিকানাটাও রাখার দরকার মনে হল না আপনাদের?"

মিস্টার শর্মা পাইপে গোটা দু'তিন টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ওপর দিকে মুখ তুলে। তারপর নিজেকেই যেন নিজে শুনিয়ে দিলেন—"ডিসগাস্‌টিং এফেয়ার্স সব, কি আমাদের দায় পড়েছে কারও জিনিসের খোঁজখবর রাখার। জিনিসগুলো এখানে এনে ফেলতে কে যে বলেছিল, তাই যে ছাই বুঝতে পারছি না।"

সুজাতা দেবী ফোঁস করে উঠলেন—"কি! কি বললেন আপনি? মনে করেছেন, কিচ্ছু আমি বুঝছি না, নয়? আমি জানি সে জিনিস-গুলোর কি হয়েছে।"

শর্মা ভুরু কুঁচকে বললেন—"থ্যাঙ্ক য়ু, জানেন যখন তখন সেখানে গিয়ে খোঁজ করুন না, অনর্থক আমায় ট্রাবল্ দিচ্ছেন কেন?"

"কেন ট্রাবল্ দিচ্ছি আপনাকে?" সুজাতা দেবীর চোখ থেকে আগুনের ফিন্‌কি ছুটতে লাগল—"জানেন, এখনই আমি থানায় যেতে পারি।"

শর্মা আবার একবার নুইয়ে ফেললেন তাঁর মাথা কোমর পর্যন্ত। অমায়িক ভদ্রতা উথলে উঠল আবার তাঁর গলায়—"অনেক অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাই যান তাহলে দয়া করে। জিনিসপত্র হারালে থানাতেই তো যায় মানুষে। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি চড়াও হয়ে খামকা তাকে চোখ রাঙায় না।"

সুজাতা দেবী সট করে ফিরলেন, খট্‌খট্ করে দরজার কাছ পর্যন্ত চলে গেলেন। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ওধারে মুখ করেই বললেন—"তাই যাচ্ছি, থানাতেই যাচ্ছি, আপনার কিন্তু সুবিধে হবে না তাতে কিছু।"

শর্মার গলায় অতি তাচ্ছিল্যের সুর ফুটে উঠল—"তা হোক গে,

তার জন্য আপনি মাথা ঘামাবেন না। থানায় গিয়ে ভাল করে প্রমাণ দিয়ে দেবেন যে এ বাড়িতে আপনি আপনার জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিলেন। দু'একজন সাক্ষী অন্তত থাকে যেন।"

ঘুরে দাঁড়ালেন আবার সুজাতা দেবী, একটু যেন নরম শোনাল তাঁর সুর। বললেন—"তার মানে! আপনি—আপনারা মানবেন না নাকি যে জিনিসগুলো আমি রেখে গিয়েছিলাম!"

এক পা সামনে এগিয়ে গেলেন মিস্টার শর্মা। বললেন—"আপনিই কি থানায় গিয়ে বলতে পারবেন যে আমার সামনে আপনি জিনিসগুলো এ বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন?"

সুজাতা দেবীও আর এক পা এগিয়ে এলেন, আরও একটু যেন অসহায়তা ফুটে উঠল তাঁর গলায়—"সেই কথাই তো বলছি আপনাকে মিস্টার শর্মা, আপনার সেই দাড়িওয়ালা লোকটাকে একবার ডেকে দিন না। সে আর ওই আপনার শশীভূষণ কুণ্ডু এরা দু'জনেই তো আমায় বলেছিল হ্যারিংটন স্ট্রীটের হানড্রেড ওয়ান ক্লাবে যেতে। আমিও ছুটলাম। বাক্স-বিছানাটার কথা তত খেয়াল করলাম না তখন। জানতাম না তো যে এ বাড়িটা আপনার।"

শর্মা আরও একটু কাছে সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তা গেলেন না আপনি হ্যারিংটন স্ট্রীটে? কি করছিলেন এতক্ষণ? হ্যারিংটন স্ট্রীটের সেই ব্যাণ্ডো সাহেব এসেই নিয়ে গেছে আপনার জিনিসপত্র।"

"ব্যাণ্ডো সাহেব! সে আবার কে?" চেঁচিয়ে উঠলেন সুজাতা দেবী।

"যার কাছে আপনি এসেছেন, যে এই বাড়িতে ছিল আগে। যাকে আপনি রোজ সন্ধ্যার পর স্বপ্নে দেখা দেন, কিন্তু ধরা দেন না। তাই সে যাকে দেখতে পায় তখন, ধরতে ছোটে।" রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলো বললেন শুভার্থী শর্মা।

সুজাতা দেবী আঁতকে উঠলেন একেবারে—"বলেন কি শুভার্থী-

বাবু! আমি কেন সেই ব্যাঙো সাহেবের কাছে আসতে যাব! কি করে আপনি বিশ্বাস করলেন যে ওই রকম বদ্ধ পাগলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে?" গলায় কথা আটকে গেল সুজাতা দেবীর।

মিস্টার শর্মার বিলিতী বিলসন বিলকুল উবে গেল। সুজাতা দেবীর খুব কাছে সরে এসে খুবই বিপন্ন হওয়া স্বরে বললেন—"কি মুশকিলেই যে পড়া গেল আপনাকে নিয়ে কনক দেবী। তাহলে আপনি এসেছেন কার কাছে আগে সেইটে বলুন না।"

"কনক দেবী! আমি কেন কনক হতে যাব? এ আবার কি কথা!" আরও বিপন্ন শোনাল সুজাতা দেবীর স্বর। শুভার্থী শর্মার তখন খেপে যাবার মত অবস্থা, পাইপটাকে ঠক্ করে টেবিলের ওপর রেখে দু'হাত নাড়তে লাগলেন সুজাতা দেবীর সামনে।

"আপনি কনক মৈত্র নন? তবে আপনি কে, তাই আগে শুনতে চাই আমি, সেই কথাটাই আগে শুনতে চাই। কস্মিনকালে কেউ কখনও শুনেছে, একজন নিজের বাক্স-বিছানার ওপর অপরের নাম বসিয়ে নিয়ে লোককে ফ্যাসাদে ফেলবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সুজাতা দেবী এতক্ষণ পরে বসে পড়লেন পাশের চেয়ারখানার ওপর। বসে দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন। বসার ভঙ্গীটা ভয়ানক করুণ লাগল শুভার্থী শর্মার কাছে। একেবারে চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলতে লাগলেন তিনি—"কাঁদবেন না, দয়া করে শুধু কেঁদে ফেলবেন না আপনি। তাহলে আমিও কেঁদে ফেলব। সত্যি বলছি কেঁদে ফেলব আমি। আপনি যেই হোন না কেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যেভাবে পারি সে বাক্স-বিছানা এনে দেব। আপনি চোখের জলটা ফেলবেন না।"

"ফেলব না তো করব কি এখন আমি? কি করব তাই বলে দিন না আমায়? কোথায় গেল সেই দেড়েল লোকটা আপনার? ডেকে দিন না একবার তাকে। তাকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন সে এ-রকম শত্রুতা করলে আমার সঙ্গে। কেন সে আমায়

বললে না যে এটা ডক্টর সুবিমল মৈত্রের ফ্ল্যাট নয়।" কথাগুলো মুখ ঢাকা অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতেই বললেন যেন সুজাতা দেবী।

শর্মা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন সুজাতা দেবীর ঘাড়ের ওপর, যেখানে রাশীকৃত চুল অপরূপ অবহেলায় ফোঁপাচ্ছে। একটু পরে হেঁট হয়ে প্রায় সেই চুলের বোঝার কাছে মুখ নিয়ে বললেন—"ডক্টর মৈত্রের ফ্ল্যাট খুঁজছেন, একবারও এ কথা বলেছিলেন আপনি তাকে? বলুন, বলুন না সত্যি কথাটা মুখ ফুটে। ইস্—ডক্টর মৈত্র যখন এ সব কথা শুনবেন, তখন তিনিই বা মনে করবেন কি?"

সুজাতা দেবী যেন কান্নায় ফুলে উঠতে লাগলেন আরও বেশী রকম। সেই অবস্থায় ফিসফিস করে কি সব বলতে লাগলেন। শর্মা হেঁট হয়ে শুনতে লাগলেন—"দিদি জানবে, বাবা জানবে, সবাই জানবে যে কি বিশ্রী কাণ্ডটা করে বসেছি আমি। এখান থেকে শুনে গেলাম যে সাহেব মদ খেয়ে ক্লাব থেকে ফিরতে পারে না, আরও সব কত কথা বললে সেই দাড়িওয়ালাটা। দিদির কাছে জামাইবাবুর নামে আমি সেসব বলেছি। দিদি দম বন্ধ করে সব শুনেছে। ছি ছি ছি ছি!"

শর্মা আর শুনতে পারলেন না, কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা তাঁর তখন। গুজগুজ করে বলতে লাগলেন—"এক কাজ করা যাক, কি বলেন। দেখুন, সেই দাড়িওয়ালা লোকটাকে আর পাওয়া যাবে না। আপনি বরং আপনার দিদিকে আর ডক্টর মৈত্রকে বলুন না যে আমিই আপনাকে ঠকিয়েছি। কি আর হবে, ওঁরা না হয় আমাকে যা-তা শুনিয়ে দেবেন, না হয় একটা কেস করবেন, না হয়—"

সুজাতা দেবী মুখ তুললেন একবার। দুই চোখে জল টলটল করছে তাঁর। তাকালেন একবার সেই জলভরা চোখ দিয়ে শর্মার মুখের দিকে। বললেন—"আপনার কোনও অপরাধ নেই, কেন আপনার বদনাম করতে যাব খামকা—"

সেই জলভরা চোখ দুটি দেখে শর্মার তখন একেবারে বেসামাল

অবস্থা। গলা ভেঙে পড়ল তাঁর, বলতে লাগলেন—"বদনাম কেন শুধু, আরও যা খুশি হয় বোল তুমি আমার নামে সকলের কাছে। যাতে তোমার মুখ থাকে, যাতে তোমায় কেউ কিছু না বলে, এমন সব কথা বোল তুমি তাদের। আমার কোনও দুঃখ নেই। শুধু চোখের জলটা আর ফেল না।"

দরজার কাছে একটু কাশির শব্দ শোনা গেল। এঁরা দু'জনে কেউই সে দিকে কান দিলেন না। একটু সময় শর্মার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সেই রকম ভাবে মুখ ঢেকে ফেললেন সুজাতা দেবী। সত্যিই কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি—"আমি মুখ দেখাব কেমন করে। ওরা সবাই আমায় বোকা বলবে। শুধু শুধু তোমায় দোষ দিয়ে আমার লাভ কি হবে, আমি মুখ দেখাব কেমন করে।"

শুভার্থী শর্মা একেবারে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন—"দরকার নেই, কিছু দরকার নেই, আমি ছাড়া আর কাউকে ও মুখখানি দেখাবার কোনও দরকার নেই।"

সুজাতা দেবীর সমস্ত শরীরটা দু'তিনবার ফুলে ফুলে উঠল। সেই অবস্থায় তিনি বলতে লাগলেন—"বাবা কিন্তু এসব কথা জানতে পারলে—"

দরজার কাছে কে ডাক দিলে—"সুজাতা।"

ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন সুজাতা দেবী, এক লাফে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়লেন শুভার্থী শর্মা। শ্রীমতী কনক মৈত্র ঘরে ঢুকলেন। দু'জনের দিকে বেশ করে তাকিয়ে দেখে বললেন—"আমাকে মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে এসে কান্নাকাটি হচ্ছে এখানে। কেন, হয়েছে কি তোদের?"

সুজাতা দেবী শুভার্থী শর্মার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন—"আমার দিদি, আসল কনক মৈত্র।"

তৎক্ষণাৎ শুভার্থী শর্মা টপ করে কনক মৈত্রের পায়ে হাত ঠেকিয়ে হাতটা মাথায় মুছে ফেললেন। সেই হাতই আরও খানিক পেছনে

নিয়ে ঘাড় চুলকতে চুলকতে বললেন—"ডাহা ছোটলোক আর কাকে বলে। আপনি কিছু মনে করবেন না দিদি। খুব বকছিলাম কিনা আপনাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে আসার দরুন। তাই অমনি নাকে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। কিছু বলবার জো আছে নাকি মেয়েকে।"

শ্রীমতী কনক মৈত্র হেসে ফেললেন। বললেন—"ও, সেই জন্যে ওই কিম্ভুত সাজগোজ করে আসা হল, মাকড়সা যেমন করে মাছি ধরে। তা আমি তখন কি করে বুঝব যে মাছি জালে পড়ে গেছে। তা তিনি কই? তোর সেই ভগ্নীপতিটি কোথায়?"

সুজাতা দেবী বললেন—"সকাল থেকে ভোগাচ্ছে দিদি আমাকে। কিছুতে বলবে না কোথায় গেছেন ওঁর বন্ধু। এই, বল না দিদিকে ডক্টর সুবিমল মৈত্রকে কোথায় পাওয়া যাবে এখন।"

"কোথায় পাওয়া যাবে মানে! কেন তাঁর ফ্ল্যাটে ওই পি ১৯।৫।২ নম্বরে পাওয়া যাবে। ডক্টর মৈত্র কখনও বেরোন না তো বাড়ি থেকে সন্ধ্যার সময়। চলুন চলুন, চলুন না আমার সঙ্গে। এখুনি ধরে দিচ্ছি।" ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শুভার্থী শর্মা।

শ্রীমতী কনক মৈত্র বললেন—"ওরে দুষ্টু, শুধু শুধু আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলি। তখনই তো বললে পারতিস যে, জেঠুকে তোদের এ ব্যাপারটা বলতে হবে।"

"হবে হবে হবে, সেসব পরে দেখা যাবে দিদি। এখন চল তো তোমার ডক্টর সাহেবের কাছে। আগে তোমার বুকটা জুড়োক।" বলতে বলতে দিদিকে ঠেলতে ঠেলতে সুজাতা দেবী বেরিয়ে গেলেন। পেছন পেছন শুভার্থী শর্মাও। বাইরে থেকে এক ধমক শোনা গেল সুজাতা দেবীর।

"এই, তোমার একটা গায়ের কাপড়-টাপড় আন না। এই ভাবে যাব নাকি আমি তাঁর সামনে।"

দৌড়ে আবার ঘরে ঢুকলেন শুভার্থী। এক টানে আলনা থেকে

তূষ্ণীম্ আচার্যের গরদের চাদরখানা টেনে নিয়ে এক লাফে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। আলোগুলো সব জ্বলতেই লাগল।

লালবাজারের নকুড় মামা আবার তাঁর কোমরের বেল্ট খুলে ফেলেছেন। বপুখানিকে সংস্থাপন করেছেন ডক্টর মৈত্রের সন্থ কেনা লম্বা সোফা-খানার মাঝখানে। ছোট দু'খানি সোফার একটায় বসেছেন ডক্টর মৈত্র আর-একটায় তাঁর বন্ধু প্রফেসার বোস। হৈমন্তী দেবী নকুড় মামার পেছনে সোফার পিঠের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। থমথম করছে ঘরের আবহাওয়া। ডক্টর মৈত্রের আর তাঁর বন্ধুর মুখে মেঘ করেছে, হৈমন্তী দেবীর চোখে-মুখে আগুনের আভা ধিকিধিকি জ্বলছে। নির্বিকার নকুড় মামা কি করে লোকে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ লুকিয়ে ফেলেছে তার জলজ্যান্ত কাহিনী গোটা পাঁচেক শেষ করেছেন সবে মাত্র। এবার ডক্টর সুবিমল মৈত্রকে বোঝাচ্ছেন যে কত রকমের উদ্ভট কারণে লোকে স্ত্রী-হত্যা করে।

নকুড় মামা তাঁর বিভীষণ চুরুটে উৎকট এক টান দিয়ে দুর্গন্ধ ধোঁয়া খানিক ছেড়ে বললেন—"মনোমালিন্য হলেই যে বিয়ে-করা বউটাকে খুন করে ফেলতে হবে, এরই বা কি মানে হতে পারে বলুন ডক্টর। হ্যাঁ মানছি, নিশ্চয়ই মানতে হবে, অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী এমন অপরাধ করে ফেলেন যে তা ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু এটাও তো বুঝতে হবে যে ভালবাসা ব্যাপারটাও ওলটপালট হতে পারে। এই যে এত পুরুষে একটা ছেড়ে দুটো, দুটো ছেড়ে তিনটে চারটে পাঁচটা দশটা বিশটা পঞ্চাশটা অগুনতি মেয়ের সঙ্গে নটঘট করে বেড়াচ্ছে, কই, কোথাও তো শোনা যায় না যে কারও স্ত্রী এই কারণে স্বামীকে খুন করতে ছুটেছে। খুন করাটা কি শুধু পুরুষের একচেটে অধিকার নাকি? শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলেন শ্রীমতী কনক মৈত্র, স্বোপার্জিত অর্থে তিনি তাঁর জীবিকানির্বাহ করছিলেন, তাঁকে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে ফেলে রেখে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আচ্ছা—আপনিই

বলুন তো ডক্টর মৈত্র, আপনিই বলুন, আপনার বুকে হাত দিয়ে বলুন, আপনার শিক্ষাদীক্ষা স্মরণ করে শপথ করে বলুন, আপনি এ পর্যন্ত কোথাও কিছু করেন নি? এত দেশে ঘুরেছেন, এত মেয়ের সঙ্গে মিশেছেন—"

বক্তৃতাটা শেষ করতে হল না নকুড় মামাকে। ভাগনী হৈমন্তী পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন—"আর মামা, তোমার গায়ে কি চামড়া নেই। যাও তুমি যাও, ওঠ এখান থেকে। আর তোমার কনককে খুঁজে বার করে আমাদের উপকার করতে হবে না।"

নকুড় মামার চিত্তে মোটেই দাগ পড়ল না। আর-একটু আড়-মোড়া দিয়ে শরীরটাকে আরও খানিক হেলিয়ে দিলেন তিনি সোফায়, ফলে ঠ্যাং দু'খানা আরও খানিক এগিয়ে গেল ডক্টর মৈত্রর দিকে। মৈত্রর মুখের অবস্থা তখন ভয়ানক হয়ে উঠেছে। রাগে ক্ষোভে অপমানে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। একে অত্যন্ত ফরসা মানুষ তার ওপর দম বন্ধ করে আছেন। ফলে শরীরের অনেকটা রক্ত মুখে জমা হয়ে লাল রক্তবর্ণ ধারণ করছে।

নকুড় মামা সেই মুখের দিকে আঙুল তুলে বলতে লাগলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, অত করে চাপবার চেষ্টা করবেন না সুবিমলবাবু। খোলসা করে ফেলুন, মনের মধ্যে চেপে রেখে কখনও শান্তি পাবেন না। শুনতে দিন আমাদের, শুনতে দিন—কি জাতের বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী। তাতে আপনার বুকটা খানিক হালকা হবে, নয়তো অত বিষ বুকে নিয়ে বাঁচবেন কেমন করে আপনি?"

ডক্টর মৈত্র একটা মর্মভেদী শ্বাস ফেললেন। মুখ দিয়ে তাঁর বেরল একটি ছোট্ট কথা—"ওফ্।"

নকুড় মামা আর কিছু বলবার আগেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রফেসার বোস। চিৎকার করে উঠলেন তিনি—"নাঃ, আর সহ্য হয় না। চল হে ডক্টর, আমরা চলে যাই এখান থেকে।

কিছুতেই যখন উনি আসবেন না, উঃ কি পাপ করেছিলাম লালবাজারে গিয়ে।"

নকুড় মামা হাসতে লাগলেন কুমিরের মত দাঁত বার করে।

"সে উপায় আর এখন নেই বাবাজী। পুলিসের কাছে ফলস্ স্টেটমেণ্ট দেবার পর ফেরার হওয়া যায় না। এখানকার থানাকে জানিয়ে এসেছি আমি। পালিয়ে যাবে কোথায় এখন তোমার বন্ধু।"

প্রফেসার বোস ফিরে দাঁড়ালেন—"তার মানে? আমরা আণ্ডার এরেস্ট নাকি?"

নকুড় মামা বললেন—"না, আণ্ডার এরেস্ট ঠিক নয়, তবে যতক্ষণ না কনক মৈত্রকে পাওয়া যাচ্ছে—"

মামার পেছন থেকে হৈমন্তী দেবী চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওই যে এসে পড়েছে।"

ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডক্টর মৈত্র। দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললেন কনক দেবীর হাত দু'খানা। কোনও কথা বলতে পারলেন না। দেখা গেল দু'জনের চারখানা হাত ঠকঠক করে কাঁপছে।

নকুড় মামা বললেন "দেখলি, দেখলি তো হিমি। শুধু একটু ধৈর্য, ব্যাস্—আর কিচ্ছু নয়। একটু সময় নিতে পারলেই অনেক দুরূহ সমস্যা জল হয়ে যায়। কি কেলেঙ্কারিটা হত বল দিকিনি, কনক দেবীকে খোঁজার জন্যে হুলুস্থূল বাধালে। পুলিসের কাজে চাই ধৈর্য, আর রেগুলার প্রোসিডিওর ফলো করা। কাকে কান নিয়ে গেল বলে নালিশ করলেই তো আর কাকের পেছনে ছোটা উচিত নয়।"

হৈমন্তী দেবী বললেন—"হয়েছে, খুব হয়েছে। চল দেখি এখন আমার বাসায়, তোমায় সব খাইয়ে দিচ্ছি।"

নকুড় মামা হৈমন্তী দেবী প্রফেসার বোস বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। ডক্টর মৈত্রকে ধরে নিয়ে এসে কনক দেবী সোফায় বসিয়ে

দিলেন। দিয়ে পাশে বসে আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মোছাতে লাগলেন।

ওধারে তাঁর বোন আর শর্মা যে পেছন থেকে সটকে পড়লেন, সেদিকে কারও খেয়াল রইল না।

নিউ আলিপুরের পি ১৯।৭।৩ নম্বরের সামনে গলা থেকে পা পর্যন্ত গরদের চাদরে ঢাকা শ্রীমতী সুজাতা দেবী এসে দাঁড়ালেন শ্রীশুভার্থী শর্মার সঙ্গে। শ্রীশর্মা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করলেন—"চলুন দেবী, দাঁড়ালেন কেন আবার? কৃপা করে অধমের কুঁড়েয় আর-একবার পায়ের ধুলো দিন।"

সুজাতা ঘাড় না ফিরিয়ে বললেন—"তাহলে কি বুঝতে হবে সেই বাক্স-বিছানা সব এখনও অধমের কুঁড়ের মধ্যেই বিরাজ করছে?"

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন শর্মা—"না না না, বিশ্বাস করুন আমায় দেবী, একদম মিথ্যে কথা বলি না আমি। হতভাগা মাতালটা সেগুলো নিয়ে গেছে। কুছপরোয়া নেই, চলুন ভেতরে। দুটো গিলে নি আগে। সকাল থেকে এখনও পেটে কিছু পড়ে নি। শশীটা এতক্ষণে সব এনে ফেলেছে, গিলে নিয়ে দু'জনে গিয়ে মালপত্র উদ্ধার করে আনব।"

ঘুরে দাঁড়ালেন সুজাতা দেবী। একটু ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর গলার আওয়াজ। বললেন—"খাওয়া হয় নি কিছু সারাদিনে? কেন? কেন? এতগুলো মানুষ রেখে তবে লাভ হচ্ছে কি শুনি?"

শর্মা বললেন—"কোথায় মানুষ এতগুলো, শুধু শশী আর জগুর মা। জগুর মা ছুটি নিয়েছে। সকালে শশীকে বললাম খিচুড়ি বানাতে। বানিয়েছেও বেচারা, কিন্তু কপালে থাকলে তো খাব। সকাল থেকেই যে ঝগড়া বাধল। তখনই ছুটতে হল কিনা দেবী-দর্শনের আশায়।"

সুজাতা দেবী বললেন—"কেন, শুধু শশী আর জগুর মা কেন?

সেই হতভাগা দেড়েলটা কি করে শুনি? সোজা আমায় হ্যারিংটন স্ট্রীটে পাঠিয়ে দিলে যে।"

"তাকেই আপনার শ্রীচরণে এখনই সমর্পণ করছি দেবী। দিন তাকে শাস্তি, যা আপনার উপযুক্ত মনে হবে। চলুন, কষ্ট করে একটু ভেতরে চলুন।"

শর্মার কথা শেষ হবার আগেই মোড়ের মাথায় ট্যাক্সির হর্ন শোনা গেল। পরমুহূর্তেই গাড়িটা থামল ওঁদের পাশে।

জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় চেঁচিয়ে উঠলেন—"নেব না, কিছুতেই নেব না শুধ্ মালপত্র। তাকে চাই, তাকে দাও, তাকে রেখে শুধ্ তার বাক্স-বিছানা দিয়ে আমায় বিদেয় দিলে। ওতে আমি ভুলছি না, অত কাঁচা ছেলে নই আমি।"

বলতে বলতে হাঁড়ি হাতে নিয়ে হিরণ্ময়বাবু নামলেন গাড়ি থেকে। শ্রীশর্মা আড়াল করে দাঁড়ালেন সুজাতা দেবীকে। হাঁড়িটা টিপ্ করে রাস্তার ওপর রেখে শর্মার ডান পাশ দিয়ে ঘুরে সুজাতাকে ধরতে এলেন হিরণ্ময়বাবু। শর্মা ডান হাত মেলে আটকালেন। তৎক্ষণাৎ হিরণ্ময়বাবু তাঁর বাঁ পাশ দিয়ে সুজাতার কাছে পৌঁছবার জন্যে ঝুঁকলেন। শর্মা বাঁ হাত মেলে আটকালেন। চলতে লাগল সেই অদ্ভুত খেলা, একবার ডান হাত একবার বাঁ হাত মেলে আটকাচ্ছেন শর্মা। হিরণ্ময়বাবু ছোটাছুটি করছেন। শেষ পর্যন্ত সুজাতা দেবী পি ১৯।৭।৩ দরজায় ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। শর্মা তা দেখতে পেলেন না, দেখলেন হিরণ্ময় বাঁড়ুয্যে। ঝট্ করে দাঁড়িয়ে তিনি দু'হাত মেলে বললেন—"যাঃ—চলে গেল।"

কে চলে গেল দেখবার জন্যে শর্মা পেছন ফিরে তাকালেন একবার। দরজা বন্ধ দেখে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। ততক্ষণে হিরণ্ময়বাবু ড্রাইভারকে নিয়ে পড়েছেন—"দেও, উতর দেও সব কিছু, নেহি মাংতা হায়। একদম নেহি মাংতা হায়।" বলতে বলতে নিজেই পেছনের সিট থেকে টেনে নামিয়ে ফেললেন বাক্সটা। ততক্ষণে

হোল্ড-অলটাও নামিয়েছে পেছনের খোপ থেকে ড্রাইভার। হিরণ্ময়বাবু কোনও রকমে উঠলেন আবার গাড়ির মধ্যে। তারপর জানলায় মুখ দিয়ে বললেন—"ঠগ্ হায়, ইয়ে দুনিয়ামে বিলকুল সব ঠগ্ হায়, জোচ্চর হায়, একদম হাড়ে হারামজাদ হায়।" ট্যাক্সি আবার উধাও হয়ে গেল।

শশীকে ডেকে মালপত্র ভেতরে তুলে শর্মা ওপরে গেলেন। সুজাতা দেবী চেয়ারে বসে আছেন। শর্মা ঘরে ঢুকতেই আঙুল তুলে দেওয়ালের গায়ে একটা ছবি দেখিয়ে বললেন—"জানতে চাই আমি, ওই দাড়িওয়ালা ছবিটা কার?"

শর্মা মাথা কোমর পর্যন্ত নুইয়ে বললেন—"আজ্ঞে আমার। এই দাসানুদাসের। মেনেই তো নিয়েছেন আজ সকালে যে আমি চাকর। আমিও মানছি এবার। বুক ঠুকে সবায়ের সামনে কবুল করতে রাজী আছি, যে এ অধম ওই শ্রীচরণের দাসানুদাস।"